সচিত্র সাপ্তাহিক পত্রিকা

বাসন্তী

৩য় খণ্ড

২য় বর্ষ] ২৭শে পৌষ শনিবার ১৩৩০, ইং ১২ই জানুয়ারী [২৬শ সংখ্যা

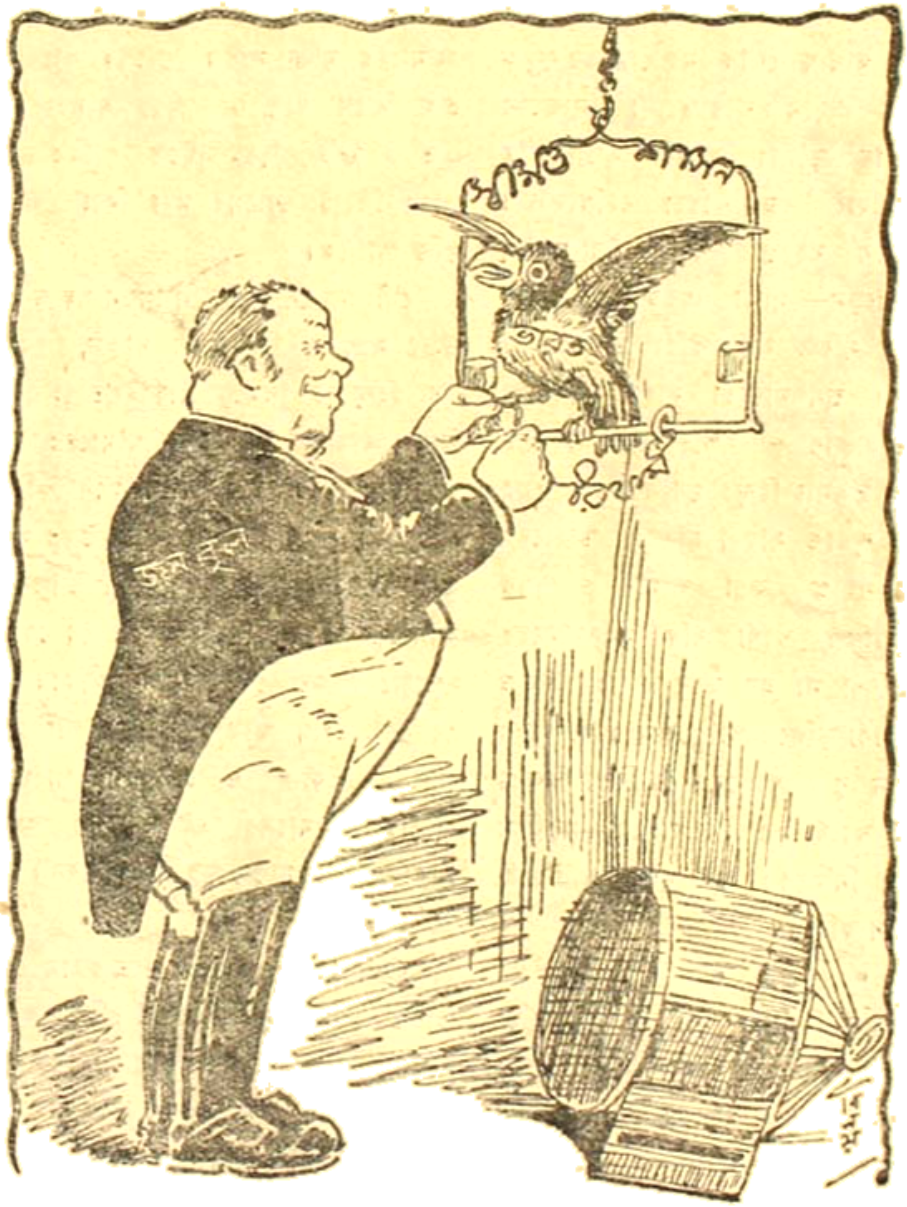

খাঁচায় ছিলে পাখী এলে এই নাম "স্বাধীন-শাসন"

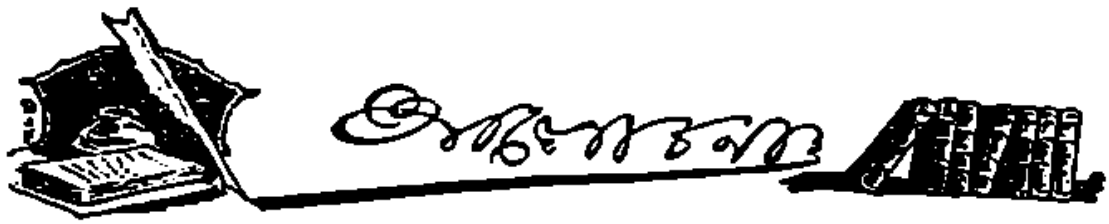

হিন্দু মুসলমান মিলন সম্বন্ধে কংগ্রেস ও খিলাফতের সভাপতি আলি ভ্রাতৃদ্বয় যাহা বলিয়াছেন তাহা উভয় সম্প্রদায়ের লোকেরই বিশেষ ভাবে বিবেচনা করিয়া দেখার যোগ্য। খিলাফৎ সভাপতি মৌলানা সৌকতআলি এই হিন্দু-মুসলমান অমিল রোগের তত্ত্ব নিরূপণে বলিয়াছেন 'বিদেশী জাতির দাস হইয়া থাকাতেই এ সমস্ত উপদ্রব আমাদের মধ্যে আসিয়াছে।' মহাত্মা গান্ধীর অনুপস্থিতে দু'দলেরই কতকগুলি স্বার্থান্ধ লোক নিজ লোভের বুহ্নক মাত্রায় ইহাতে ইন্ধন প্রদান করিতেছে। নিজেদের কার্য্য বাঁচিবার উপায় ভুলিয়া আমরা সম্প্রদায়গত বিরোধে মাতিয়া তাহাই বড় করিয়া দেখিতেছি। মৌলানা সৌকত আলি মহাত্মার কালিকটের স্মরণীয় বক্তৃতা উদ্ধৃত করিয়াছেন—গান্ধী একজন সত্য হিন্দু আজ সে মুসলমানদের সহিত বন্ধুত্ব করিয়া তাহার নিজ ধর্ম রক্ষা করিতেছে। মুসলমানেরা সাহসী—তাহারা ধর্মের জন্য তাহাদের প্রাণ ও সম্পদ ত্যাগ করিতে পারে। তাহাদের সঙ্গে তুলনায় হিন্দুরা দুর্ব্বল। তাহাদের মধ্যে বাস করিয়া হিন্দুরাও সাহসী হইবে। তাহাদের নিছক ধর্ম ব্যাপারে সহায় করা আমার ও অপর হিন্দুদের একটা সামাজিক কার্য্য যদি মুসলমানদের খিলাফত সমস্যার সুবিধা না হয় তবে তাহারা কখনও আমাদের সাহায্যের কার্য্য ভুলিতে পারিবে না। আমাদের উপর তাহাদের সম্মান বৃদ্ধি পাইবে। যে বিপদ হিন্দুরা ভাবিতেছে তাহা এই কার্য্যে দূর হইয়া যাইবে—অকৃত্রিম প্রেমের সত্য পুরস্কার মিলিবে। দুই সম্প্রদায় একত্রে শান্তিতে ও আনন্দে বাস করিবে।

• • • •

সত্যই হিন্দু-মুসলমান মিলনের মূল ঐ খানে। দু' সম্প্রদায়ই দুই সম্প্রদায়কে সন্দেহের চোখে দেখিলে শান্তি আসিবে কোথা হইতে? বিশ্বাস যদি এ উহাকে করে তবে সহজেই সব সমস্যা মিটিবে। মৌলানা বলিয়াছেন আমাদের সমক্ষে এখন সমাধানের বহু সমস্যা রহিয়াছে। স্বরাজ না পাওয়া পর্য্যন্ত আমরা তাহার সমাধান করিতে পারিব না—ইংরাজের গলবন্ধ, যতক্ষণ আমাদের গলে ঝুলান রহিবে ততক্ষণ এ সমাধান হইবে না। হিন্দু মুসলমানে তুচ্ছকারণে ঝগড়া করিয়া এই গলফাঁস আরও দৃঢ় করে। সত্য জিনিস মূল লক্ষ্য ভুলিয়া আমরা যদি তুচ্ছ ভেদ বিবাদে মাতিয়া থাকি তবে আর আমাদের মুক্তি নাই। দেশের কার্য্যে—স্বরাজের জন্য চাই আগে আত্মদান—অথচ আমরা নিজেরা নিজেদের এতটুকু ত্রুটি সহিয়া লইতে পারিব না তবে আর কি ভাবে বিরাট ত্যাগের মধ্য দিয়া আজ মুক্তি—দেশ মুক্তি আনিব।

মৌলানা সৌকতআলি মিলন সম্বন্ধে আরও বলিয়াছেন উভয় সম্প্রদায় মিল-মিশে থাকুন, কোন মতেই আমি তো হিন্দুদের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে পারিব না। যদি কোন হিন্দু আমার উপর বা আমাদের সম্প্রদায়ের উপর অত্যাচার করে তবে আমি মনে করিব সে জ্ঞানহারা হইয়াছে। আমি আশা করি উভয় সম্প্রদায়ের লোকই তাই মনে করিবেন, অসাধারণ প্রতিকারই চায়। আজ আমাদের প্রমাণ দিতে হইবে যে কোন সম্প্রদায় অপর সম্প্রদায়ের জন্য বেশী ত্যাগ স্বীকার করিতে পারে। যে বেশী ত্যাগ স্বীকার করিতে পারিবে সেই মাতৃভূমির বেশী আশীর্ব্বাদ ও ভালবাসা পাইবে। আমি চাই আমার মুসলমানেরা এই ত্যাগের ব্যাপারে হিন্দুদের ছাড়াইয়া গিয়া মাতৃভূমির প্রীয় হইবেন।

• • • •

Quarterly review পত্রে কোন লেখক লিখিয়াছেন ভারত এখনও বৃটিশ-সংস্পর্শ রহিত হইবার যোগ্য হয় নাই। ভারত এখনও তাহাকে বিদেশী আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার যোগ্যতা লাভ করে নাই বহু বর্ষে করিবেও না। যদি বৃটিশ একবারে ভারত ছাড়িয়া যায় ভারত

বহির্বাণিজ্যে ব্যতিব্যস্ত হইবে—ভিতরে আর্থিক কষ্ট ও দুর্ভিক্ষের প্লাবন বহিবে। তাঁহার মতে একে একে ইংরেজদের স্থান ভারতীয়দের দিতে হইবে, ইহাতে একশত বা তাহারও বেশী সময়ে ভারত স্বাধীন তন্ত্র লাভের যোগ্য হইবে। ইংরাজদের সংস্রব একেবারে ছাড়িতে অনেকেই বোধ হয় চাহেনা কিন্তু সম্পূর্ণ স্বাধীন বা স্বরাজ পাইলে একশ বছর ছাড়িয়া ১৫ বছরও বিলম্ব করিতে বুঝি কোন ভারতীয়ই সম্মত হইবে না।

• • • •

হিন্দু সমাজের ক্রমবর্দ্ধিত দারিদ্র্যের বহর দেখিয়া এক ভদ্রলোক বেকারদের অবস্থা কত এবং কিরূপ তাহা জানিতে চাহিয়া নিম্নলিখিত প্রশ্ন করিয়াছেন—কর্মপ্রার্থী বেকার বিবাহিত কি অবিবাহিত? শিক্ষিত কি অশিক্ষিত?

• • • •

ভারতের আর্থিক অবস্থা যে কত আশাপ্রদ তাহা ইতিপূর্ব্বে অনেক অভিজ্ঞ ব্যক্তি জানাইয়াছেন ও তাঁহাদের অভিজ্ঞতালব্ধ বচনে ভারতীয়ের বুকের রক্ত দিনে দিনেই জল হইয়া আসিতেছে। আজ এমনি আর একটা তথ্য জানাইতেছি। সম্প্রতি International Federation of Cotton'র সেক্রেটারী মিঃ আর্থার পিয়ার্স ভারতীয় তুলা সম্পর্কীয় গ্রন্থে ভারতীয়ের আর্থিক অবস্থা অন্যান্য সভ্য দেশের সঙ্গে তুলনায় দেখাইয়া বলিতেছেন ভারতীয়ের আয় যেখানে মাথা পিছু ১০ পাউণ্ড যুক্ত রাজ্যে মাথা পিছু ৩০২ পাউণ্ড, ফ্রান্সে ২৪২, আমেরিকা ২১৬, জার্মেনী ১৪৬ পাউণ্ড। অথচ এমন ভারতেও প্রতিজন সিভিলিয়ান পোষণের জন্য বছরে ব্যয় করিতে হয় ২০০০০৲ কুড়ি হাজার মুদ্রা, আগে প্রতিজনে ব্যয় হইত ১৩০০০৲। ইহার উপর ছুটি, কার্লো পরিবার রক্ষণের ব্যয় ইত্যাদীর সুব্যবস্থা যদি কমিশন করিয়া দান তবে আরও ভাল হইবে।

• • • •

সব লাল হো জায়েগা স্লোগও ভারতে মাঝে মাঝে সীমান্ত সমস্যার উদ্ভব হয়। বহু কোটি মুদ্রা ব্যয়ে ভারত সীমান্ত রক্ষিত হয়—সীমান্তের কাহারও সঙ্গে সন্ধি আফগান সরকারের মন কষাকষি আর নেপাল সরকারের সঙ্গে ভারত সরকারের মিতালী বাঁধন বাড়িতেছে। নেপালের সঙ্গে ভারত সরকারের নূতন সন্ধিতে নেপালকে পূর্ণ স্বাধীনতাই দেওয়া হইল। নেপালের বিখ্যাত প্রধান মন্ত্রী জংবাহাদুর রাণার সময় হইতেই নেপাল পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য উদ্‌গ্রীব ছিল,—মহাযুদ্ধের সময় নেপাল যে সত্য স্বাধীনতা ভোগ করিতেছে আইনতঃ ও তাহা অনেকটা সেই ভাবেরই করিয়া লয়। রেসিডেন্ট নাম উঠিয়া গিয়া এলচি হয়। হিজ্ ম্যাজেষ্টি বীর বিক্রমশা স্বাধীন রাজার মতই চলিতে পারেন। নূতন সন্ধিতে আরও কিছুদূর অগ্রসর হইল। নেপাল সরকার আর্‌গ্যানের যতই যত ইচ্ছা অস্ত্র শস্ত্র আনিতে পারিবেন। কিন্তু হঠাৎ এ সন্ধির কি হেতু? মনে হয় পাঞ্জাবের অবস্থায় পাঞ্জাব হইতে আর ভারতীয় সৈন্য সংগ্রহে বাধা পড়িয়াছে। তাই সৈন্য সংগ্রহের জন্য নেপাল ছাড়া গতি নাই। কিন্তু নেপাল সরকারও এ ভাবে সৈন্য দিতে বড় রাজী নয়, তাই বুঝি সন্ধির প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। আর সীমন্তে এক রাজার সঙ্গে ভারতের অভাব হইলে অন্য রাজার তাহাতে লাভ ভিন্ন ক্ষতি নাই।

• • • •

শোনা যাইতেছে ডাঃ ভরদ্বাজলু নাইডু নাকি জাপানকে ভারত আক্রমনের জন্য আহ্বান করিয়াছিলেন এ জন্য তাঁহার উপর যোকর্দ্দমা ঝুলিতেছে। নাইডু এখন জেলে কিন্তু তিনি জাপান সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে লিখিয়াছেন:—জাপান রাজযন্ত্রের চরমে উঠিয়াছে, কোরিয়ার সঙ্গে তাহার ব্যবহার মার্জ্জনীয়, ভারতকে সে তার পণ্যের বাজার করিতে চাহে। জাপানের ভারতের উপর কোনরূপ আধিপত্য ভারতের অমঙ্গলেরই সূচনা করিবে।

• • • •

'হিন্দু' সম্পাদক শ্রীযুক্ত কস্তুরীরঙ্গ আয়েঙ্গারের মৃত্যুতে ভারতবর্ষ একজন বিখ্যাত সংবাদপত্রসেবী হারাইল। সমগ্র দক্ষিণ ভারত ইঁহার প্রভায় সমুজ্জ্বল ছিল; জীবনের সর্ব্বস্ব 'হিন্দুতে' অর্পন করিয়া ইনি 'হিন্দুকে' মহিমান্বিত করিয়া তুলিয়াছিলেন। সেবকের অক্লান্ত শ্রমে ও সর্ব্বস্ব

স্থানে আজ হিন্দুর এই খ্যাতি। কিন্তু এই খ্যাতি অর্জ্জনে কত বড় একটা বিরাট পুরুষের প্রয়োজন ছিল তাহা আজ হয়তো অনেকে বুঝিতে পারিবেন না।

• • • •

বাজেট খাটতি ক্রমশঃ বাড়িয়া যাওয়ায় তুর্ক গভর্ণমেণ্টের অর্থ সচিব হাসান কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছেন।

• • • •

খিলাফৎ কনফারেন্সে জাজিয়াৎ উল আরবের ও খিলাফতের স্বাধীনতার দাবীর সমর্থনে শ্রীযুত চিত্তরঞ্জন ইহার সমর্থনে বলেন, তিনি সত্য হিন্দু এবং সকল সত্য হিন্দুই ধর্ম্মমত স্বাধীনতার চেষ্টায় তাহাদের মুসলমান ভাইদের পক্ষে দাঁড়াইবে।

• • •

সেফিল্ডে ছুরী কাঁচি প্রভৃতি ব্যবসায় সম্বন্ধে শিখিবার কালে "Hardware Journal" লিখিতেছেন "Indian trade promises to improve and causes, which have prevented her buying, are said to be removing and it is confidently expected that business will return to normal conditions in the coming year" এ লেখাটুকুর সত্য অর্থ এবং মূল রহস্য কি?

• •

ডেলী টেলিগ্রাফের ভারত সীমান্ত সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ লেখক কর্ণেল রোপিংটন লিখিতেছেন, ভারত গভর্ণমেণ্টের সীমান্ত নীতি ও কৌশল যথাসম্ভব ভুলে পূর্ণ। ওয়াজারী স্থানকে সর্ব্বদা যুদ্ধ সজ্জায় সাজাইয়া রাখিবার ব্যবস্থার প্রশংসা তিনি করেন নাই।

মাসিক সাহিত্য-সমালোচনা।

প্রবাসী অগ্রহায়ণ—এ মাসের প্রবাসীর প্রচ্ছদ পট খানি সুন্দর, এমন কথার বাংলা মাসিকে বড় একটা দেখা যায় না। দীপের ভেতর থেকে গাছের পাতাগুলি সুন্দর ফুটে উঠেছে, তার ভিতরে রবিবর্ম্মার প্রবাসে নারী মূর্ত্তি অতি সুন্দর না হলেও মানাবে নই। নিন্দার জন্য হোক। প্রথম ছবিখানি রামমোহন, চিত্রকর শ্রীসুকুল চন্দ্র সিংহ। ছবি খানি বেশ, ইতিহাস মাফ হলেও বেশ, হাসাও ভাল। নামের ঠিকুজির ঠিকটি নেই, সেটি কি অন্য কোন মাসিক পত্রের ঘাড় ভাঙ্গিতে পাওয়া যাবে? এ মাসের প্রবাসীর দোহাতেই রবীন্দ্র বাবুর দুটি প্রবন্ধ, প্রবন্ধটি "সবুজ," এবং দ্বিতীয়টি "সমাধান"। দুটিই ছাত্রের সবুজ সম্বন্ধে লেখা। এ রকম সুচিন্তিত প্রবন্ধ অনেক দিন আমাদের দেখা যায় নি। কবি আমাদের আসল সমস্যাটি যেমনি সেই গুলিকে এমন ভাবে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন যে তা প্রবন্ধ না পড়লেও দেখতে হবে।

"আমরা যখন বলি স্বাধীনতা চাই, তখন কি চাই, সেটা ভেবে দেখা চাই। মানুষ যেখানে সম্পূর্ণ একলা সেই খানে সে সম্পূর্ণ স্বাধীন। সেখানে তার কারো সঙ্গে কোনো সম্বন্ধ নেই, কারো কাছে কোনো দাবির নেই, কারো প্রতি কোন বিচার নেই. সেখানে তার স্বাতন্ত্র্যের সেল মাত্র হস্তক্ষেপ করবার কোনো মানুষ নেই।..... রবিন্‌সন ক্রুসো তাঁর দ্বীপের যেখানে যখন একেবারে একলা ছিল তখন সে একেবারে স্বাধীন ছিল। তারপরে এল শুক্রবার তার সেই একান্ত স্বাধীনতা ভেঙ্গে গেল।.....সমস্ত মানুষেরই স্বাধীনতা এমনি করে প্রভু ভৃত্যের সম্বন্ধে প্রভুও ভৃত্যের অধীন।" এই Social contract এর কথা এখন আমাদের সকলেরই পড়া উচিত, বালকদের সম্পাদকের স্থানের এই ছুরিকে যে কোনও কথা সম্বন্ধে একটার বেশী দুটো কথা বলা চলে না। রবীন্দ্রনাথের সবুজ "পত্রের গীত" একটি কবিতা তার তলায় লেখা আছে "হিন্দুস্থানী," কিন্তু কথা বা ভাব কোন খানাতেই হিন্দুস্থানীর চিহ্ন দেখা গেল না। যথা:—

হলুদ বরণ চাঁদার রং,
মরি কিবা রূপের ঢং,

তারপর "কিন্তু ওলো তার বরেছে খাঁড়ার পাঁয়াড়ে,—
অপথ-পারে যাবুল এবার পৌঁছায় কাঁথা রে,

বাঙ্গালা সাহিত্যে এত কবিতা বলে চলে!

রবীন্দ্র বাবুর দ্বিতীয় প্রবন্ধের নাম "সমাধান" এতেও অনেক ভালো শক্ত শক্ত সত্যি কথা আছে তা অবশ্য দেশের কার পছন্দ হবে বা কিন্তু তবুও সেগুলো সত্য আর কেবল বাঙ্গালীর নয় সমস্ত ভারতবাসীর অবশ্য পাঠ্য।" দেশকে মুক্তি দিতে গেলে দেশকে শিক্ষা দিতে হবে এ কথাটা হয়ত এক অতিরিক্ত মত বলে' ঠেকে যে এ'কে আমাদের সমস্যার সমাধান বলে মেনে নিতে মন রাজি হয় না। এইখানে স্বীকার উপলব্ধি আমাদের মনে করিয়ে দিতে হয় যে, কাজেরই অধিকার আমাদের, ফলের অধিকার নয়। আজকালো প্রতি মতিপর লোক করেই আমরা ফলাফলের পরাপর হই।"

কবীন্দ্র এই সংখ্যায় তাঁর মৃত বন্ধু শিবনাথের জন্য শোক প্রকাশ করেছেন। প্রবাসীর সম্পাদক মহাশয় রবীন্দ্র বাবুর তিনটি লেখা তিন মাসে ছাপলে ভাল করতেন। এ সংখ্যার দ্বিতীয় ছবি খানির নাম "অন্তঃপুরিকা" ছবিখানির ছাপা সুন্দর হয়েছে কিন্তু pose টি বিচার অস্বাভাবিক। 'রাজপথ' টিউপেক্ষ নাম সমোপাধ্যায়ের রচনা প্রকাশ উপন্যাস। শ্রীবিভূতি ভূষণ বন্দোপাধ্যায়ের "মৌরীফুল" গল্পটি মনের ভাল, নায়িকা সুশীলার অন্তিম অবস্থাটা লেখা বেশে ছোটোটি না হলে গল্পটি সুন্দর হত। চিত্রকর শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্যের "বাঁশী" ছবিখানি মোর হয় ব্যস্ত চিত্র কারণ এমন করে পুতুলের পিঠের উপরে

পা রেখে বাঁশী বাজাতে ফেলে দিয়ে দাসী খেতে হয়। শ্রীযুক্ত সান্যালের "মহীশূর রাজ্যের তীর্থ স্থান" প্রবন্ধটি ছবি বাতিরে ছাপা, বেলুর, শ্রবণ বেলগোলা প্রভৃতি স্থান গুলির যে বিবরণ দেওয়া হয়েছে তা পড়ে লক্ষিত যে পড়লেই বুঝতে পারা যায় যে লেখক এ সম্বন্ধে ছাপা বই গুলো পড়েন নি। "নির্বাসিতের আত্মকথা" গল্পটি ভাল। শ্রীযোগেশ নাথ মুখোপাধ্যায় লেখার শক্তির পরিচয় দিয়েছেন কিন্তু প্রবাসীর মত মাসিক পত্রে অবিবাহিত যুবক যুবতীর চুম্বনের চিত্রটা রামেন্দ্র বাবু বেঁচে থাকতে ছাপা উচিত হয় নি, এটুকু বাদ দিলে গল্পের অঙ্গহানি হত না। "মায়ের ছেলে" গল্পটি সুন্দর লেখা, সত্য ঘটনা অবলম্বনে লেখা। এই জাতীয় লেখাই আমাদের সাহিত্যে প্রয়োজন। আমাদের লেখকেরা দেশের মহিলাদের পরনিন্দা সুখই চরম সুখ আর সহজ সুখই স্বর্গ এই দুটো কথা না লিখিয়ে যদি সাহিত্যের অবলম্বনে শ্রীবিমল কুমার রায়ের মত দেশাত্মবোধ জাগিয়ে তুলতে পারেন তাহলেই আমরা জানবো, এমন বীর-রসের কথা বাংলা সাহিত্যে অনেক দিন দেখা যায় নি।

শ্রীসুধীর রঞ্জন মল্লিকের "অবর্ষার কাল" কবিতাটি পড়ে বুঝতে পারা যায় যে কবি এখন নির্ঝর, সমালোচনা করবার কথা বোধ হয়। "বেতালের বৈঠকে" একটি নতুন চিড়িয়া দেখা দিয়েছেন, তার নাম শ্রীযোগেশ কিঙ্কর ঘোষ। চিড়িয়াটি প্রত্নতত্ত্বের অনেক নূতন খবর দিয়েছেন। তিনি বলেন, যে পালবংশের প্রথম গোপাল বাঙ্গালার প্রথম স্বাধীন রাজা। শশাঙ্ক লোকটা বোধ হয় সাম্রাজ্যের আমলের জমিদার ছিল। তিনি লিখছেন, "গোপালকে আবার 'গোপালদেব' বলিয়াও অভিহিত করা হয়।" কাণা খুঁড়েকে লোকে পদ্মলোচন বলে। চিড়িয়াটি আবার বলেন, "অনন্তর বাংলাদেশ সেন-রাজবংশের হস্তগত হইলে তাঁহারা প্রথমে গৌড় বঙ্গ হইতে রাজধানী অন্তর্গত "বেলপাড়ে" এবং অবশেষে ১১০৯ খৃষ্টাব্দে গৌড়ে রাজধানী উঠাইয়া লইয়া যান।" বেলপাড়ে গাঁয়ে যে কেবল বিজয় সেনের আমলে প্রত্নতত্ত্বের খনির ছিল রাজধানী ছিলনা তা বোধ হয় চিড়িয়াটি জানেন না আর কবে কোন গোয়াটের ১১০৯ খৃষ্টাব্দে গৌড়ে রাজধানী নিয়ে যাবার কথা লিখেছিল, অশোধা কিঙ্কর এখনও সেই গোয়ার পাদা পদ্মজের আশায় পড়াশুড়ি দিচ্ছেন। প্রবাসীর বেতালের বৈঠকের ঐতিহাসিক অংশটা তুলে দিলে ভাল হয়। "রথযাত্রা" নাটিকার গোড়ার গলে শ্রীযুক্ত প্রথম নাথ বিশির নাথ দিয়ে রবীন্দ্র নাথ একটি নতুন কবিত্ব করলেন, নাটকটি হেঁয়ালী। "ই মূড়া সাহস্রত সমাজের উদ্বোধন-পত্র" যার বাহাদুর ঘোষেশ চন্দ্র রায়ের "ক্রোধিত ফোরম" বৃদ্ধ বয়সের খাতিক এবং ফেরেটিয়ারের অনুকরণ। শ্রীযুক্ত অঘোর চট্টোপাধ্যায়ের "সামাজিক আর ও সামাজিক আজ্ঞেপ্য" প্রবন্ধটি তিন পাতা হলেও বুলি বাঁকের মত অসার। শ্রীশৈলেন্দ্র নাথ রায়ের "সূর্য্যোদয়" কবিতাটি সূর্য্যোদয়ের পরিচয় দিচ্ছে। শ্রীহেমেন্দ্র কুমার রায়ের "বেদো-জল" চলেছে। শ্রীরাধারমণ চক্রবর্ত্তী। "আষাঢ়ের চাঁদ" কবিতাটি মন্দ নয়। কবি শ্রীসুনির্ম্মল বসু "সাঁওতালী গানে" [illegible] সুন্দর পরিচয় দিয়েছেন, তিনি বলেন "সুন্দর এক একটি নাচ। বিহার অঞ্চলে বিশেষ প্রচলিত।" বিহার এত উড়িষ্যার কাছাকাছি জেলা আছে সবই কি বিহার? আর সাঁওতালরা বোধ হয় Palka বা gajj নাচে। বাহবা বোসুদা। এবারকার প্রবাসী একা রবীন্দ্র নাথই আলো করে রেখেছেন, তার উপর গল্পগুলি মন্দ নয় সুতরাং অন্যান্য প্রবন্ধ ও অসার কবিতা গুলো বাদ দিলেও চলতো।

অজ্ঞাত পথ।

(শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী)

(১)

সবাই বলে জগৎ ভরে,
তুমি আছ স্বামী ;
খুঁজে খুঁজে হ'লেম সারা,
পাইনা তোমায় আমি।

(২)

অমানিশার আঁধার মাঝে,
সাঁজে, দুপুর রাতে ;
হাজ ভরা ধরার মাঝে —
চাঁদের জোছ নাতে।

(৩)

দুপুর বেলা খরতর—
প্রচাকরের তাপে ;
প্রভাত বেলা পুষ্প বনে—
গন্ধে ভরা বাগে।

(৪)

অতি ভীষণ বিজন বনে,
মরু ভূমির মাঝে ;
শ্রাবণেতে মেঘের ভিতর—
তোমায় বেড়াই খুঁজে।

(৫)

জগৎ ভরে খুঁজে সারা,
কোথাও তুমি নাই ;
কোন পথেতে গেলে বল—
তোমায় আমি পাই।

নারীর প্রতি

[নিখিল ভারত মহিলা সম্মিলনের সভানেত্রী মহাত্মা-পত্নী শ্রীযুক্তা কস্তুরী-বাই গান্ধীর অভিভাষণ হইতে]

প্রিয় ভগ্নিগণ। আমাদের দেশের সম্মান স্বাধীনতা ও সুখ ফিরাইয়া আনিবার জন্য ভারতীয়-নারীরা এখন কি কার্য্য করিতে পারেন তাহাই আমাদের দেখিতে হইবে। আমাদের সাহসী ও জ্ঞানী ভ্রাতারা নানা পথে মাতৃভূমির উন্নতির চেষ্টা করিতেছেন—কিন্তু ভগ্নিগণ আমাদের ভুলিলে চলিবে না, যে মা তাঁর ছোট বড় সকল মেয়েদেরও সাহায্য চান। এই মহা উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আমাদের এক যোগে এক মন প্রাণ হইয়া কর্ম্মক্ষেত্র অবতীর্ণ হইতে হইবে। যে ভারত মাতা একদিন সীতা, দ্রৌপদী, মীরা বাই, নূরজাঁহান, চাঁদবিবি ও লক্ষ্মীর মত মেয়ে পাইয়া গৌরবান্বিতা হইয়াছিলেন তেমন মেয়ে এ যুগে আর ভারত মাতার হয় না এ কলঙ্কের কথা যেন ইতিহাসে লেখা থাকে না। সমস্ত হৃদয় মন দেহ ও আত্মা লইয়া আমাদের সত্যের মনের জন্য কাজ করিয়া যাইতে হইবে।

শিক্ষা ও গৃহের প্রভাব :—আমি উত্তরে, দক্ষিণে, পূর্ব্বে ও পশ্চিমে দেশের সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিয়া দেখিয়াছি যে আমাদের সকল জাতি ও সম্প্রদায়ের ভগ্নিদের আদর্শ একই। এই আদর্শ পূরণের জন্য আমাদের কি কার্য্য করিতে হইবে। প্রথমে চাই শিক্ষা। মা নিজে যদি অশিক্ষিতা হন তবে ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের আর কি আশা থাকিতে পারে? সমস্ত সময়ের আদর্শ ও শিক্ষা অনুসারেই ছেলেরা পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, সাহস আত্ম-নির্ভর ও দেশ ভক্তি অর্জ্জন করে।

এই গৃহের প্রভাব, এই মায়ের প্রভাব, ইহাতেই ছেলের চরিত্রের ভিত্তি গঠিত হয়। এ যুগের বহু ব্যক্তি চরিত্র, সাধুতা ও সত্য-প্রিয়তার ক্রম বিলোপ দেখিয়া আমরা যে বিলাপ করি এ অবস্থার জন্য দায়ী আমরাই। ইহার প্রতিকার আমাদের হাতেই আছে। আমাদের যে সমস্ত ভগ্নিরা শিক্ষার দ্বারা মানসিক ও শারীরিক উন্নতি সাধনে সক্ষম হন নাই তাহাদের শিক্ষা দিতে হইবে—আমাদের ছেলে মেয়েদের শিক্ষা দিয়া পূর্ণ ভাবে গড়িয়া তুলিতে হইবে।

জাতীয় প্রতিষ্ঠান গুলিকে সাহায্য করিয়া উঠাইয়া লইতে হইবে তবে আমাদের ছেলেরা ভাল শিক্ষা পাইবে। মহাত্মা গান্ধী জাতীয় শিক্ষার দিকে এত নজর দিয়াছিলেন এই জন্য যে গবর্ণমেণ্ট স্কুল গুলি দাস তৈরী করিবার কারখানা মাত্র। ভগ্নিগণ একটা কথার দিকে বিশেষ করিয়া আমি আপনাদের মনোযোগী হইতে বলি—মেয়েদের এমন কোন একটা কাজ শিখাইবেন যাহাতে তাহারা সংসারের পুরুষের উপর ভার না হইলে সম্মানের সহে জীবিকা অর্জ্জন করিতে পারে। জন শক্তি এত নষ্ট করাতেই ভারতের এই দরিদ্র। হাজার হাজার বিধবা এখানে অসহ ভাবে পর নির্ভরশীলা হইয়া আছেন অভাবে তাহাদের অন্তর জ্বালা আরও বাড়িতেছে। এই সব নারীদের প্রচার কার্য্য ও শুশ্রূষা কারিণীর কার্য্যে নিয়োজিত করিতে হইবে। নগরে পল্লীতে তাঁহারা তাঁহাদের ভগিনীদের জাগরণের সাহায্য করিবেন। অন্য দেশের নারীদের কর্ম্ম প্রচেষ্টায় আমি সুখী, নারীদের জন্য আরও পাঠাগার আমি দেখিতে পাইলে সুখী হইব।

পর্দ্দা, অন্ধতা ও ধর্ম্ম :—আমি আশা করি এই সমস্ত পাঠাগার গুলিই আপনাদের সামাজিক, রাজ নৈতিক কর্ম্মের কেন্দ্রস্থল হইবে। যে সব ভগ্নিগণ মানুষের সহজ স্বাভাবিক ক্ষমতার কথা বিস্মৃত হইয়া আছেন তাহাদের সে ক্ষমতা জাগাইতে হইবে। তাহাদের এ ভাবে রাখা আমাদের পরম লজ্জার বিষয়। আমরা কাহাকেও অস্পৃশ্য করিয়া যত দিন রাখিব, জগতের চক্ষে আমরাও ততদিন অস্পৃশ্য হইয়া রহিব। ইহাদের কর্ম্মের আনন্দ ও উপকার বোধে জাগাইতে হইবে।

শতকরা প্রায় ৮০ জন লোককে খদ্দর পরিহিত দেখিয়া আমি সুখী। ইহাতেই বোঝা যায় যে খাদির উপকারীতা আপনারা বুঝিয়াছেন। এখানকার শ্রী সুধা আম্মা দেশের জন্য দু'বার জেলে গিয়াছেন তাহাতে সুখী, কিন্তু স্বরাজ বা স্বাধীনতার জন্য আপনাদের আরও অনেক সহিতে হইবে। আত্মার শক্তি দিয়া আমাদের পশু শক্তিকে পরাজিত করিয়া ভারতীয় নারীর মহিমা দেখাইতে হইবে।

স্বরাজ্য দলের চুক্তিপত্র

স্বরাজ্যদলের বেঙ্গল প্যাক্ট বা বাঙলার চুক্তিপত্র লইয়া নানাদিকে নানা কথা উঠিয়াছে। স্বরাজ্যদলের জন্মলাভে শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জনের ব্যক্তিত্বের প্রভাব বিশেষ ফুটিয়াছে।

এই স্বরাজ্যের বিরুদ্ধে বাংলায় দু'তিনটি বড় সভা হইয়াছিল। সে সময়েও উল্লেখ যোগ্য কোন মন্তব্য গৃহীত হয় নাই কারণ সাধারণ শ্রোতার সহানুভূতির অভাব। স্বরাজ্য প্যাক্ট কংগ্রেসে গৃহীত হয় নাই তবে হিন্দুমুসলমানের খাঁতাত ঠিক রাখবার রাস্তাটাও কেউ বাৎলে দিতে পারেন নি এমন কি সভাপতি মহম্মদ আলীও যা বলেছেন তাও অত্যন্ত ভাসাভাসা শুধু গঠনকার্য্যে আরম্ভ হলেই যে হিন্দু মুসলমানে সম্প্রীতি অনবরত হবে এ আমরা স্বপ্নেও ভাবি না।

অনেকে অনুযোগ করেছেন যে স্বরাজ্যদল কাউন্সিলে ঢোকবার আগে দেশবাসীর এসম্বন্ধে মতামত নেবার সুযোগ দেন নি—তার কারণ হচ্ছে রাজনীতি অত্যন্ত কূট পদার্থ? আমার মনে হয় শ্রীযুত দাশ মহাশয় বাঙলার লাটের নিকট মন্ত্রীত্বের নিমন্ত্রণ পেয়ে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বুঝেছিলেন যে যদি স্বরাজ্যদল মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হনতো বুরোক্রাসী তাঁদের যথেচ্ছা চাল চালিবেন। অর্থাৎ মুসলমানকে ফুসলাই আমলের মত পদমর্য্যাদা ও সোহাগে ভুলাইয়া হিন্দু মুসলমানের বিরাগ সৃজন করিয়া মজারেট ও মুসলমান-দিগের ভোটের আধিক্যে কাউন্সিল চালাইবেন। এই ফাঁক পাইয়া তিনি ভাবিলেন যে যদি মুসলমানগণ বুরোক্রাসীর নিকটে বেশী সুবিধা পাইয়া জাতীয়দলের বিরুদ্ধতা আচরণ করে তার চেয়ে তাদের জন্য কিছু স্বার্থ বলিদান দিয়া তাদের সাহায্যে বুরোক্রাসীর বিরুদ্ধতাচরণ ও জাতীয়দলের উদ্দেশ্য সার্থক করা মন্দের ভাল। বোধ হয় এই উদ্দেশ্যেই তাড়াতাড়ি এই ব্যাপারের সৃষ্টি—

এক্ষণে ব্যাপারের প্রধান কর্দ্দগুলি আলোচনা করিয়া দেখা যাউক—

শতকরা ৫৫টী গভর্ণমেণ্টের চাকরী মুসলমানেরা পাইবেন। শুনিয়া অনেকেই বিশেষ ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিয়াছেন—কিন্তু কারণ কিছু বুঝিতে পারিলাম না। যে অসহযোগী সে ত গভর্ণমেণ্টের কার্য্য করিবেই না—তবে গভর্ণমেণ্টের কার্য্যের কত ভাগ হিন্দু পাইবে আর কত মুসলমান পাইবে সে সমস্যায় তাঁহার মাথা গরম হইয়া উঠে কেন—আমারতো বোধ হয় শতকরা এক শতটী চাকরীই যদি মুসলমান গ্রহণ করেন তো তাতে হিন্দুর আপত্তিই করা উচিত নহে এই জীবন সংগ্রামের দিনে চাকরী করাটাই যে আমাদের জাতীয় অধঃপতনের মূল তাহা কি নূতন করিয়া বলিয়া দিতে হইবে। বাঙালী হিন্দুর মত মস্তিষ্ক বিশিষ্ট জাতি যদি চাকরী না পায় তো তারা অগত্যা বাধ্য হইয়া অন্য কার্য্য অবলম্বন করিবে—তাতে শিল্প, বাণিজ্যের উন্নতি হইবে বাঙলার ব্যবসা আবার নিরুপায় হইয়া বাঙালী হিন্দুর হাতে ফিরিয়া আসিবে—বাঙালী হিন্দু বড় আরামপরায়ণ জাতি তাহাদের সম্মুখে চাকরীরূপ সহজে জীবন ধারণ করিবার রাস্তাটী রচিয়া ইংরাজ, তাহাদিগকে আরও অলস করিয়া দিয়াছেন, তাহার ফল বাঙালী হিন্দু আজ কেরাণীর জাতি আর বাঙলার ব্যবসায় মারওয়াড়ী, ভাটিয়া, পিরীওয়ালা মুসলমান, হিন্দুস্থানী ও উড়িষ্যার হাত চলিয়া গিয়াছে। চাকরীর সুবিধা না পাইলে বাঙালী হিন্দু জীবিকার্জ্জনের পন্থা খুঁজিয়া পাইবে বাঙলার ব্যবসা, বাঙালীর হাতে ফিরিয়া আসিবে—সুতরাং এই অহিংস সংবাদপত্রেরা যাহাই বলুন না কেন—বাঙালী হিন্দুর তাতে কোন ক্ষতি হইবে না।

দ্বিতীয় কর্দ্দ—গোবধ—নিবারণ একেবারে সম্ভব নয়—এবং গভর্ণমেণ্ট নেক নজর থাকিলে মুসলমানদের ভোটাধিক্য থাকিলে তৎসম্বন্ধে কোন আইন পাশ করান অসম্ভব—সুতরাং এ সম্বন্ধে মুসলমানগণের সদ্বিবেচনার

উপর নির্ভর করাই যুক্তিসঙ্গত। বিশেষতঃ বর্ত্তমান ক্ষেত্র যখন গোখাদক তখন গোবধ নিবারণ করে তাঁহাদের সহায়তার সামান্য আশা যে একান্ত বাতুলতা তাহা কোন ধীর চিত্তকে বুঝাইতে হইবে?

অন্যান্য কর্ম্ম সম্বন্ধে বিশেষ বলিবার কিছুই নাই দুইজন মুসলমান মন্ত্রীর নিয়োগ হইতেই বর্ত্তমান গভর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য বুদ্ধিমান মাত্রেই অনুমান করিবেন এবং হিন্দুদিগের মধ্যে অধিক সংখ্যক স্বরাজ্যদল ও স্বাধীন-দলের মেম্বর নির্ব্বাচন এবং মুসলমানদিগের নির্ব্বাচনে দুই সম্প্রদায়ের মনোভাব বুঝা যাইবে। সুতরাং এ অবস্থায় বেঙ্গল প্যাক্টের উপযোগিতা অস্বীকার করা যায় না তবে এই প্যাক্টের সম্বন্ধে দেশবাসী হিন্দুদিগের মনোভাব জানিবার জন্য দু চারটী প্রকাশ্য সভায় আলোচনা করিয়া লইলেই কাহারও বলিবার কিছু থাকিত না।

আশাকরি দেশবন্ধু দাশ মহাশয় ভবিষ্যতে এইরূপ গুরুতর কার্য্যে মতামত প্রকাশ করিবার পূর্ব্বে দেশবাসীর গ্রহণ করিয়া গণতন্ত্রের পূর্ণ মর্য্যাদা রক্ষা করিবেন ও সতত ছিদ্রান্বেষীদের মুখ বন্ধ করিয়া দিবেন। যে ভারতবর্ষে—শুধু ভারতবর্ষে কেন সমগ্র জগতেই ব্যক্তিত্বেরই প্রভাব অসামান্য এই অহিংস আন্দোলনের মূল ভিত্তি ইহা মহাত্মা গান্ধীর বিপুল ব্যক্তিত্ব আর বাংলার স্বরাজ্যদলের জন্য দেশবন্ধু দাশের অসামান্য ব্যক্তিত্ব প্রভাবেই তাহাতে সন্দেহ নাই।

জেনে রাখুন

[শ্রীনরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য এম্-এ]

১। পুরুষের সঙ্গ ছাড়া হলে কামিনী কুসুম শুকিয়ে যায়। কিন্তু রমণীর সঙ্গ ছাড়া হলে পুরুষ গাধার মতন নির্ব্বোধ হয়ে পড়ে।

• • • •

২। বন্ধুরা তোমাকে যে রকম লোক মনে করে, তুমি সেই রকম হও। শত্রুরা তোমার যে রকম বর্ণনা করে, তুমি যেন কিছুতেই সে রকম হোয়ো না।

• • • •

৩। পুরুষ দেখে রমণীর দেহে পরম বৈচিত্র্য। কিন্তু রমণীর চরম এক দেখা সে প্রথম বুঝতে পারে, বিবাহের পরে।

• • • •

৪। বিলাতে যে যুবতী কুকুর ভালবাসে না চিরকাল আইবুড়া থাকে—এই অনেকের ধারণা।

• • •

৫। বিবাহের পর চোখ খোলে খুব কম, কিন্তু মণিব্যাগের মুখ খোলে খুব বেশী।

• • • •

৬। নারীর চোখ যদি মিথ্যা কথা বলে, তবে তার সুখের কথাকে গ্রাহ্যের মধ্যেই এন না।

• • • •

৭। মানুষ যে কোন নারীর কাছে গিয়ে সুখী হতে পারে যতক্ষণ না প্রেমে পড়ে।

• • • •

৮। বিশেষজ্ঞের মতে আমেরিকান্ মেয়েদের মত সুন্দর চোখ পৃথিবীর আর কোথাও দেখা যায় না।

• • • •

৯। স্বামী হচ্ছে নারীর সর্ব্বনেশের আশা।

• • • •

১০। পত্নে পুরুষের চিত্ত একেবারে নম্র হয়ে পড়ে।

অসন্তোষের বীজ যে কোন জমিতেই শিকড় গেড়ে বসে।

সুবিধা সুযোগ দেখতে না পাও তো কাজে লেগে পড়ে একটা সৃষ্টি করে নাও।

—•—

মানুষ কিছু করবার কাজপেলে এবং সেই কাজকরলে তবে কৃতকার্য্যতা আসে।

প্রথম :—মশায় আমার বিবাহিতা স্ত্রীর পানে আপনি অমন করে চেয়ে আছেন কেন।

দ্বিতীয় :—ক্ষমা করবেন মশায়—কিন্তু সত্যকথা বলতে গেলে বলতে হয় এত সুন্দরী তা হলে বিয়ে করা আপনার উচিত হয়নি।

নব-জীবন

[শ্রীযতীন্দ্র মোহন দত্ত]

সে দিন কলিকাতায় শীতটা একটু বেশী পড়িয়াছিল অল্প আলোর শেষ আভাটুকু অনেকক্ষণ হয় মিলাইয়া গিয়াছে। আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটের একটা মেসের তেতালার ঘরে গুটী কত যুবক——কেউ বসিয়া, কেউ বা লেপ মুড়ি দিয়া বেশ আরামের সহিত সান্ধ্য আড্ডাটী জমাইয়া তুলিতে প্রয়াস করিতে ছিল।

ধীরে ধীরে নানা তর্কে বৈঠকটী এমনি সরগরম হইয়া উঠিল যে সে দিন আর সান্ধ্য ভ্রমণের কথা কারো মনে হইল না। মেসের প্রসিদ্ধ চা খোর নরেন তার বৈকালিক চা খাওয়ার সময় অতীত হইয়া যাইতেছে দেখিয়া, হঠাৎ উঠিয়া গিয়া তিনি আনিবার জন্য চাকরকে ডাক হাঁক করিতে লাগিল।

বেশ করিয়া "র‍্যাগ্‌টা" গায়ে টানিয়া দিয়া ললিত বলিয়া উঠিল———"এই দিলে সব মাটী করে, বেশ গল্প চলছিল, না আবার এক হাঙ্গামা".....উমেশ টিপ্পনি করিল———"মৌতাত এমনি জিনিস বটে।"

খবরের কাগজ পড়িতে পড়িতে সতীশ চেঁচাইয়া উঠিল, "ওরে সুরেন বাঁড়ুয্যে যে ফুপোকাৎ.....তখন 'স্বরাজ-পার্টি কি জয়' শব্দে ঘর প্রকম্পিত হইয়া উঠিল।

এই আবার 'পলিটিক্স্' আরম্ভ হল, খালি ভোট আর ইলেক্‌শন্, কান ঝালা পালা হয়ে গেল বাপু" বলিতে বলিতে ললিত একটা বাংলা উপন্যাস টানিয়া লইল।

বলা বাহুল্য সে কখনও খবরের কাগজ পড়িত না, আর 'পলিটিক্সের' আলোচনা যে তার প্রিয় ছিল না, তা তার মন্তব্য হইতেই বেশ বুঝা যায়।

চানাচুর চিবাইতে চিবাইতে দীনেন্দ্র কহিল——— "আমি প্রস্তাব করি আজকের সন্ধ্যায় গান গাওয়া, অথবা সমাজ তত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করা হোক্।"

দীনেন্দ্র একটু Sentimental, একটু আধটু লিখবার ও বাতিক ছিল।

"সে দিন সঞ্জীবনীতে দেখলুম অন্ন ঘরের এক জন যুবতী বিধবা ঘর ছেড়ে.....

বলিতে বলিতে রাজেন খবরের কাগজটা উল্টাইতে লাগিল।

দীনেন্দ্র উত্তপ্ত হইয়া বলিতে লাগিল—"তাত হবেই আমরা যতদিন সমাজে এই বাল-বিধবাদের বিয়ে চালাতে না পারব, ততদিন এ পাপ যাবে না, যাবে না..... তখন একদল বিধবা বিবাহের সপক্ষে আর এক দল বিপক্ষে ঘোর তর্ক বাঁধিয়া গেল, সে-তর্কের আর শেষ নাই.....

সুরেশ রায় এতক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া কেবল তর্ক শুনিতে ছিলেন আর সিগারেট খাইতে ছিলেন, তিনি যেন একটু উদাসীন ও গম্ভীর প্রকৃতির লোক। ইউনিভার্সিটীর সব গুলি পরীক্ষা পাশ করিলেও তিনি আজও অবিবাহিত।

সদ্য পঠিত ফরাসী দার্শনিক "বার্গসনের" মতামত গুলি তার মাথায় তখন টগ্‌বগ্ করিতেছিল।

ধীরে ধীরে তিনি কহিলেন——"মানুষের সত্যিকার অধিকার অবহেলা করে, আমরা অবশ্য অন্যায় কাজই করেছি, কিন্তু যারা এ সব অধিকার দিয়েছে, তাদের ভিতর যে খুব শান্তি বিরাজ করছে, তাওত বলতে পারি না। আমাদের সমাজের বর্ত্তমান অবস্থায় বিধবা বিয়ে ভাল কি মন্দ তা এখনও আলোচনা সাপেক্ষ। এর Ideal যে অতি মহান্ তার কোন সন্দেহ নেই। ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা পর্য্যন্ত এর মহত্ব স্বীকার করেছেন। ভারতের সেই মনস্বী, নিলিপ্ত, জ্ঞানী ব্রাহ্মণের দল সমাজে বিধবা বিয়ে অপ্রচলন করে, যে শুধু আদর্শ হিসেবেই একে উচ্চ স্থান দিয়েছিলেন, তাহা সত্য, কিন্তু বাস্তব জগতে তাঁরা এর কার্য্যকারিতার কথা ভাবতে ভুলে গিয়েছিলেন বলেই মনে হয়। যাক্, যে ঘটনা স্বচক্ষে দেখে আমার জীবনটাই বদলে গেছে, আজ আপনাদের কাছে আমি সে গল্পটাই করব।"

"তাই নাকি? তাহলে সে গল্পটা বলুন না সুরেশ বাবু" বলে সকলে মিলিয়া তাকে ধরিয়া বসিল সুরেশ

বাবু একটা সিগারেট ধরাইয়া, চেয়ারটায় চাপিয়া বসিয়া বলিয়া যাইতে লাগিলেন——

"বহু দিন বাড়ী যাইনি, সে দিন গাঁয়ে গিয়ে কুসুমকে দেখে কালিদাসের সেই "নিবাত নিষ্কম্পমিব প্রদীপম্" কথাটা মনে পড়ে গেল। সে কি উজ্জ্বল দীপ-শিখার মত রূপ-রাশি পুড়িয়া পুড়িয়া চক্‌চকে নিকষে সোনার রূপান্তরিত হয়েছে। সে ভীষণ উদ্দাম যৌবন-শ্রী আজ যেন শান্ত, সমাহিত। তার গরদ-পরা, চন্দন-চর্চ্চিত ললাট দেখে মনে হলো এই মাত্র গৌরী বুঝি তপস্যা ছেড়ে উঠে এসেছেন! আশ্চর্য্য সুন্দর কাল দুটী চোখের দৃষ্টি যেন কোন সুদূরে——স্বপ্নলোকের পানে প্রসারিত। সেই "তন্বী শ্যামা শিখর দশনা"……আজ বর্ষাধৌত লতাটীর মত শুচিস্নাত হয়ে শুভ্র শোভায় ঝল্ মল্ কর্‌ছে।

আমাকে দেখে তার চল ঢল আয়ত আননে একটা মৃদু হাসির রেখা ফুটে উঠল।

এই যে সুরেশ দা কবে এলে? ভাল আছ ত বলে টিপ করিয়া প্রণাম করিল।

"তোমার হাতে ওটা কি বই কুসুম?" "গীতা" "চলনা বাবার কাছে একটু গীতা শুনবে, বড্ড দুঃখের কথা—এ সব বই তোমাদের কেন যে ভাল লাগে না। অমন বই কি আর হয়?"

হঠাৎ এই গীতা পাঠের প্রস্তাব আমার কাছে যে মোটেই লোভনীয় হয় নি, তা আপনারা বেশ বুঝতে পারছেন, তবুও একটা অদম্য কৌতূহলের বশে এই বিধবা তরুণীর পাছে পাছে তার পিতৃ সকাশে রওয়ানা হলুম।

পূজার দালানে নামাবলী গায়ে, আজিনাসনে বসে তার পিতা ভবশঙ্কর বাবু কি একটা প্রকাণ্ড বই খুলে পড়বার চেষ্টা করিতেছিলেন। আমার দিকে চোখ পড়তেই স্মিত মুখে বলে উঠলেন "আরে সুরেশ যে এস এস ভাল আছ ত?"

"বাবা, আজকে সুরেশ বাবুও গীতা শুনবেন।"

"সে বেশ ভাল কথা তোমাদের মত শিক্ষিত লোক যদি আমাদের এসব ধর্ম্মশাস্ত্র গুলো একটু পড়ে শুনে রেখে তবে খুব ভাল। তবে কি জান, আমার কাছে গীতা শুনে তোমার বিশেষ সুবিধা হবে না, আমার জ্ঞান অতি সামান্য। তার চাইতে কোন ভাল পণ্ডিতের নিকট এসব বইপত্তর পারলে অনেক কথা জানতে পারবে।"

"কেন বাবা, তুমিত চমৎকার পড়াতে পার"—

ভবশঙ্করবাবু হাসিয়া বলিলেন "দেখলে বাবা সুরেশ আমার এই পাগলী মায়ের ধারণা তার বাপের মত গীতা পড়াবার এমন উপযুক্ত লোক নেই" বলিয়াই তিনি তার সেই মস্ত বইটা সরিয়ে রেখে মেয়ের হাত থেকে গীতাখানা টেনে নিলেন।

পিতা পুত্রীর এই শাস্ত্রালোচনা ও ভাবভঙ্গী দেখে আমার আর বিস্ময়ের সীমা রহিল না। আমি শুধু হতবুদ্ধির মত একজায়গায় বসে এদের দিকে হাঁ করে চেয়ে রইলুম।

ভবশঙ্করবাবু গীতার চতুর্থ সর্গ থেকে শ্লোক পড়ে তার সুনিপুণ ব্যাখ্যা করতে লাগলেন, কুসুম অভিনিবেশ সহকারে সে ব্যাখ্যা শুনে যাচ্ছিল আর মাঝে মাঝে নানা দার্শনিক কূট তর্কের অবতারণা করিতেছিল। সে যে প্রখর বুদ্ধিশালিনী তা জানতুম; কিন্তু আজ তার এই ধর্ম্মতত্ত্ব বুঝবার ও গভীরভাবে তর্ক করবার মত প্রতিভা দেখে অবাক্ না হয়ে পারলুম না।

এ ত আমি আশা করিনি! আমি আমার সে প্রথম যৌবনের অরুণ রঙ্গীন আঁখির দেখা সে পল্লব লতার মত অনুপম কমনীয় হাস্যোজ্জ্বল মূর্ত্তি দেখতেই ত এসেছিলুম! যে চকল বিদ্যুল্লতা আমার হৃদয়াকাশে আলোকের ঝরণাধারা বর্ষণ করেছে, কৈশোর ও যৌবন বসন্তে যার আনন্দময়ী প্রতিমা দেখে আমার প্রাণে সুখের কলতান ছুটত এখনও যার মধুর স্মৃতি আমার জীবনের একমাত্র অবলম্বন, আজ বহুদিন পর তার প্রদীপ্ত অনলশিখার মত তীব্র রূপরাশির পরিবর্ত্তে এই কি স্নিগ্ধ, সৌম্য প্রশান্তকার মূর্ত্তি! তাকে দেখে দেখে, শুধু তার কথা ভাবতে লাগলুম তখনই যেন কত-গত কাহিনী মনে জেগে উঠতে লাগল। আমার নব যৌবনের সেই চাঁদের মত ঢল ঢল হাস্যময়ী সে কুসুম গেল কোথায়?

আজ এই সংঘর্ষবাহিনী, গভীর তরুণীর জীবনের এই বিচিত্র পরিবর্ত্তন দেখে মুহূর্ত্তে আমার মন ইউরোপের বিলাস সমুদ্রের, ভোগরাজ্যের উচ্ছৃঙ্খল জীবন থেকে, 'মার্গসনের' দর্শন হতে বাজার ভ্রমণ পল্লীর এই ছোট্ট ব্রাহ্মণ পরিবারের একটী স্বল্পালোকিত পূজা মন্দিরে ফিরে এল।

কিছুক্ষণ থেমে সুরেশবাবু আবার বলিতে লাগিলেন—তার গলার স্বর যেন একটু ধরা, ধরা, বাষ্পসিক্ত।

—সে বহুদিনের কথা, আমাদের ছেলেবেলায় দুটী-মাত্র বস্তু ছিল, যাদের কথা শুনলে আমরা ভয়ে কেঁপে উঠতুম, সে ছিল হাসদারদের একটা বজ্জাত ঘোড়া আর আমাদের ওপাড়ার শঙ্কর কাকা। ছেলেবেলায় কোন জিনিসকেই ডরাইতাম না, শুধু সেই পাগলা ঘোড়াটা ছুটে গেলে, ভয়ে মার কোলে লুকাতুম, আর পারতপক্ষে শঙ্করকাকার সম্মুখ দিয়ে পথ চলতাম না। মানুষ বাঘ ভালুককেও বুঝি এত ভয় করে না।

জীবনটাকে নিছক ভোগের বস্তু মনে করে ছেলে খেলে কাটিয়ে দেওয়াটাকেই যারা চরম সার্থকতা বলে মনে করে, আমার শঙ্করকাকা ছিলেন সে শ্রেণীরই একজন। ঘোড়দৌড়ের ঘোড়া যেমন প্রাণপণে দৌড়ে চলে, শঙ্কর-কাকাও তেমনি যেন দুর্নীতি ঘোড়ার সহিত বাজি রেখে তার দুর্নীতি ঘোড়াটাকে পূর্ণবেগে চালিয়ে দিয়েছিলেন। দিনরাত তার বৈঠকখানা নানারকম লোকের বিকট হাসিতে উচ্চ চীৎকারে ও অশ্রাব্য আলোচনায় গমগম্ করত! এমন বাদ্যযন্ত্র ছিল না যার আওয়াজ সেখান থেকে না আসত, এমন অশ্লীল আলোচনা ছিল না, যা না হত, এমন কুকাজ ছিল না যার অনুষ্ঠানের পরামর্শ সেখানে না হত! কত রমণীর বেদনাপ্লুত অশ্রুজলে সে বৈঠকখানা সিক্ত হয়ে উঠেছিল, তা শুধু অন্তর্যামীই জানেন। মাতালদের অট্টহাসিতে, বিকট চীৎকারে অতিষ্ঠ হয়ে পাড়ার লোকেরা কেবল গুমরিয়ে মরত। তবুও টুশব্দ করত না। এমনি ছিল তার প্রতাপ! এক গাড়ি বাজনার শব্দ ছাড়া আমরা অবশ্য আর কিছু স্বচক্ষে দেখতুম না, কারণ বড় হয়ে যাবার সঙ্গে প্রায় বিদেশীই হয়ে পড়েছিলুম। পাড়ার লোকের মুখে শঙ্করকাকার সব কাহিনী শুনে তার উপর মনটা একেবারে বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠেছিল। এমন উচ্ছৃঙ্খল চরিত্রের লোকের সাথে কোন সংস্রব না রাখাই ভাল। তাই কালে ভদ্রেও ওদিকে বড় যাতায়াত না।

সেবার বি,এ দিয়ে বাড়ী গিয়েছি। ভেবেছি সারা ছুটিটা বাড়ীতেই কাটিয়ে দিয়ে যাব। বিকেলবেলায় পাড়ার একজন সমবয়সীর সহিত গল্প করতে করতে যাচ্ছিলাম, হঠাৎ দেখি শঙ্করকাকার বাড়ীর সামনে এসে পড়েছি, আর তিনি পুকুরপাড়ে হুকা হাতে করে দাঁড়িয়ে। দেখেই আমার কেমন একটা ভয় ও সঙ্কোচের ভাব মনে এল। একেবারে কাছে এসে পড়েছি একটা নমস্কার করলুম।

"আরে সুরেশ যে কবে এলে, তা আমাদের কি একবার এসে দেখতেও নেই? ভাল আছিস ত? তোর মা ভাল আছেন ত? বহুদিন পর তোর সঙ্গে দেখা আর আর বাড়ীতে বসবে চল—বলিতে বলিতে সেই রক্তচক্ষু দীর্ঘ দেহধারী ব্যক্তিটী আমাকে আহ্বান করে একেবারে তার খাস বৈঠক-খানায় এনে বসালেন। হাত মুখ নেড়ে কত কথা অনর্গল বলে যেতে লাগলেন। সাধারণতঃ তার ব্যবহার ও মন বড় ভাল ছিল। এ সব লোকের যেমন হয়।

হঠাৎ কথা কর্ত্তার মাঝখানে তিনি বলিয়া উঠিলেন "কুসুম ও কুসুম, তোর সুরেশ-দাকে পানটান দিয়ে যা না রে?

অল্পক্ষণ পরেই একটী বার তের বছরের গৌরাঙ্গী অপূর্ব্ব কিশোরী পানের বাটা হাতে নিয়ে নত মুখে আমাদের সামনে এসে দাঁড়াল। ভবশঙ্কর বাবু বলিলেন "এ আমাদের সুরেশ, ওকে প্রণাম কর। বালিকা পায়ের কাছে একটী ছোট প্রণাম করে ধীরে ধীরে চলে গেল। আমার মনে হল সুরের ভাবে একটা বিদ্যুৎ খেলে গেল। আজ আপনাদের বলতে বাধা নেই, সেই স্ফুটনোন্মুখী কিশোরীর অনুপম কান্তি, তার চোখ মুখে একটা লজ্জা-বিনম্র ভাব, কৃশাল নিন্দিত বাহু যুগল ও লীলায়িত গতি দেখে আমার সে দিনের নব-যৌবন-জাগ্রত চিত্তে একটা পুলকের শিহরণ বয়ে গেল। সবেমাত্র কলেজে

"কালিদাস" পড়ে এসেছি ভবশঙ্কর বাবুর বাড়ী যে এমন একটী রত্ন আছে তা জানতুম না! সে দিন কি আনন্দের স্মৃতি নিয়েই যে বাড়ী ফিরে এলুম, তা বুঝান অসম্ভব। তারপর থেকে শঙ্করকাকার বাড়ীর নম্রতা, বদান্যতা, কোন কিছুই আমার ব্যগ্র চিত্তকে আটকিয়ে রাখতে পারল না। এরপর কত দিন গিয়েছে বাহিরে মাতালদের উল্লাস ধ্বনি, আর ভিতরে কুসুম, তার মা ও আমার মধ্যে কত কথার আলোচনা হয়ে গেছে। আজ সে সাক্ষী বেঁচে নেই, কিন্তু তার সেই বেদনা কাতর আকুল কণ্ঠের অভ্যর্থোক্তি যেন আজও আমার কাণে বেজে উঠছে। ক্রমে এমন অবস্থা ধরে দাঁড়াল যে বেশ বিদেশের সুবিখ্যাত উপন্যাসিকদের গল্প না বল্লে কুসুমের মুখ ভার হয়ে থাকত ঘটনাক্রমে এক দিন না গেলে রাগ করে কথা কইত না! আমাকে দেখে তার আরক্ত মুখে কি আনন্দের দীপ্তিই না ফুটে উঠত।

কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই আমার সুখের স্বপ্ন ভেঙ্গে গেল! ঊঃ সে দিন হৃদয়ে যাথার কি তুমুল ঝড়ই না বয়ে গেল, যে দিন বাবা ভবশঙ্কর বাবুর প্রেরিত আমার বিবাহের প্রস্তাবকারী ঘটককে অপমান করে তাড়িয়ে দিলেন, এমন মাতালের মেয়ের সাথে সদরালার ছেলের বিয়ে? আরে ছে, ছে, তা সে হাজার সুন্দরীই হউক!

• • • •

তারপর পাঁচ বছর কেটে গেছে।

এর মধ্যে কত পরিবর্ত্তন হয়ে গেছে। কুসুমের মা আর ইহ জগতে নেই। বাবা ও মা তাঁদের ছেলের মায়া কাটিয়ে স্বর্গে চলে গেলেন।

একটা বুড়ো বাঁদরের হাতে ভবশঙ্কর বাবু তার মেয়েকে সঁপে দিয়ে, প্রবল উদ্যমে মামলা-মোকদ্দমা ও দুষ্কার্য্যে লিপ্ত হয়েছেন।

সদরোলার বাড়ী উজ্জ্বল করে যেবেন এই ছিল তার পণ! আর একটা বিয়ের জন্য ও নাকি ক্ষেপে উঠেছেন। এমনি যখন সংসারের অবস্থা তখন ইহ-জগতের সব সুখ-সাধ বিসর্জ্জন দিয়ে নব-যৌবনের অতৃপ্ত বাসনা নিয়ে কুসুম বিধবার বেশে তার বাপের কাছে ফিরে এল।

আর আমি——সেই যে দেশ ছেড়ে চলে এসেছি অনেক দিন আর বাড়ী যাইনি। যেতে ইচ্ছে হয় না। আমার কুসুম যে শুকিয়ে গেছে!

কি জানি কেন সে দিন হঠাৎ মনটা ছেলেবেলার সেই নির্জ্জন নদীর ধার, আমাদের সুফল বাগানের স্নিগ্ধ শীতল ছায়ার জন্য কেঁদে উঠল, একটী পিপাসিত বেদনা বিধুর মুখের সকরুণ স্মৃতি ও যে এর মাঝে হৃদয়ে ফুটে উঠে নি, তা ও বলতে পারি না।

কিন্তু কি আশ্চর্য্য! বাড়ী গিয়ে আর গ্রামের সে সব দৃশ্য দেখে যেন আনন্দ পেলুম না। একটা অহেতুক কৌতূহলের বশে বেড়াতে বেড়াতে ভবশঙ্কর বাবুর বাড়ী গিয়ে যা দেখলুম তা আপনাদের আগেই বলেছি।

সুরেশ বাবু হঠাৎ থামিয়া গেলেন উমেশ বলিল "এটাই-কি আপনার বিয়ে না করবার প্রকৃত কারণ?

"ঠিক তাই" বলে চখের জল গোপন করিবার জন্যই যেন তিনি ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন।

ইণ্ডিয়ান সোপ কোম্পানীর
মেসিনে প্রস্তুত
চন্দন, রয়েলবকুল, মাল্ট ও ভেলভেট সাবান
ব্যবহার করুণ। টেলিফোন, ২৪৯৬

প্রলয়ে 'বন্ধু'

[শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার এম, এ]

"কলুষ নয়ন কর উন্মীলন
সম্মুখে প্রলয় হের
ঊর্দ্ধ বাহু করি শ্রীগৌরাঙ্গ স্মরি
জয় জয় রাধে বল।"

একথা বলে বন্ধু আজ ভোগ-তাপ-মোহাচ্ছন্ন জীব-কুলকে সময় থাকতে সাবধান করে দিচ্ছেন।

"গরজে বরজ রঙ্গ রঙ্গরাণী নাই
ভূমিকম্প এবমস্তু, বন্ধু, কি বালাই।"

তিনি বলেছেন মাটির টান আলগা হয়ে পড়ল, ধরিত্রীশক্তি আর নাই; সাগরজলের কল্লোলের মত মাটির নীচে প্রলয়ের ডাক শোনা যাচ্ছে; ভূমিকম্প যে সারা পৃথিবীময় একি বালাই!

"কাল জল নাশ বটে তবে সৃষ্টি রক্ষা ঘটে
যদি কীর্ত্তন রটে!"

নাশকর কালজল চারিদিকে সৃষ্টি নাশে ছুটেছে। তাঁর নামের রোল দিকে দিকে উঠলেই তবে প্রলয় লীলা কতকটা ব্যাহত হবে।

"নাবা চাল লীলাবেশ বলি উদ্ধারণ।
বন্ধু ভয় ঐ প্রলয় কালাম্বু গর্জ্জন।"

কালসায়রে তুফান উঠেছে; ঐ যে সায়র থেকে থেকে ডাকছে—"ভ-ভ—ভয়—ভয় কর, বুঝিবে প্রলয় হয়।" তাই জীবের জন্য দরদী বন্ধু দিনরাত বিজনে কানছেন—

"হা হা প্রভু দয়াময় হও হে প্রলয়াস্ত্র
উদ্ধারণ অতলে যায়
আর রক্ষা নাই (হে)
কাতরে কটাক্ষ কর নিজ উদ্ধারণ ধর
জীবগণে কৃপা কর (হে)।"

প্রলয় জলে সব ডুবু ডুবু, কিসের যা উদ্ধারণ -"সব ভেসে যে গেল" গো! নিরাশার গভীর এমন আঁধারে জীবের তরে তাঁর করুণা কটাক্ষ ও কৃপা ভিক্ষা করে' দরদী বন্ধু প্রলয়াস্ত্র নামের আজান আর্ত্তলোককে দিলেন; তাতে কবে' লীলার আবেশ তাঁর কয়টি প্রিয়-জনের প্রাণে খেলিয়েই প্রভু নিজ * উদ্ধারণ নিজেই ধরলেন। আর তখনই তাঁর মহা উদ্ধারণলীলা বিশ্বময় অভিনবরূপে ফুটে উঠল। তাতে বন্ধুর সেই পুরাতন বাণী মনে পড়ে গেল—

কাল তরঙ্গ রঙ্গ সাঙ্গ মঙ্গলময়
ঐ (প্রলয়) প্রলয় তব কীর্ত্তন কোবল।

বিশ্ব আকাশ ছেয়ে তখন প্রেমের প্লাবন ছুটল; সামনে তার পাপ মলিনত্ব তার রাখা ছেড়ে কোথা গেল চলে। ঘন ঘন নামের রোলে আকাশ গেল ভরে'; আর থেকে থেকে তখন প্রাণ মন ছাওয়া ভক্তাবেশের মাঝে নাম বিরাম লাভ করতে লাগল। তাই বন্ধু দেখছেন—

"ঘংঘণ্টা ধাম মঞ্জীর ছাম
কম্বুর পলাশন
ঘন হরিনাম আবেশ বিরাম
হরেকৃষ্ণ উচ্চারণ।"

---

* সে প্রায় ৩০ বছর হ'ল, পৃথিবীতে সর্ব্বময় প্রলয়াস্ত্রমন্ত্রকে লক্ষ্য করে প্রভু জগবন্ধু গানেক কথা লিখেছিলেন।

গৌরব

[শ্রীকালীদাসরায়]

বীর গৌরব মরণ বরণে আনে
তবু তারি লাগি উদ্যত শত গ্রীবা,
অস্তাচলের শিখর নিকটে টানে
তবু অরুণের আরোহণেই চায় দিবা।

নারী মঙ্গল

বিবাহে স্বামী স্ত্রীর মিলন যদি ভাল হয় তবে দু'জনের জীবনই পরম সুখে কাটে। পত্নী সুখে অনেক স্বামীর ভাগ্যবান হওয়ার কথা শোনা যায়। অনেকের জীবনী আলোচনায় দেখা যায় যে তাঁহারা পত্নীর প্রেরণাই অত উচ্চ স্তরে উঠিতে পারিয়াছেন। আবার অনেকের জীবন আলোচনায় দেখা যায় পত্নীর জন্যেই তাহাদের জীবন অনেক ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে। সক্রেটিস প্রভৃতি পত্নী ভাগ্যে দুর্ভাগা ছিলেন। জীবনে নারীর সহানুভূতিতে যাহা পাওয়া যায় পুরুষের সহানুভূতিতে তাহা হয় না। প্রেমিকদের মস্তিষ্ক অধিক শক্তিশালী হয়। সাহিত্যে ও চিত্রকলায় বহু জগত দৃষ্টান্ত রহিয়াছে। সৌন্দর্যপিপাসাও ভালবাসার অসম্ভব আকাঙ্ক্ষা হইতেই জগতের বহু উৎকৃষ্ট সাহিত্য ও চিত্রের উদ্ভব হইয়াছে। এই সৌন্দর্য অনুভূতি যে শুধু দেহের আকাঙ্ক্ষা তাহা নহে মনেরও এ আকাঙ্ক্ষা ফুটিয়া লোককে স্বর্গ জগতে উন্নত করে। প্রেম চোখে কথা কয় না, মনে কথা কয়, প্রেমের চোখে অনেক কুৎসিতাও অপরূপ সুন্দরী দেখায়, প্রিয়তমের প্রতিটিকার্যে সহানুভূতি, স্নিগ্ধ সহাস মুখে তাহার সান্ত্বনা দিবার চেষ্টা হইতেই পুরুষ নারীর হৃদয়ের সন্ধান জানে। দু'জনে দু'জনকে প্রাণে প্রাণে বুঝিবার মধ্যেই নর নারীর মিলন বন্ধন দৃঢ় হয়। এমন অনেক নারী আছেন যিনি উচ্চ চিন্তা, যশের আকাঙ্ক্ষা, এবং সত্যপ্রিয়তা পুরুষের মধ্যে জাগাইয়া তুলিয়া পুরুষকে সত্য পুরুষ গড়িয়া লইতে পারেন। এইরূপ নারীদের সাহচার্যে পুরুষ বিস্ময় করিতে পারে। জগতের বহু খ্যাতনামার জীবনে দেখা যায় তাঁহারা কোন কোন সময় নিজেদের ভালবাসার পাত্রীর হাতে নিজেকে একেবারে অসহায় শিশুর মত ছাড়িয়া দিয়া তাহারই প্রেম স্নেহ ও উৎসাহবাণী চাহিয়াছে। এইখানেই নারীর নারীত্বের তাহার মাধুর্য্যের সার্থকতা। ব্যক্তিগত মনুষ্যত্ব জাতীয় জীবন—স্বামী, ভ্রাতা, পুত্রদের গঠনে—দেশ জীবন গঠনে, ঐখানেই নারীর গৌরব মহিমা। এই বিশ্ববিজয়িনী নারী ক্ষমতার অপব্যবহারে জাতীয় অমঙ্গলই ডাকিয়া আনে।

* * * *

নারী ঔপন্যাসিক—কুমারী রেবেকাওয়েষ্ট বলেন আধুনিকালের উদীয়মান ঔপন্যাসিকদের মধ্যে পুরুষের চেয়ে মেয়েদের সংখ্যাই বেশী। ইহার দুইটি কারণ আছে। প্রথম কারণ যুদ্ধ, অনেক পুরুষ যাঁহারা ভাল ঔপন্যাসিক হইতে পারিতেন যুদ্ধে তাঁহাদের মৃত্যু হইয়াছে। ত্রিশ বৎসরের সময় হইতেই নারীর আত্মার বিকাশ লাভ ঘটিতে থাকে—প্রকাশের আনন্দ সে এই সময় হইতেই পায়, তাহার কাছে জীবনের একটা অপূর্ব অনুভূতি বোধ হইতে থাকে।

* * * *

নারী একজন রে বিশেষজ্ঞ—লেডী কনষ্টান্স বাটলারই বোধহয় একমাত্র মহিলা যিনি একটি হাসপাতালের এক্স রে বিভাগে সম্পূর্ণ ভার লইয়া আছেন। অনেকদিন এক্স-রে বিশেষজ্ঞ হইয়া ইনি সেন্ট এণ্ড্রুজ হাসপাতালের এক্স-রে বিভাগের ভার লইয়া আছেন।

* * * *

নারীদের হোটেল—পাশ্চাত্যে হোটেলের ব্যবসায় একটি বড় ব্যবসায়। অনেক মহিলা সেখায় হোটেলের মালিক হইয়া দিব্য স্বচ্ছন্দে কাটাইতেছেন। বিলাতের হোটেলওয়ালাদের মধ্যে সম্প্রতি কথা চলিতেছে যে তথায় একমাত্র মহিলাদের জন্যই একটি হোটেল করা যাইতে পারে কি না।

আশার ছলনা

(শ্রীপ্রভাতকিরণ বসু)

হল্‌দি বরণার উৎসমুখ কোথায় খুঁজিবার জন্য হল্‌দি পাহাড়ের মাথায় গিয়া উঠিয়াছি। যাহার সন্ধানে গিয়াছিলাম, তাহা পাইলাম না, দেখিলাম শুধু বিন্ধ্যপর্ব্বতশ্রেণী একটার পর একটা ঢেউ খেলিয়া ক্রমশঃ কতদূর চলিয়া গেছে। নীচে, দূরের প্রান্তের সাদা নীল হরিদ্রা রংএর বিচিত্র বাড়ীগুলি ছোট্ট সিমুলতলা সহরটিকে সাজাইয়া রাখিয়াছে, উপরে শ্যাম গগনে শুভ্র মেঘমালা।

নবীন বরষার রমণীয় দীর্ঘ বেলা অবসরপ্রায়, বনহুহরের মধির মধুপানে মুমতি বন সমীরণ ঝরণার জলধারায়, সালতরুশ্রেণীর পাতায় পাতায় চকল মর্ম্মর রব তুলিয়াছে, দেখিয়া সুরের সাথী সাঁওতালী বালীতে সুর ধরিলাম।

আজি খুলিয়ো হৃদয়দল খুলিয়ো,
খুলিয়ো আপন পর ভুলিয়ো!
এই সঙ্গীত মুখরিত রজনী,
তব গন্ধে ভরদিয়া তুলিয়ো।

গানটা শেষ হইবার আগে সন্ধ্যা গাঢ়তর হইয়া আসিল, চাঁদের আলো উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিল। ঘুরিয়া ঘুরিয়া উপত্যকা রেখে নামিয়া চলিলাম, সম্মুখে, পশ্চাতে, দক্ষিণে, বামে, কোথাও জনমানবের চিহ্ন নাই; পাহাড় নদী বনরাজির সংমিশ্রনে যেন এক অপূর্ব্ব গম্ভীর দৃশ্যকাব্যের সৃষ্টি হইয়াছে।

সহসা চোখে পড়িল এক কিশোরী মূর্ত্তি,—বেশী দূরে নয়, কাছেই, নদী-সৈকতে একখানা পাথরের উপর দাঁড়াইয়া আছে। কি দেখিতেছিল জানিনা, বোধ হয় নদীর স্রোতের বুকে ঝক্‌ঝকে চাঁদের আলোর দিকে চাহিয়া ছিল। দেখিলেই চেনা যায়, বাঙ্গালীর মেয়ে, টুক্‌টুকে গাঢ় রংএর শাড়ী অঙ্গরাগের সবুজ সেমিজের প্রান্ত, আর দুখানি শিরীষ কোমল পা জলে ভিজিতেছিল।

কে সে এমন অসময়ে এই লোকবিরল ভীষণ অরণ্য ছায়ায় কার ভরসায় দাঁড়াইয়া আছে জিজ্ঞাসা করিবার প্রবৃত্তি হইল। আমার মত দুঃসাহসী ভাগ্য বিতাড়িত ভিন্ন কেহ ত এখানে এতক্ষণ থাকেনা থাকে না। হল্‌দি ঝরণার বাঘের ভয় সাপের ভয়ের কথা জানে না এমন প্রবাসী কে আছে?

পদশব্দে তরুণী ফিরিয়া দেখিল, তারপর বিস্রস্ত কেশপাশ দোলাইয়া গভীরতর বনের দিকে চলিতে লাগিল। একবার ডাকিলাম, 'দাঁড়াও!' শুনিল না। অনুসরণ করিলাম।

কাছে যাইতে সে দূরে সরিয়া যায়, তাকে পথ দেখাইতে গিয়া আমি পথহারা হইলাম। মনে হইল সে বিদ্যুৎ খণ্ড, কিম্বা

ন প্রভাতরলং জ্যোতিরুদেতি বসুধাতলাৎ।

মনে হইল সে বনজ্যোৎস্না নয়ত বনবালা।

তার পশ্চাতে চলিয়া অবশেষে এমন একজায়গায় আসিয়া পড়িলাম, যেখানে নদী এক নিবিড় গহ্বরে গিয়া শেষ হইয়াছে, বড় বড় পাহাড়ের ঘিরাটোপ প্রাচীরের অন্তরালে একটা প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ দেখা যাইতেছে।

এইখানে তরুণী মরীচিকালুব্ধ পথিকের দিকে আর একবার দীপ্ত-গৌরবে ফিরিয়া দেখিল। সে নয়নে নয়ন মিলাইলে জীবনের যত দুঃখসুখ সব ভুল হইয়া যায়, পোলা নেক্সি, পার্ল হোয়াইট, এনেট্ কেলারম্যান ম্লান হইয়া পড়ে।

সে দুর্গম গিরি-প্রদেশে রজনীর বীভৎস গম্ভীরতায় অরণ্য বিহঙ্গের কলকণ্ঠও ভয়ে কাঁপিয়া উঠে, সেখানে অবলীলাক্রমে আসিতে পারে এমন সাহসিকা কে এ?

দ্বিতীয় পলক ফেলিতে প্রস্ফুট চন্দ্রালোকে সঙ্কীর্ণ নদীপন্থায় রহস্য মণ্ডিত প্রাসাদের মুখে রহস্যময়ী মিলাইয়া গেল। সে প্রাসাদের প্রবেশ পথ আমি খুঁজিয়া পাইলাম না। ঘুরিয়া ঘুরিয়া ক্লান্ত হইয়া বসি, আবার উঠিয়া খুঁজি। খুঁজিতে খুঁজিতে সে অকূল হইতে কতদূর চলিয়া গেলাম। রাত্রি প্রভাতে দেখি, হল্‌দি-ঝরণার সম্মুখে ফিরিয়া আসিয়াছি।

স্বপ্ন নয়, কল্পনা নয়, আকাশ-কুসুম নয়, ভ্রান্তি নয়, সে দেখা দিয়াছিল, কিন্তু ফিরিল না।

তারপর বৎসরকাল ঘুরিয়া গেছে। আবার পূজার অবকাশ আসিয়াছে। কর্ম্ম-বন্ধন ছিন্ন করিয়া আবার তাহার সন্ধানে ছুটিব, প্রান্তরে নদীপথে শ্মশানে বনশেষে তাকে খুঁজিব। দিনের রৌদ্রে রাত্রের অন্ধকারে, চাঁদের আলোয় দিনের পর দিন অবিশ্রান্ত খুঁজিব, কোথায় সেই প্রাসাদ, কোথায় সেই মানসী।

সত্য তথ্য

(শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য)

বিজ্ঞানের দ্রুত উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে কত রকম আশ্চর্য্য ব্যাপার যে আবিষ্কৃত হয়েছে তা গুণে শেষ করা যায় না। একজন ইংরাজ আবিষ্কার করেছেন কি করে শব্দের ফটোগ্রাফ্ তুলতে পারা যায়।

অনেকেই জানেন বোধহয় যে কোন রকম শব্দ উত্থিত হলেই বায়ুতে একরকম তরঙ্গের সৃষ্টি হয় এবং এইরূপ তরঙ্গ স্তরের পর স্তর বায়ুতে থাকা দিতে থাকে। অবশেষে যখন এই তরঙ্গ আমাদের কানের ভেতরের একরকম পর্দ্দার (Tyrparic membrane) আঘাত দেয়, তখনই আমরা শব্দ শ্রবণের অনুভূতি লাভ করে থাকি।

এখন এই ইংরাজটী দেখতে পেয়েছেন যে শব্দের পর বায়ুতে যে তরঙ্গ ওঠে তা আলোকরশ্মির নিরবচ্ছিন্নতাকে (Conlinuity) খণ্ডিত করে। কাজে কাজেই কোনো রকম শব্দের সময় সূর্য্য থেকে যে আলোকরশ্মি আমাদের ওপর পড়ছে তা মাঝে মাঝে বিভক্ত হয়ে পড়ে। আবিষ্কারক এখন এমন একরকম ক্যামেরা তৈরী করেছেন যাতে আলোক রশ্মির মাঝে মাঝে এই ফাঁকগুলো ধরা পড়বে। সাধারণ কোন যন্ত্রে এ ফাঁকগুলো আজ অবধি ধরা পড়েনি। কাজে কাজেই তাঁকে নতুন করে কল তৈরী করতে হয়েছে। কিন্তু একটা দোষ আছে এই কলের যে সকল রকম শব্দের ফটো এতে ধরা পড়ে না। যেমন 'কনসার্ট'এর শব্দ বা এক সঙ্গে অনেকের চীৎকারধ্বনি। শুধু সেই শব্দেরই ফটোগ্রাফ্ এই ক্যামেরাতে তুলতে পারা যাবে, যা হচ্ছে কিনা একেবারে সরল বা সহজ (Simple)।

• • • •

মোটরের দৌরাত্ম্যে কলকাতার রাস্তায় পথিকদের চলাচল আজকাল যে শুধু বিপদসঙ্কুল হয়ে পড়েছে তা নয়, ক্ষতিকরও হয়ে পড়েছে। চাপা পড়ে চাকার তলায় যাওয়া—এত এক ছার হচ্ছে তার ওপর যারা চাপা পড়বার দুর্ভাগ্য বা সৌভাগ্য থেকে বেঁচে যাচ্ছেন তাঁদের মধ্যে খুব কম লোকেই মোটরের চাকা থেকে ছিটকে আসা কাদা থেকে নিজেদের পোষাক পরিচ্ছদ বাঁচাতে পেরেছেন। একবার বৃষ্টি এলে হয়! তাহলেই পথচলা পথিকদের দুর্গতির আর সীমা থাকে না।

কিন্তু সুখের কথা ফ্রান্সে একরকম মোটর তৈরী হয়েছে যা নাকি কর্দ্দমময় রাস্তার ওপর দিয়ে গেলেও পার্শ্ববর্ত্তী পথিকের দামী জামাজোড়া গায়ে মাটী করে দেবে না। এ রকম মোটর কলকাতায় আমদানী হলে গরীব পথিকদের ক্ষতির অনেকটা লাঘব হবে সন্দেহ নাই।

• • • •

হাতীর দাঁত এবং চীনেদের বেদের পাখীর বাসা থেকে একরকম জেলি প্রস্তুত করা হয়েছে যা নাকি ভারী সুস্বাদু। এইরূপে প্রস্তুত জেলি লণ্ডনের কোন এক বিবিদনে প্রথম প্রদর্শন করান হয়।

• • • •

নিউজিলাণ্ডের অধিবাসিরা যথার্থই সৌভাগ্যবান্। সেখানে কৃষকদিগের উপর থেকে Income Tax তুলে দেওয়া হয়েছে। আর অন্যান্যকরও শতকরা ৫০ ভাগ কমিয়ে দেওয়া হয়েছে।

• • • •

পরমাণুর (ইংরাজীতে যাকে Atom বলে) পরিমাণ এত ক্ষুদ্র যে দশলক্ষ পরমাণু একত্রিত করলেও খুব পাতলা কাগজও যতখানি পুরু ততখানি পুরু হয় না।

• • • •

আফ্রিকায় একরকম কাঁকড়া দেখতে পাওয়া গেছে যাদের চোখ খুব বড় বড়।

ব্যতিক্রম

(উপন্যাস)

[শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্-এ]

পঞ্চচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

বিনয় সারিয়া উঠিতেই হরসুন্দর হরিহরপুরে ফিরিয়া গেলেন, যাইবার সময় গৌরমোহন হরসুন্দরকে বলিয়া দিলেন, "দেখুন হরসুন্দর বাবু, মুক্তির দোষে আমি আর আপনি যে শাস্তি পেলাম, আমাদের পাপে বিনু বা নিরু আর যেন কষ্ট না পায়, তার ব্যবস্থাটা কোরবেন।" গৌরমোহনের গলা জড়াইয়া ধরিয়া হরসুন্দর বলিলেন, "দেখ ভাই এত দিনে আমার চোখ খুলে দিয়েছে, বিনুর মনে কষ্ট দিয়ে আমি আর কখনও কোনও কাজ কোরবো না।" তখন নির্মল ঘরের দুয়ারে দাঁড়াইয়া ছিল, তাহার মনে হইল হরসুন্দরের চক্ষু ফুটিতে তখনও অনেক বিলম্ব আছে।

বিনয় সারিয়া উঠিয়া কলেজ যাইতে আরম্ভ করিল, বাগায় সে বড় একটা থাকিত না কারণ সকালে ও বিকালে সে ছাত্র পড়াইতে যাইত। ইন্দু যখন কোন মতেই বাড়ী ফিরিতে সম্মত হইল না তখন গৌরসুন্দর বাধ্য হইয়া জোড়াসাঁকোর বাসা বন্ধ করিয়া বাগুড়-বাগানেই রহিয়া গেলেন। তাহাও কিন্তু ইন্দুর মনঃপুত হইলনা কারণ সে তখন তাহার পূর্ব্বজীবনের স্মৃতিটা একেবারে মন হইতে মুছিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতেছিল। সে একদিন বিনয়কে ডাকিয়া বলিল যে তাহার একটা চাকরি করিয়া দিতে হইবে তাহা না দিলে তাহাকে বাধ্য হইয়া আবার উপবাস আরম্ভ করিতে হইবে। বিনয় চাকরি খুঁজিতে বাহির হইবে স্বীকার করিয়া নীচে আসিল এবং নির্মলকে সমস্ত কথা বলিল। নির্মল সমস্ত শুনিয়া বলিল, "দেখ বিনু মৃত্যুকালে স্বামী যে শেষ সাধের সম্ভাষণ করে গেছে তার ফল ইন্দুর অদৃষ্টে কতদূর গড়াবে তা আমি বুঝতে পারছি না। আমার মনে হয় যে একটা কাজ পেলে হয়ত ওর মনটা অনেকটা শান্ত হবে। তা নইলে হয়ত ইন্দু পাগল হয়ে যাবে। ছেলে বেলা থেকেই ওর পাগলামির ছিট একটু আছে, বয়স হয়ে সেটা একটু ঢাকা পড়ে গিয়েছিল মাত্র। নলু শেষ ধাক্কাটা দিয়ে ওর পূর্ব্বের ভাবগুলো সব স্পষ্ট করে দিয়ে গেছে। আমি বলি তুই ওর একটা চাকরি খুঁজে দেখ।" বিনয় শুষ্ক মুখে বলিল, "তবে তাই দেখি।" বলিয়া বিনয় উঠিল না, সেই রকম ভাবে চাকরের ঘরের তক্তপোষের উপর বসিয়াই রহিল।

তখন নির্মল ভাবিতেছিল যে ইন্দু কখনও এক ঘটী জল গড়াইয়া খায় নাই, পান সাজিতে বসিলে যাহার দুইজন দাসীর আবশ্যক হয় সে কেমন করিয়া পরের ঘরে দাসীপনা করিতে যাইবে, কেমন করিয়া তাহার দিন কাটিবে? ভাবিতে ভাবিতে নির্মলের চোখ দুইটা জলে ভরিয়া আসিল, কিন্তু বিনয় তাহা দেখিতে পাইল না। সে তখন ভাবিতেছিল যে হঠাৎ তাহার জীবনটা কেমন করিয়া কূলে কূলে ভরিয়া উঠিয়াছে তাহা সে বুঝিতে পারে নাই। জীবনের দিনগুলা এমন করিয়া কখনও কাটে নাই, ইন্দু চলিয়া গেলে হঠাৎ যেন সে সুখের সমুদ্রটা কোন ক্রুর অগস্ত্যের ক্রুদ্ধ নিশ্বাসে শুষ্ক হইয়া যাইবে, তখন সে কি করিবে? এই সময়ে তাহার হাতের উপরে দুইটা তপ্ত অশ্রুবিন্দু পড়িল, বিনয় চাহিয়া দেখিল নির্মল কাঁদিতেছে। তখন সে বন্ধুকে বুকে জড়াইয়া ধরিল।

অনেকক্ষণ পরে মাথা তুলিয়া নির্মল জিজ্ঞাসা করিল, "ভগবান কি কেবল কষ্ট দিবার জন্য ইন্দুর জন্ম দিয়াছিলেন?" বিনয় এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিল না। তখন নির্মল আবার জিজ্ঞাসা করিল, তুই কি এখন

যেতে কি ?" বিনয় বলিল, "একেবারে সন্ধ্যাবেলায় পড়াতে যাবো।" এই সময়ে ডাক হরকরা আসিয়া একখানা পত্র দিয়া গেল। পত্র খানা বিনয়ের, সে পড়িল :—

হরিহরপুর।

২৩শে কার্ত্তিক ১৩০৮।

চিরজীবেষু :—

অত্র পত্রে বীরু তারা আশীর্ব্বাদ জানীবা। দক্ষীণ পাড়ার সদানন্দ চক্রোত্তীর মেয়ের বীয়ে ৭ই তারিখে, ৮ই আমি শ্রীক্ষেত্তর যাত্রা করীব। আমার জন্ত অন্ন ভাড়ায় ৮কালীঘাটের-মন্দীরের কাছে একটী বাসা ভাড়া করীবা। অঘ্রাণ মাসের প্রথম থেকেই বাসা ভাড়া করীবা কারণ আমাদের সেতোর সঙ্গে ভীন্‌গাঁয়ে মেয়ে ছেলে দুই চারী দীন আগেই পৌছাবে। ইতী।

পত্রে কোন আক্ষর ছিল না, বিনয় তাহা পড়িয়া নির্ম্মলের হাতে দিল। নির্ম্মল মুখ খানা বাঁকাইয়া বলিল, "বিনু, ইন্দুর যখন এই দশা হলো তখন আর বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের মনে কষ্ট দিয়ে লাভ কি? দুই ঠানদির চিঠির উত্তরে লেখ, এখানে আর বাসা করে কাজ নেই তিনি যে দিন আসবেন সেই দিন যেন অন্নজাথ চলে যান। বিনয় কথাটা শুনিয়া অনেকক্ষণ উত্তর দিল না; হাতে মাথা রাখিয়া ভাবিল, তাহার পরে মুখ তুলিয়া বলিল, "নিরু ভাই, নিজের কথাটাই ভেবে দেখেছ কিন্তু এ সকল ব্যাপারে যে আর একটা দিক আছে তা কখনও মনে কোরেছো কি? বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের দীর্ঘ নিশ্বাসের ফল থেকে হয় ত পরিত্রাণ পাবে কিন্তু দুর্ব্বলের অসহায়ের আর নিরাশ্রয়ের মর্ম্মস্থল থেকে যে নিঃশব্দ নিশ্বাস বাহির হয় তার শক্তি কতদূর তাকি জানো? সেই শব্দ হীন আকার হীন নিশ্বাস জগতের সমস্ত পুঞ্জিভূত ব্রহ্মতেজ ভস্ম করে রেখে দেয়, তাতে সমস্ত বিশ্ব একটা অদৃশ্য আগুনে জলে ওঠে, মহাপ্রলয়ের জল ভিন্ন তাকে কেউ নেবাতে পারে না। সম্মুখে একটা দৃষ্টান্ত দেখে বুঝতে পারছ না?" বিনয়ের আর বলা হইল না কারণ নির্ম্মল তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া শিশুর মত কাঁদিয়া উঠিল; বিনয় আবার তাহাকে বুকে চাপিয়া ধরিল।

অনেকক্ষণ পরে আবার সে বলিল, "দেখ নিরু আমাদের অদৃষ্টের চক্রটা যে ভাবে গড়িয়ে চলেছে সেই ভাবেই চলুক, আমাদের বাধা দেবার শক্তি নেই সে কথা বললে হয়ত দুই মানবিনা কিন্তু এখন বাধা দিয়ে কাজ নেই। মোহিনীকে একটা আশ্বাস দিয়ে আসা হয়েছে, এখন তাকে হতাশাস করা উচিত নয়। দেখ যখন আমি ইন্দুর মুখের দিকে চেয়ে দেখি তখনই বুঝতে পারি আমাদের দেহের একটা বল সত্বেও আমরা কত দুর্ব্বল, মুখে বলি আমি করি তুমি কর কিন্তু কোন কাজ আমরা করতে পারি কি? কে এসে আমাদের অজ্ঞাতে পা চাপিয়ে যেন, সমস্ত মত নিশ্বাসটা বন্ধ করে দেয় আবার একটা নূতন দেহের সৃষ্টি করে তাতে নিশ্বাস সঞ্চালিত করে একজন—কে সে তা জানি না। আমি উঠলুম, কালীঘাটে বাসা ঠিক করে এসে ইন্দুর চাকরি খুঁজতে যাবো।" নির্ম্মল বিনয়ের কাঁধ হইতে মাথা তুলিয়া বলিল, "যা।" বিনয় কাপড় না ছাড়িয়া চাদর না লইয়া চলিয়া গেল।

অষ্টচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

চাকরি পাইয়াই ইন্দু চলিয়া গেল। সে দিনটা অন্ধকার, কার্ত্তিকের আকাশের স্বল্প আলোক পরতের ক্ষুদ্র খণ্ড মেঘে অতি ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছিল। নির্ম্মল যখন একটা গাড়ী ডাকিয়া ইন্দুকে লইয়া গেল তখন বিনয়ের অন্ধকার মলিন বাড়ীটা যেন সহসা তমসাচ্ছন্ন হইয়া গেল। তাহার একটু পরেই সৌরমোহন নির্ম্মলের মাতাকে লইয়া নিজের বাড়ীতে চলিয়া গেলেন, তখন অন্ন কাজ না পাইয়া বিনয় বাসার সমস্ত ঘরে ঘুরিয়া বেড়াইতে আরম্ভ করিল। তাহার শয়ন কক্ষে দুই তিন খানা ছবি ছিল, বিনয় যত দিন একা ছিল ততদিন সে অনাবশ্যক জিনিষ গুলা এই ছবির পিছনে লুকাইয়া রাখিত। অনেক দিন পরে নিজের ঘরটিতে আসিয়া সে অন্ত মনে ছবিগুলা ঝাড়িতে আরম্ভ করিল। ইন্দু যে নিত্য একাজ করিত তাহা বিনয় জানিত না। এক খানা ছবি তুলিতে গিয়া বিনয় এক রাশি কাল চুল দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া পড়িল। সে চুল কাহার তাহা বুঝিতে তাহার বিন্দু-মাত্র বিলম্ব হইল না।

চুল গুলা হাতে করিয়া বিনয় তাহা শয্যার উপরে লইয়া আসিল, সেগুলা বালিশের উপরে বিছাইয়া বিনয়

তাহা সম্বন্ধে আঁচড়াইতে বসিল। হঠাৎ তাহার বুকের মধ্যে কে যেন হাহাকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল, কে যেন চিরপোষিত আশা আকাঙ্ক্ষা সঞ্চিত তরুণ অঞ্জলি দিয়াও কল্পিত সুখের মায়া মমতা পরিত্যাগ করিতে পারিতেছিল না, কে যেন শূন্য স্বপ্ন অবিকৃত সত্য মনে করিয়া তাহার অশরীর কায়া জড়াইয়া ধরিয়া আপনার শূন্য হৃদয়টাকে পূর্ণ করিয়া রাখিতে চাহিয়াছিল, তাহারই হতাশার নীরব মর্মভেদী হাহাকার বিনয়ের বুকের মধ্যে নিঃশব্দে উছলিয়া উঠিয়াছিল কেন বিনয় তাহা বুঝিতে পারিতেছিল না। তখন সহসা একটা অদৃষ্ট বজ্রমুষ্টি তাহার মানসিক শক্তিকে পিষিয়া দিল, অবশনীয় চিন্তা-বৃত্তিগুলি সহসা স্বাধীন হইয়া তাহার মনের বাঁধন ভাঙিয়া দিল, বহুমূল সংস্কার এতদিন তাহাকে আবদ্ধ রাখিয়া রক্ত মাংসের মানুষের পরিবর্তে বিনয়কে যন্ত্র করিয়া তুলিয়াছিল সেই বিনয় হঠাৎ মানুষ হইয়া উঠিল। তখন তাহার চিররুদ্ধ অশ্রুরাশি উৎসের মত উথলিয়া উঠিয়া তাহাকে অন্ধ করিয়া দিল, বিনয় সেই কেশগুচ্ছরাশির উপরে মুখ লুকাইয়া নিঃশব্দে কাঁদিয়া উঠিল।

এমন করিয়া সকলেই কাঁদে মানুষের গড়া ধর্মের আর মানুষের সমাজের বন্ধনে আবদ্ধ থাকিয়া যে দুর্বল উপায় খুঁজিয়া না পায় সেই কাঁদে দুর্বলের অবরুদ্ধ মর্মবেদনার নীরব ক্রন্দনধ্বনি অন্তর্যামীর অন্তরের রেখাপাত করিয়া আসে কি না তাহা কেহ জানে না, হতাশের নিরাশ হৃদয়ের আবেদন কোনও অদৃষ্ট শক্তি বিশ্ব দেবতার পাদপীঠে পৌঁছাইয়া দেয় কি না তাহাও কেহ জানে না কিন্তু তথাপি যে নিরাশ সে সেই বিশ্ব দেবতাকে অন্তর্যামী মনে করিয়া তাহার হতাশার প্রার্থনা, গভীরতার বেদনা অশ্রুই অক্ষর সহিত সেই অজ্ঞাত পাদপীঠে নিবেদন করিয়া থাকে। বিশ্বে ইহাই মানবের রীতি, সুতরাং বিনয় তাহাই করিল।

কোথা দিয়া কোন সময়ে কার্তিকের বেলা বহিয়া গেল বিনয় তাহা বুঝিতে পারিল না। বাসার চাকর আসিয়া ঘরে একটা আলো দিয়া যখন জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা বাবু চা আনব কি?" বিনয় তখন মুখ না তুলিয়াই বলিল, "না।" চাকর চলিয়া গেল। তিন সপ্তাহ ধরিয়া এ কাজটা সে করে নাই সুতরাং নূতন করিয়া আরম্ভ করিতে তাহার তত ইচ্ছা ছিল না। সে চাকর সুতরাং চাকরি বজায় করিয়া সে নিশ্চিন্ত হইল, বিনয় তাহাতে কোন আপত্তি করিল না। অন্য দিন ইন্দু চা তৈয়ারী করিত সহস্র বাধা বিপত্তি সত্ত্বেও নির্মলের মাতার অনুরোধে তাহাকে চা খাইতে হইত। আজ সেই সময়ে সকলের অভাবটা একত্র হইয়া বিনয়কে অভিভূত করিয়া ফেলিল। রাত্রি বাড়িল, একটা ঘড়িতে ৮টা বাজিয়া গেল, তখন কর্তব্য স্মরণ করিয়া বিনয় উঠিল। পাশের একটা ঘরে তাহার একটা বাক্সে একখানা মলিন রুমালে কতকগুলা শুষ্ক চামেলী ফুল ছিল, বিনয় চুলগুলা গোছাইয়া সেই রুমালে বাঁধিয়া নিজের বালিশের তলায় রাখিয়া দিল।

যে ছাত্রকে সে পড়াইত সে শিক্ষককে দেখিয়া সানন্দে বলিয়া উঠিল, "মাষ্টার মশাই আমার দিদির যে গভার্নেস এসেছেন তিনি আপনাকে চেনেন।" বিনয় আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার দিদি?" ছাত্র বলিল, "আজ্ঞে হাঁ আমার দিদি। আমার পিসতুতো বোন, সে বেথুন কলেজে পড়ে। পিসে মশাই তাঁকে পড়াবার জন্য একজন গভার্নেস রেখেছেন। বেথুন তিনি জজ ঘরের মেয়ে, এমন সুন্দর শান্ত মূর্ত্তি আমি কখনও দেখিনি। তিনি আপনাকে চেনেন। সেই সেদিন কোডাক্ ক্যামেরাটায় আপনার যে ছবি তুলেছিলুম সেটা দেখেই তিনি দিদিকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'উনি কে?' আমি তখনই বুঝতে পারলুম তিনি আপনাকে চেনেন।" বিনয়ের বুকের ভিতরটা হঠাৎ ছ্যাৎ করিয়া উঠিল। সে জিজ্ঞাসা করিল, "তাঁর নামটা কি বলতে পারো?" ছাত্র বলিল, "একদিন দেখা হয়েছে বইতো নয়। আজ বিকালে পিসির বাড়ী চা খেতে গিয়ে তাঁকে দেখে এসেছি।" "তোমার পিসে মশাই কোথায় থাকেন?" "১৮ নং সেন্টার রোড বালিগঞ্জ।" বিনয়ের হাত হইতে বই খানা পড়িয়া গেল, সে নির্মলের সঙ্গে গিয়া সেই ঠিকানায় ইন্দুর চাকরি ঠিক করিয়া আসিয়াছিল।

তাহার অবস্থা দেখিয়া ছাত্র জিজ্ঞাসা করিল, "অসুখ করছে মাষ্টার মশাই?" বিনয় বলিল, "না।" কিন্তু তাহার মন সেদিন কিছুতেই ছাত্রের পাঠ্য-পুস্তকে

নিবিষ্ট হইল না, সে বারবার অন্যমনস্ক হইয়া গেল এবং চমক ভাঙিয়া দেখিল, যে ছায়ের সকৌতুক হাসি ভরা চোখ দুটি তাহার মুখের উপরই নিবিষ্ট আছে। অন্যমনের ভাণ করিয়া সে বাসায় চলিয়া আসিল এবং চাকরকে "খাইব না" বলিয়া উপরের ঘরে চলিয়া গেল। সে যখন ঘরের আলো নিবাইয়া দিয়া শুইয়া পড়িল তখন তাহার হাত দুইটা তাহার অজ্ঞাতে উপাধানের অন্তরাল হইতে কেশগুচ্ছ টানিয়া বাহির করিল। সেই সময়ে নির্মল আসিয়া ডাকিল, "বিনু!" তখন বিনয় কেশগুচ্ছ মাথায় তুলিয়া বন্ধুর কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া ফুকারিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

সপ্তচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

এই অগ্রহায়ণ পুরুষোত্তম যাত্রীর একদল কলিকাতায় আসিয়া পৌঁছিল, সে দলে ৩টি মাত্র স্ত্রীলোক ছিল; ঠানদিদি, মোহিনী ও মোহিনীর এক বিধবা মাসী। বিনয় তাহাদিগকে শিয়ালদহ ষ্টেশন হইতে লইয়া আসিয়া কালীঘাটের বাসায় পৌঁছাইয়া দিল কিন্তু ঠানদিদি তখনও তাহাকে অব্যাহতি দিলেন না। তিনি বলিলেন, "বিনু, এখনই পুরুত ঠিক করে এস, গোধূলি লগ্নে বিয়ে। বিনয় বলিল, "সেত পরশু ঠানদি! শুভ পুরুত যা চাইবে তা কালকে ঠিক করে দেবো।" "সেত্যো বাম্নী এমন কাঁচা কাজ করে না বিনু, পরশু যদি বিয়ের দিন ঠিক হয় তাহলে আজ সন্ধ্যের গাড়ীতেই আমি গা ঢাকা। আজই বিয়ে, তুমি পুরুত ঠিক করে এসে বর আর বরকর্ত্তা ডেকে নিয়ে এস।" বিনয় আকাশ হইতে পড়িল, সে বলিয়া উঠিল, "ঠান্‌দি এত তাড়াতাড়ি, সমস্ত জিনিষ কি করে যোগাড় করে দেবো?" ঠান্‌দি একটু চটিয়াই বলিলেন, "আজ কালকার ছোঁড়াগুলো কোন কর্ম্মের নয়, তোকে কিছু যোগাড় করতে হবে না যা, তুই কেবল বর ছোঁড়াটাকে ধরে নিয়ে আয়।"

বিনয় নৃত্যকালী ঠাকুরাণীর নির্দ্দেশ অনুসারে পুরোহিত ঠিক করিয়া বরসজ্জা কিনিতে গেল। নৃত্য ঠান্‌দিদির খরচের বহর দেখিয়া সে আশ্চর্য্য হইয়া গেল কিন্তু তাহার জিজ্ঞাসার ভয়ে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে সাহস করিল না। চল্লিশ পাঁচশত টাকার বরাভরণ ও প্রায় হাজার টাকার অলঙ্কার ক্রয় করিয়া সে যখন ফিরিয়া আসিল তখন বর পক্ষের লোকে ছোট বাসা বাড়িটি ভরিয়া গিয়াছে। সন্ধ্যাবেলাতেই বিবাহ, বর ও কন্যা যখন নারায়ণের সম্মুখে বসিল তখন বিনয়ের বুক হইতে একটা বোঝা নামিয়া গেল, তাহার মুখে আপনা হ'তে হাসি ফুটিয়া উঠিল কারণ অনেকদিন পরে নির্ম্মলের চক্ষুর কোণ হইতে কালদাগগুলা কে আসিয়া মুছিয়া দিল, বহুকাল পরে তাহার সুন্দর প্রশান্ত আস্য স্নিগ্ধ মধুর হাস্যে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। সম্প্রদান হইয়া গেল।

বর ও কন্যা যখন বাসরে গেল তখন বিনয় কোন মতে পাশ কাটাইয়া পলাইল। সে যখন বাসায় পৌঁছিল তখন রাত্রি প্রায় দুই প্রহর, হেমন্তের ম্লান জ্যোৎস্না তাহার শয়ন কক্ষের মুক্তদ্বারে সভয়ে প্রতীক্ষা করিতেছিল, দুইদিনের অযত্নে ঘরের সাজসজ্জাগুলি ইহারই মধ্যে হতশ্রী হইয়া উঠিয়াছিল আর একটা অব্যক্ত রোদন ধ্বনি চারিদিকে নীরবে সঞ্চারিত হইতেছিল। সে সজ্জার যৌবনে কে যেন তাহার সৌন্দর্য্য ফুলে ফুলে পরিপূর্ণ করিয়া রাখিয়াছিল, তাহার অভাবে প্রভাতের রাত্রির কুসুম শয্যার মত একটা পরিস্ফুট অব্যক্ত ব্যথা-বেদনা জাগাইয়া তাহা যেন ধীরে ধীরে অতি ধীরে ম্লান হইয়া যাইতেছিল, দুয়ারের কাছে দাঁড়াইয়া বিনয়ের বুকের ভিতরটা যেন কেমন করিয়া উঠিল, বন্ধুর মুখে শুভবিবাহ রাত্রির যে মধুর হাস্যের ছবি স্মৃতিপটে আঁকিয়া সে ঘরে ফিরিয়াছিল তাহার গৃহসজ্জার সেই অভাব ক্ষুব্ধিত হইয়া তাহার ব্যথিত চিত্তকে আক্রমণ করিল, মুহূর্ত্তের মধ্যে তাহার মুখের হাসি শুকাইয়া গেল। ঘরের ভিতরে গিয়া সে তাড়াতাড়ি আলোগুলা খুলিতে গেল কিন্তু আলো সমস্তই খোলা ছিল। সে ছবিগুলার ধূলা ঝাড়িতে গিয়া দেখিল যে কোথাও ধূলার কণামাত্রও নাই। অথচ প্রতিপদে প্রতিক্ষণে তাহার মনে হইতেছিল যে তাহারই গৃহসজ্জা একটা অজ্ঞাত করুণ রাগিণীতে কি একটা দারুণ অভাব জাগাইতেছে।

সে তখন তাহার শয্যার উপরে বসিয়া সযত্ন সঞ্চিত কেশগুচ্ছরাশি তাহার উপাধানের উপরে সাজাইয়া রাখিল, সেই পরিত্যক্ত কেশের কোন অব্যক্ত মধুর গন্ধ

তাহাকে বর্ত্তমান হইতে অতীতে লইয়া গেল। বিনয় একবার চিত্ত সংযত করিবার চেষ্টা করিল কিন্তু তখনই তাহার মন বিদ্রোহী হইয়া উঠিলেও, তাহা তখন ধর্ম্ম বা সমাজের বিধিবদ্ধ ব্যবস্থার গণ্ডীভূত হইয়া থাকিতে চাহিল না, মদের নেশা যেমন মানুষকে পাগল করিয়া তোলে, সেই কেশগুচ্ছরাশির ক্ষীণ গন্ধ একটা তীব্র মাদকের মত তাহার চিত্তকে বিভ্রান্ত করিয়া তুলিল, বিনয়ের সংযম মানসিক শক্তি ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞা কোথায় ভাসিয়া চলিয়া গেল।

রাত্রি বাড়িয়া চলিল, সময় কাটিয়া গেল, বিশালনগর স্তব্ধ নীরব হইয়া গেল বিনয় তাহা বুঝিতে পারিল না। তাহার মানসিক উত্তেজনা ক্রমশঃ প্রবল হইয়া উঠিল, সে সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত ইন্দুকে কামনা করিতে আরম্ভ করিল, তাহার কেশগুচ্ছরাশি মস্তকে বক্ষে ছড়াইয়া দিয়া বিনয়, মুদ্রিত নেত্রে দীনা হীনা অনশনক্লিষ্টা ইন্দুর দীর্ণমূর্ত্তি অপরূপ রূপ ও বহুমূল্য বসন ভূষণে সাজাইয়া তাহারই ধ্যানে তন্ময় হইয়া রহিল। মানসিক উত্তেজনা তাহার মনকে আকাঙ্ক্ষার ভিন্ন ভিন্ন পথে প্রেরণ করিতে লাগিল। বিনয় ভাবিল ইন্দু তাহার; কোন অধিকারে নলিনাক্ষ তাহাদের মধ্যে ব্যবধান স্বরূপ আসিয়াছিল? কোন অধিকারে অভিমানের ছলে গৌরমোহন ইন্দুকে এই নিদারুণ জীবনব্যাপী যাতনার পাত্রী করিয়াছিলেন? বিনয় এ অবিচার কিছুতেই সহ্য করিবেনা সে যেমন করিয়া পারে এই কেশগুচ্ছরাশি ইন্দুর মস্তকে লাগাইয়া তাহাকে তাহার মানস-পটের চিত্তবিমোহন বসনভূষণে সাজাইয়া তাহার এই মন্দিরে চিরারাধ্যা হৃদয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবী করিয়া রাখিবে।

রাত্রি শেষ হইয়া আসিল নিস্তব্ধ মহানগরী একটা সুপ্ত মহা দানবী ধীরে ধীরে জাগিয়া উঠিল, বিনয় তাহাও বুঝিতে পারিল না। ধীরে ধীরে অভিসারিকার মত উষার হাস্যমুখ পূর্ব্বদিকে দেখা দিল। বিনয়ের দেহের সমস্ত রক্ত উত্তপ্ত হইয়া তাহার প্রায় বিকৃত মস্তিষ্ককে আক্রমণ করিতেছিল, সেদিনের রাত্রি শেষের শীত সে একেবারেই অনুভব করিতেছিলনা। মানসিক উত্তেজনায় ও অনিদ্রায় তাহার চক্ষু দুইটা রক্তবর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল, উষার ক্ষীণ আলোকে সমস্ত জগতের সঙ্গে তাহার শয়নকক্ষ ধূসরচ্ছায়া ধারণ করিতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছিল। ইন্দুর চুলগুলা বালিশের উপরে ছড়াইয়া দিয়া বিনয় কাতরকণ্ঠে বলিয়া উঠিল "মাগো।" তখন এক শান্তি রমণীমূর্ত্তি সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কেনরে? বিনু? বাবা?

বিনয় পাগলের মত মুখ তুলিয়া দেখিল যে সত্য সত্যই মা তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া; তখন সেই বাবিংশতি বর্ষীয় যুবা শিশুর মত মায়ের কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িল এবং মায়ের বুকে মুখ লুকাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। মা পুত্রকে কোলে করিয়া খাটের উপরে বসিয়া তাহাকে আদর করিতে লাগিলেন আর হরসুন্দর ঘরের দুয়ারে দাঁড়াইয়া মাতাপুত্রের কাণ্ড দেখিয়া অবাক হইয়া রহিলেন। বিনয়ের জীবন-নাট্যের একটা নূতন অঙ্ক আরম্ভ হইল।

অষ্টচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

মায়ের কোলে শুইয়া বিনয় ক্রমশঃ ঘুমাইয়া পড়িল, আর ক্লান্ত পথশ্রান্ত মাতা সমস্ত ভুলিয়া পুত্রকে শিশুর মত বুকে জড়াইয়া ধরিয়া বসিয়া রহিলেন। বেলা বাড়িল, হরসুন্দর বাহিরে চলিয়া গেলেন বিনয় তখনও উঠিল না। দুইপ্রহর বেলায় নির্ম্মল হাসিমুখে বিনয়কে ডাকিতে আসিয়া হরসুন্দরকে দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেল। বিবাহ রাত্রির চন্দনচর্চ্চা তখনও তাহার কপাল হইতে মুছিয়া যায় নাই; অবিমিশ্র সুখের বিমল হাস্য তাহার মুখে ফুটিয়াছিল, সে তাহার অবস্থানুযায়ী বেশ পরিধান করিয়া বিবাহ করিতে গিয়াছিল এবং সকাল বেলায় বিনয় কালীঘাটে যায় নাই বলিয়া সে তাহাকে খুঁজিতে আসিয়াছিল। হরসুন্দরকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কখন এলেন?" হরসুন্দর নির্ম্মলের সাজ পোষাক দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিহে তুমি দিনের বেলায় অত দামী রেশমের কাপড়-চোপড় পোরে কোথায় যাচ্ছ?" নির্ম্মল তাহাকে যে কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিল তিনি তাহার উত্তর দিতে একেবারেই ভুলিয়া গেলেন। তাঁহার কথা শুনিয়া নির্ম্মল অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া বলিল, "কাল রাত্রিতে আমার

বিয়ে হয়ে গেছে।" হরসুন্দর বিস্মিত হইয়া আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার বাবা আমাদের নিমন্ত্রণ করলেন না? না হয় নাই খেতুম হে?" নির্মল আরও লজ্জিত হইয়া বলিল, "বড় তাড়াতাড়ি হয়ে গেল আপনাকে খবর দেবার সময় ছিল না।" হরসুন্দর বলিলেন, "বিনু গিয়েছিল তো?" তা হলেই আমার যাওয়া হয়েছে। বিনু সারারাত্রি ঘুমায় নি, সে উঠলেই চল তাকে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে তোমার বউ দেখে আসি!" গোঁড়া হিন্দু হরসুন্দরের কথা শুনিয়া নির্মল আশ্চর্য্য হইয়া গেল, তিনি কেন নির্মলের বিবাহের নিমন্ত্রণের জন্য এত ব্যগ্র তাহা নির্মল একেবারেই বুঝিতে পারিল না। লজ্জায় মাথা নত করিয়া সে উপরে গিয়া দেখিল বিনয় তখনও ঘুমাইতেছে, ইন্দুর চুলগুলা তখনও তাহার মাথার নীচে পড়িয়া আছে, তাহার মাতা সে গুলা যত্ন করিয়া গুছাইয়া রাখিয়াছেন। নির্মল বিনয়ের মাতাকে প্রণাম করিয়া বলিল, "মা কাল আমার বিয়ে হয়ে গেছে।" বিনয়ের মাতা প্রথমে আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন কিন্তু পরেই জিজ্ঞাসা করিলেন, "বিনু কি তোমার বিয়েতে যায় নি বাবা?" নির্মল তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, "গিয়েছিল মা, আজ সকাল বেলা কুশণ্ডিকা সময়ে বিনু যায় নি বলে বাবা আমাকে পাঠিয়ে দিলেন।" বিনয় তখনও ঘুমাইতেছিল তাহা দেখিয়া তাহার মাতা বলিলেন, "দেখ বাবা ও। মুখে বিনুকে বিষ খাওয়ানোর কথা শুনে মনটা বড়ই খারাপ হয়ে গেল। তোমার মায়ের মত আমারও যে ঐ অন্ধের যষ্টি বাবা? আমি কেপে উঠলুম কর্ত্তাকে এক রকম জোর করে কোলকাতায় নিয়ে এলুম। এখানে এসে দেখি বিনু কাল সারারাত্রি ঘুমায় নি, কেঁদে কেঁদে চোখ দুটো জবা ফুলের মত রাঙ্গা হয়ে উঠেছে। বাছা আমায় দেখে আমার কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ে কেঁদে কেঁদে ঘুমিয়ে পড়েছে। দেখ নির্মল বিনু আমার ছেলে বেলা থেকে অভিমানী, কিন্তু তার অভিমানটা বড়ই চাপা। সে যখন চার বছরের কর্ত্তার ভয়ে তখন থেকে সে চাপতে শিখেছে। এমন করে সে অনেক দিন কাঁদে নি, কত দিন সে আমার কোলে ঝাঁপিয়ে পড়েনি তা আমার মনেই পড়ে না। দেখ বাবা আমার কাছে বিনুও যে তুমি ও সে বিনুর মনে বড়ই কষ্ট হয়েছে তা নইলে সে কখনই এমন ধারা করতে পারত না তার কি হয়েছে তুই আমায় খুলে বল্ বাবা। এ চুল গুলা কার?" তখন নির্মল ধপ্ করিয়া একখানা চেয়ারে বসিয়া পড়িয়া হাতে মুখ লুকাইল।

বিনয়ের মাতা তাহা দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাঁদছিস্ কেন বাবা?" নির্মল মুখ তুলিয়া বলিল, কাঁদিনি মা ভাবছি।" "কি ভাবছিস্ বাবা?" "ভাবছি, যে কাজটা আমার কর্ত্তব্য যা সেটা আমি আগে করিনি কেন। তা যদি করতুম তা হলে বিনু এত কষ্ট পেত না। মা তোমাকে মা বলেই আমার নিজের মায়ের আর তোমাতে কোন দিন প্রভেদ করিনি, সুতরাং তোমার কাছে মিথ্যা কথা বলতে পারবোনা কারণ আমি নিজের মায়ের কাছে কখনও মিথ্যা কথা বলিনি। মা আমিও একদিন বিনুর মত পাগল হতে বসিছিলুম কিন্তু বিনু আমায় বাঁচিয়ে দিয়েছে। মা আমি কি করেছি তা তুমি জানো কি আমি দক্ষিণ পাড়ার সদানন্দ চক্রবর্ত্তীর মেয়ে মোহিনীকে বিয়ে করেছি, বিনু আর নেত্য ঠাকুমি এ বিয়ের ঘটক। মা ঐ চুল ইন্দুর, সে বিধবা হয়ে চুল কেটে ফেলেছে, তুমি মা, সন্তানের মনের ভাব বুঝতে মায়ের বিলম্ব হয় না। প্রথম স্বামীর আদায় ইন্দু বাপের ভিটা পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছে। বিনুই তাকে একটা চাকরি যেচে দিয়েছে।" এই সময়ে বিনয় জাগিয়া উঠিল সে দেখিল তখনও সে মায়ের কোলে শুইয়া আছে। বিনয় তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "নিরু তুই কখন এলি? কুশণ্ডিকা হয় নি? বলিয়াই সে বড়ই লজ্জিত হইয়া পড়িল কারণ সে দেখিল যে ইন্দুর চুল গুলা তখনও তাহার সর্ব্বাঙ্গে জড়াইয়া রহিয়াছে, কতকগুলা চুল তাহার মাতার চোখের জলে ভিজিয়া গিয়াছে। বিনয় চুল গুলা লুকাইয়া ফেলিবার চেষ্টা করিল কিন্তু পারিল না। তাহার মাতা সমস্ত চুল গুলা কাড়িয়া লইয়া বলিলেন, "এসব আমি গুছিয়ে রেখে দিচ্ছি বাবা বৌমার চুলের গুছি করে দেবো। তুমি হাত মুখ ধুয়ে এস, বেলা প্রায় পড়ে এল। বিনয় উঠিয়া গেল। কিন্তু তাহাকে অধিক দূর যাইতে হইল না। সেই সময় উঠানে নৃত্যকালী-ঠাকুরাণীর গলায় আওয়াজ শুনিতে পাওয়া গেল। তিনি বলিলেন, "ও হরু, তোমার

গেলি ? আমি নেত্য বাম্নী, তুই এইছিস্ তা দেখেছি এখন জেগে দিবি ত যে। রাঙা বৌদি কোথায় গেলে গো ?" বিনয় দুয়ারে ঘুমকিয়া দাঁড়াইল, তাহা দেখিয়া মা বলিলেন, "বিনু, তুমি নাইতে যাও বাবা, নেত্য দিদি এসেছেন আমি যাচ্ছি।" বিনয় চলিয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে হরসুন্দর ও নৃত্য ঠাকুরাণী উপরে আসিলেন, নির্মল তাড়াতাড়ি চেয়ার খানি ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। ঠানদিদি বসিয়া হরসুন্দরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হক সদানন্দর মেয়ের সঙ্গে পিঙ্গলীর ছেলের বিয়ে দিলুম, এই তোর বিনুর বন্ধু নির্মল নেড়ীর বর, এখন তোদের হরিহরপুরের লোক যা ইচ্ছে হয় করুক। আমার জেলে দিক্ মারুক ধরুক না হয় একঘরে করুক।" হরসুন্দর অবাক হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বল কি ঠান্দি ? সদানন্দর মেয়ের সঙ্গে পীরালীর ছেলের বিয়ে, দাদাকে রাজী করালে কেমন করে ?" নৃত্যকালী একটু হাসিয়া বলিলেন, "সে হয়ত এখনও শোনেওনি।" "তবে কি চুরি করে বিয়ে দিলে ?" "হক তুই কি পাগল ? তুই কি ভেবেছিলি যে পিঙ্গলীর সঙ্গে বিয়েটা হরিহরপুরে ঢাক পিটিয়ে তারপর দিয়েছি ? এ বিয়ের ঘটকী আমি আর ঘটক তোর ছেলে, সদানন্দর শালায় কন্যা সম্প্রদান কোরেছে। ভাল মন্দ বিচার ভগবান করবেন।" তখন হঠাৎ বিনয়ের মা গলায় কাপড় দিয়া নৃত্য-কালীকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া বলিলেন, "ঠান্-দিদি তুমি আমায় কে হও তা জানিনা গ্রাম সুবাদে ঠান্দিদি বলি তাই বল্‌ছি, যে কাজ তুমি করলে এ কাজ দেবতার কাজ মানুষে এমন কাজ করতে পারে না। তুমি একটা বড় বংশকে রক্ষা করলে, দুটি নির্দোষ জীবকে অকারণ শাস্তি থেকে বাঁচিয়ে দিলে ; লোকে তোমায় যাই বলুক, সমাজ তোমায় নিয়ে যাই করুক এর ফল তুমি পরকালে পাবে।" তখন অকারণ ঠান্দিদির চোখ জলে ভরিয়া আসিল।

ক্রমশঃ

ভালবাসার স্তর

(শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার গুপ্ত)

পুরুষ যদি তাহার জীবনে একজন প্রকৃত সঙ্গিনী পাইতে ইচ্ছা করে এবং নারীও যদি তাহার নারীজীবনের একমাত্র অধিকারীকে পাইতে ইচ্ছা করেন তবে তাহা কিরূপে পাইতে হইবে চিন্তার বিষয়, সন্দেহ নাই। বিলাতের প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক মিঃ আর্কিবাল্ড টার্ণার তাহার এক অসাধারণ উপায় বাহির করিয়াছিলেন, তাঁহার নিজের জীবনের একজন প্রকৃত ও সুন্দরী সঙ্গিনীর জন্য তিনি Maidenhead Board of guardians—বরখাস্ত করিয়া তিনি প্রায় পাঁচশতের উপর প্রেমপত্র পাইয়াছিলেন—শুধু কিশোরী ও যুবতী-দিগের নিকট হইতে। পত্রের বহর দেখিয়া তাঁহার বিবাহ-লিপ্সা অন্তর্ধান হইয়াছিল, সন্দেহ নাই। জন-সাধারণের অবগতির জন্য তিনি কয়েকখানি পত্র প্রকাশ করিতেও কুণ্ঠিত হয়েন নাই, সেগুলি শুধু কবিত্বে পূর্ণ নহে নাটকীয় ভাব ও ভাষা তাহাতে ত যথেষ্ট আছে,—তিনি লিখিয়াছেন :—

আমার সঙ্গিবিহীন জীবনের জন্য একটী সঙ্গিনী পাইবার আশা করিয়া আমি যখন 'Maidenhead guardians' এর সাহায্য প্রার্থনা করিলাম, তখন আমি স্বপ্নেও ভাবি নাই যে আমার একটী জীবন লইয়া অগণিত বিবাহার্থী-নারীগণ বিবাদের জন্য কাড়াকাড়ি করিবে ! সত্য কথা বলিতে কি, একই ধরণের আমি প্রায় দুই হাজার পত্র পাইয়াছিলাম, কিন্তু শুধুই কি পত্র ? সেই দিন হইতে দলে দলে লোক মোটরে ট্রেনে, সাইকেলে এমন কি দূর স্থান হইতে পদব্রজে আসিয়াও আমার ড্রইংরুম ভর্তি করিতে লাগিল, অধিকাংশ পত্র পাঠ করিয়া এবং আগন্তুক দিগের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াও আমি এখনও মনের মত সঙ্গিনীর সাক্ষাৎ পাইলাম না, যদিও দূর দূর কত মহাদেশ হইতে পরিণয়-বার্ত্তা লইয়া কত পত্রাদি আসিয়া আমায় কৃতার্থ করিয়াছে, তথাপি, আমার একান্ত ইচ্ছা আমি আমার স্বদেশেরই কোন বালিকার পাণি গ্রহণ করি।

সকলেই জানেন—স্ত্রীলোক স্ত্রীলোককে যত চিনে, পুরুষে তত পারে না তদ্রূপেই আমার মা-ও অনেক পত্র পাঠ করিয়াছিলেন ও অনেক আগন্তুকের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন, কিন্তু মনোমত কাহাকেও পান-নাই।

গত কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া আমার চিঠির থলি হইতে আমি যত পত্র পাইয়াছি—তাহার অধিকাংশই হৃদয়ের মাধুর্য্যে—কিংবা অন্তরের গোপনতম-গুপ্ত-ভাষায় পূর্ণ। লেখিকাদের বয়স সতেরো হইতে সত্তর পর্য্যন্ত উঠিয়াছে এবং আমার পক্ষে তাহাই যথেষ্ট, একজন লিখিয়াছেন :—

যদিও আমি ইতঃপূর্ব্বে দুইজন প্রেমিকের অনুগামিনী তথাপি আমার বয়স এখনও আটাশ হয় নাই, আমার প্রথম স্বামী বিবাহের ছয় মাসের মধ্যেই বাত-রোগে ভুগিয়া মারা যায় এবং দ্বিতীয় প্রেমিক গত ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে হইতে ব্রাজিলের এক নিভৃত কবরে বাস করিতেছেন।

আর একটী বালিকা লিখছেন :—ওগো আত্মার হৃদয়াকাশের নীল-বিহঙ্গম, আমি তোমায় সার্ব্বন্তঃকরণে ভালবাসি।

আর একটী মেয়ে তাহার ভগিনীদিগের সহিত নিজকে তুলনা করিয়া লিখিয়াছে :—

আমার জীবনে ইচ্ছা নয় যে আমি আমার অন্য পাঁচটী ভগিনীর মত হইয়া বাঁচিয়া থাকিতে—যেহেতু তাহারা সকলেই ভালবাসা কাহাকে বলে জানেনা এবং সেই জন্য সকলেই তাহাদিগকে ঘৃণা করে।

আর একটী তিরিশ বৎসরের বালিকা (?) আমায় লিখিয়াছিল :—"আমার জীবন এখন সম্পূর্ণ ভাবে সঙ্গি-বিহীন, তোমাকে পাইলে বড়ই সুখী হইব,.....যদিও আমি এখনও যুবতি নহি, তথাপি—তুমি বোধ হয় শুনিয়া সুখী হইবে, যে আমি একজন ভাল গৃহকর্ত্রী এবং সংসার কিরূপে চালাইতে হয় তাহা ভালরূপেই জানি।

ইহার পরেই আর একখানি পত্র পাইয়াছিলাম—যাহা পাঠ করিলে স্বতঃই করুণ রসের উদ্রেক হয়, পত্র খানি এইরূপ :—আমার পূর্ব্বকৃত পাপের জন্য আমায় ক্ষমা কর, আমার এই অবনতির কারণ জানিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিও না, কিন্তু ওগো জানিও নিশ্চয়—আমায় তোমার জীবন-সঙ্গিনী করিলে, কুকুরের (?) মত আমি তোমার সেবা করিব—ভক্তি করিব—আদেশ প্রতিপালন করিব।

আর একজন লিখিয়াছেন :—আমার কর্ম্মময় জীবন হইতে দিন গুলি একে একে সরিয়া যাইতেছে, দিন যাইতেছে বটে, কিন্তু হৃদয়ের মধ্যে মরুভূর মত শুষ্ক, নির্জ্জন একটী বাসনা নীরবেই শুকাইয়া যাইতেছে, এবং তাহা আমার শেষ মুহূর্ত্তেও চক্ষের সম্মুখে বর্ত্তমান থাকিবে।

ইহা ছাড়া আর যাঁহারা আমাকে অনুগ্রহ করিয়া কৃতার্থ (!) করিবেন বলিয়া লিখিয়াছেন, তাহাদের অধিকাংশই মৃত সৈনিকের পত্নী, কেহবা দুইটী, কেহবা তিনটী করিয়া সন্তানের জননী। ফটল্যাণ্ডের উত্তর অংশ হইতে একজন লিখিয়াছিলেন—যে তিনি অনুগ্রহ করিয়া সন্তান সন্ততিগণকে লইয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ এমন কি বিবাহ করিতেও রাজী আছেন, তাঁহার গুণরাশিরও অন্ত নাই, তিনি মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন যে তিনি শুধু রন্ধন বিদ্যায় পটু নহেন, সৌন্দর্য্যের অধিকারিনীও বিলক্ষণ হইয়াছেন, আর একজন লিখিয়াছিলেন যে মাত্র ট্রেণ-ভাড়া পাইলেই তিনি আমায় বিবাহ করিতে আসিতে পারিবেন।

কেহ যদি আমায় জিজ্ঞাসা করেন কিরূপ মেয়েকে বিবাহ করিতে আমি রাজী তাহার উত্তরে আমি বলিব যে মধ্যবিত্ত সাইজের সুন্দরী-বালিকাকেই আমি বিবাহ করিতে প্রস্তুত, আমি চাই—আমার পত্নী হইবে একজন প্রকৃত—মিষ্টভাষিনী, কর্ম্মপটু এবং আমার প্রতিকার্য্যের হাস্যময়ী সহায়ক, আমি একজন ক্রীতদাসী চাহি না—আমি চাহি জীবন সঙ্গিনী।

মিঃ আর্কিবাল্ড টার্ণারের পত্ররাশি ভালবাসার কথা কিছু প্রকাশ করুক বা নাই করুক, তবে ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে গ্রেট-ব্রিটেনে সঙ্গীহীনা, সান্ত্বনা-হারা নারীর অভাব নাই যাহাদের অন্তর প্রেম পাইবার জন্য সর্ব্বতই ব্যাকুল, এমন অনেকে আছে—যাহারা ভালবাসা কাহাকে বলে জানে না, অথচ তাহারই এক বিন্দু পাইবার জন্য পাগল হইয়া উঠে।

Printed by Bijoy Krishna Dass at the Lakshmibilas Press,
14, Jagannath Dutta Lane, Calcutta.

সচিত্র সাপ্তাহিক পত্রিকা

বাসন্তী

২য় বর্ষ] ৩ই মাঘ শনিবার ১৩৩০, ইং ১৮শে জানুয়ারী [২৭শ সংখ্যা

৺-জুরী যাওয়ার মুরলার (দেবদাসী

জে-জুরীর খাণ্ডোবা

পুনা জেলায় হিন্দু দুই রকমের। একথাটা বলিলে আমার দক্ষিণ দেশের ব্রাহ্মণ বন্ধুরা ভয়ানক চটিয়া যাইবেন কিন্তু কথাটা ঠিক। প্রথম ভাগের হিন্দুরা জাতিতে ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দেন কিন্তু তাঁহাদিগের হিন্দু ধর্ম্ম অনেকটা জৈন ধর্ম্ম মিশ্রিত। কোঙ্কনস্থ বা চিত্তপাবন ব্রাহ্মণেরা দেশস্থ বা প্রকৃত দাক্ষিণাত্য ব্রাহ্মণেরা এবং করহাতা ব্রাহ্মণেরা এই জাতীয়। ইহাদের মধ্যে বৈদিক ধর্ম্ম কতকটা আছে বটে এবং পেশবাদিগের যুগে সম্পূর্ণ রূপে ছিল কিন্তু এখন বৈদিক ধর্ম্ম খাওটা উঠিয়া গিয়াছে শাস্ত্রে নিষিদ্ধ গুরুপালিত কুকুটের মাংস সামাজিক ভোজেও ব্যবহার করিয়া থাকে। দাক্ষিণাত্যবাসী এই সকল শূদ্র ব্রাহ্মণকে মানিয়া চলে কিন্তু ব্রাহ্মণ সকল সময়ে ইহাদিগের পৌরহিত্য করে না। মরাঠারা যতদিন দরিদ্র থাকে ততদিন অন্য জাতির সহিত আবাদ্য বিবাহ করে কিন্তু বড় লোক হইলেই ক্ষত্রিয় হইয়া যায়। মরাঠা জাতির মধ্যে পরমার, যাদব প্রভৃতি ক্ষত্রিয় জাতীয় রাজপুত এককালে বাস করিয়াছিল এবং মরাঠার কন্যা বিবাহ করিয়া মরাঠা হইয়া গিয়াছিল। সেই জন্য মরাঠা

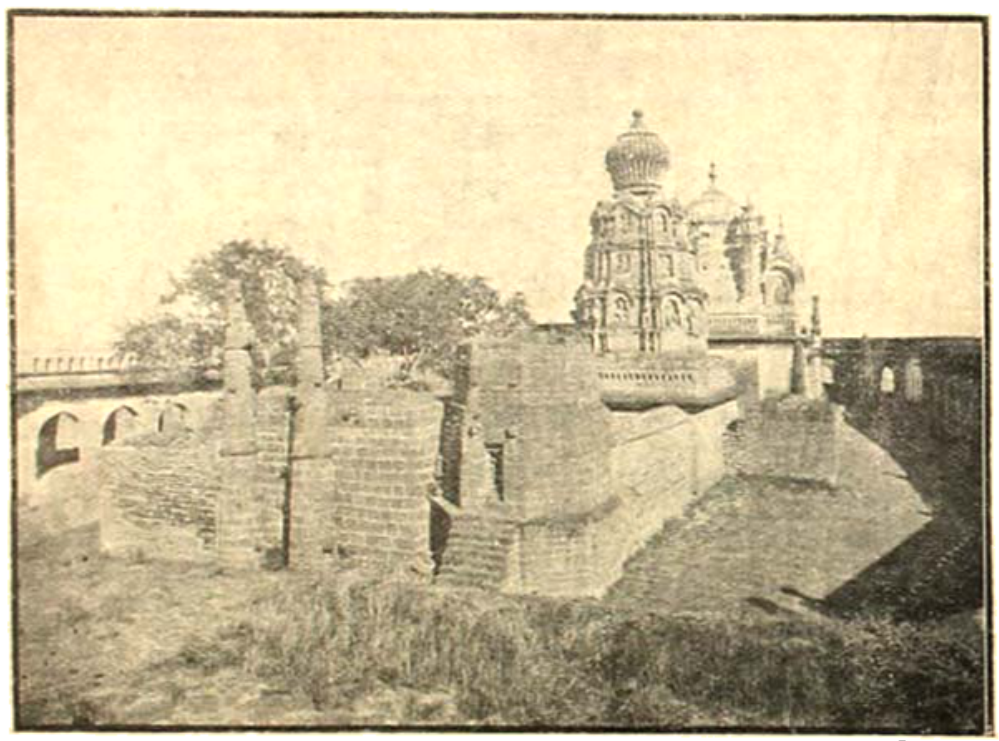

বলিলেও ক্ষতি হয় না। দরিদ্র কি তেজস্বী দাক্ষিণাত্য বাসী এই তিন সম্প্রদায়ের ব্রাহ্মণের মধ্যে অন্য চিন্তা এতই প্রবল হইয়া উঠিয়াছে যে কর্ম্ম কাণ্ডের চিন্তা করিবার অবসর প্রায় তাহাদিগের নাই। দ্বিতীয় বিভাগের হিন্দু প্রায়ই শূদ্র। মরাঠা, কুনবী, বলড় প্রভৃতি শূদ্র এই শ্রেণী ভুক্ত। ইহারা ব্রাহ্মণের পূজিত সকল দেবতাই মানে অথচ বিধবার বিবাহ দেয়, কুলটা নারীকে গ্রহণ করিয়া স্বামী স্ত্রীর মত বাস করে। নিজে-দের দেবতার নিকট মুর্গী বলি দেয় এবং দেবীর উপহার বলিয়া বলি দত্ত ছাগ মাংস ভক্ষণ করে না কিন্তু হিন্দু যাদব বা পরমারের সহিত রাজপুতানার রাজপুতদের বিবাহ হয় না। শিবাজীর মাতামহ বংশ মরাঠী-মিশ্রিত যাদব এবং মধ্যভারতের ধার ও দেবাসের রাজারা মারাঠী-মিশ্রিত পরমার। মরাঠা জাতি যে কি তাহা এখন ও নির্ণয় হয় নাই তবে তাহারা যে উত্তর ভারতের আর্য্য-প্রধান জাতিদের মত নহে সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। এই মরাঠা জাতি ব্রাহ্মণের সাহায্য না লইয়া যে সমস্ত দেবতা পূজা করে তাহাদিগের মধ্যে জে-জুরীর খাণ্ডোবা প্রধান। শিবাজীর ইষ্টদেবী তুলজা পুরের ভবানী দ্বিতীয়। বিখ্যাত বৈষ্ণব সাধু পন্ঢ়র

পুরের বিঠোবা এক কালে এই জাতীয় দেবতা ছিলেন কিন্তু এখন তিনি বিষ্ণু হইয়া উঠিয়াছেন। এই জাতীয় দেবতাদের পূজক জাতিতে শূদ্র এবং তাহাদিগের উপাধি গৌরব বা গুরব। রাষ্ট্রকূট বংশীয় রাজা প্রথম অমোঘবর্ষ দেবের একখানি শিলালিপিতে এক জন শূদ্র গোরবের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং এই শূদ্র পুরোহিতেরা যে অনেক কাল ধরিয়া মরাঠা শূদ্রের পৌরোহিত্য করিয়া আসিতেছে সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই।

দাক্ষিণাত্যের উপত্যকার ছোট বড় অনেক উপত্যকা আছে। প্রথমতঃ দাক্ষিণাত্য একটা বড় উপত্যকা তাহার মধ্যে আবার কোন স্থানে একটা, কোন স্থানে দুইটা বা তিনটা উপত্যকা দৈত্য দানবের রচিত বিশাল সোপানের মত দেখিতে পাওয়া যায়। পেশ্‌বাদিগের রাজধানী পুনার চারিদিকে উপত্যকা। পুনা হইতে বাঙ্গলোর যাইবার যে পুরাতন পথ আছে সে পথ ধরিয়া ১০।১৯ মাইল গেলে প্রথমে একটা বড় উপত্যকা পাওয়া যায়। পুনার নিম্ন ভূমি হইতে হাজার দেড় হাজার ফুট উচ্চ পাহাড়ে উঠিয়া দেখিতে পাওয়া যায় যে পাহাড়ের উপরটা একটা প্রকাণ্ড সমতল ভূমি। এই সমতল ভূমিটাই বড় উপত্যকা, ইহার উপরে আবার ছোট ছোট উপত্যকা আছে। মরাঠা ইতিহাসে প্রসিদ্ধ পুরন্দর দুর্গ এইরূপ একটা ছোট উপত্যকার উপরে নির্ম্মিত হইয়াছিল। পুরন্দর দুর্গ দক্ষিণ দিকে রাখিয়া বাম দিকে চলিয়া গেলে জে-জুরীর গ্রামে পৌঁছান যায়। বড় উপত্যকার একটি ছোট পাহাড়ের উপরে খাণ্ডোবার মন্দির। বাঙ্গালীর কাছে বিশেষতঃ বাঙ্গালী বৈষ্ণবের কাছে জে-জুরী একটী মহা তীর্থ। কারণ মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য তীর্থ পর্য্যটন কালে জে-জুরী গ্রামে গিয়া খাণ্ডোবার মন্দিরে দেবদাসী-দিগকে উদ্ধার করিয়াছিলেন।

শ্রীচৈতন্য দেবের ভ্রমণ কাহিনী প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব কবি গোবিন্দ দাস একখানি কাব্যে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, বৈষ্ণব সাহিত্য তাহা গোবিন্দ দাসের করচা নামে প্রসিদ্ধ। স্বর্গীয় অক্ষয় গোপাল গোস্বামী 'গোবিন্দ দাসের করচা ১৮১৭ শকাব্দে সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন। তাহা হইতে দেখিতে পাওয়া যায় যে গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু পুনা বা পূর্ণনগর হইতে পূর্ব্ব দিকে যাত্রা করিয়া তোলেশ্বরে গিয়াছিলেন, এই তোলেশ্বর মন্দির এখনও বিদ্যমান আছে এবং ইহা গ্রেটইণ্ডিয়ান পেনিন্সুলা রেলের দক্ষিণ বিভাগে উপাস্ ষ্টেশনের নিকট অবস্থিত। তোলেশ্বর হইতে গৌরাঙ্গ দেব দক্ষিণ দিকে যাত্রা করিয়া জে-জুরী নগরে খাণ্ডোবা দর্শন করিয়া ছিলেন।

বিরাজে দেবলেশ্বর পর্ব্বত উপরি।
তাহার বহু দূরে শোভে জিজুরী নগরী॥
খাণ্ডবা নামেতে দেব আছে জিজুরীতে।
প্রভুর সহিত যাই খাণ্ডবা দেখিতে॥
যে নারীর বিবাহ না হয় নানা বাদে।
তার পরিণয় হয় খাণ্ডবা প্রসাদে॥
খাণ্ডবার কাছে কন্যা পিতামাতা আনি।
খাণ্ডবারে কন্যা দেয় বহু ভক্তি মানি॥
দরিদ্র পিতার কন্যা এখানে থাকিয়া।
খাণ্ডবার সেবা করে আদর করিয়া॥
খাণ্ডবারে পতি ভাবি কতশত নারী।
ক্রমে ক্রমে হইয়াছে পথের ভিকারী॥
প্রভাবিত হয়ে সবে খাণ্ডবার স্থানে।
বেশ্যা বৃত্তি কত নারী করিছে এখানে॥
খাণ্ডবার পত্নী বলি পাপ কর্ম্ম করে।
তাহাদের বড়ই দুর্গতি হয় পরে॥
তীর্থ করিবারে এথা আসে বহু জন।
কৌশলে তাদের করে নরকে পাতন॥
এই স্থানে আগে যত দরিদ্র কুমারী।
বিয়ে করে বলে মোরা খাণ্ডবার নারী॥
ইহা শুনি দেখিবারে প্রভু নারীগণে।
উপস্থিত হৈলা তথা অতি সঙ্গোপনে॥
ইহাদেরে ডাকে লোকে মুরারি বলিয়া।
প্রভুর হইল দয়া মুরারি দেখিয়া॥
মুরারি জনের দুঃখ শুনিলে শ্রবণে।
দয়া উপজয়ে অতি নিঠুরের মনে॥
কেমন নিঠুর পিতা বলিতে না পারি।

বিখ্যাত চিত্রকর টিসিয়ান-অঙ্কিত
ভেনাস এবং এডোনিস।

কেমনে মুরারি করে আপন চুমারী।
এই বাক্য শুনি প্রভু যত নারীগণে।
উদ্ধার করিতে যায় মুরারি প্রাঙ্গনে।
মুঞি বলি সে স্থানেতে গিয়া কাজ নাই।
না শুনিলা মোর বাণী চৈতন্য গোঁসাই।
মুরারি পল্লীর মধ্যে মোর প্রভু গিয়া।
পবিত্র করিল সবে হরিনাম দিয়া।

চৈতন্যের নিকট উদ্ধারের মন্ত্র পাইয়া খণ্ডোবার দেব দাসীগণ বৈষ্ণব হইয়াছিল। ইন্দিরা বাই নাম্নী এক বৃদ্ধা দেবদাসী মহাপ্রভুর নিকট বিষ্ণু মন্ত্র গ্রহণ করিয়া দেশ ত্যাগিনী হইয়াছিল। খাণ্ডোবার দেব দাসীরা মুরলা বা মুরলী নামে পরিচিত। তবে ইংরাজের রাজ্য এখন আর কেহ খাণ্ডোবার সেবার জন্য কন্যা উৎসর্গ করিতে পায় না, পুরাতন দেবদাসীদের কন্যারাই বিগত শতবর্ষ ধরিয়া দেবদাসীর কার্য্য করিয়া আসিতেছে। ইহারা খাণ্ডোবার সেবিকা; খাণ্ডোবা রন—দেবতা। ব্রাহ্মণেরা বলেন যে সংস্কৃত কন্দ শব্দ আধুনিক মরাঠী ভাষায় খণ্ডোবা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। খাণ্ডোবার সেবিকা মুরলীরা কিন্তু বৈষ্ণবী। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য দেব যে তাঁহাদিগকে বিষ্ণু মন্ত্র দিয়া উদ্ধার করিয়া গিয়াছিলেন এ কথা তাহারা এখনও বিস্মৃত হয় নাই। তাহারা বলে যে এক বিদেশীয় সাধু আসিয়া তাহাদিগকে বিষ্ণু-মন্ত্র দিয়া গিয়াছিলেন। চৈতন্য দেবের তিরোভাবের পরে চারি শত বৎসর অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে, এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে মুরলারা গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর নাম ভুলিয়া গিয়াছে বটে কিন্তু তাহার স্মৃতি তাহাদিগের মন হইতে একেবারে মুছিয়া যায় নাই।

চৈতন্যদেব যে মন্দির দর্শন করিয়া ছিলেন সে মন্দির মুসলমান অনেক দিন ভাঙ্গিয়া দিয়াছে। সে মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ লইয়া ইন্দোরের প্রাতঃস্মরণীয়া মহারাণী অহল্যাবাই বর্ত্তমান মন্দির ও পাহাড়ে উঠিবার সিঁড়ি নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছেন। মন্দিরের ভিতরে তিনটি পিতলের অশ্বারোহী খাণ্ডোবার মূর্ত্তি আছে, তাহার একটি শিবাজীর পিতা শাহজী; দ্বিতীয়টি শিবাজীর পৌত্র রাজা সাহু এবং তৃতীয়টি আর একজন মরাঠা রাজা তৈয়ারী করাইয়া দিয়াছেন। খাণ্ডোবার মন্দিরের ভিতরে খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর শিলালিপি যুক্ত একটি দেব মূর্ত্তি আছে। বর্ত্তমান মন্দিরের নানা স্থানে সংস্কৃত ও মরাঠা ভাষায় ইন্দোরের মহারাণী অহল্যাবাইয়ের শিলা লিপি আছে এবং ইহার চারিদিকে বড় বড় পাথরের দীপস্তম্ভ আছে। ইন্দোরের হোলকর বংশ ধাঙ্গড় জাতি মরাঠা, জে জুরীর খাণ্ডোবা তাহাদের ইষ্ট দেবতা। এখনও হোলকর সরকার খাণ্ডোবার সেবায় প্রতি বৎসর হাজার হাজার টাকা খরচ করিয়া থাকেন। মরাঠ বংশীয় গোয়ালিয়র ও মালব দেশের রাজা সিন্ধিয়া বা সিন্ধে খাণ্ডোবার পূজায় অনেক টাকা খরচ করিয়া থাকেন। বৎসরে একবার খাণ্ডোবার উৎসব হয়। তখন সমস্ত মহারাষ্ট্র দেশ হইতে মরাঠা তীর্থ যাত্রী জে-জুরী গ্রামে আসে। মুরলারা দিনে তিন বার মন্দিরে আসিয়া নাচিয়া ও 'অভঙ্গ' গাহিয়া যায়। আমরা যে দিন খাণ্ডোবা দর্শন করিতে গিয়াছিলাম সে দিন এক দল সম্পন্ন মরাঠা গৃহস্থ স্নানাৎ করিয়া পুত্র লাভের পরে খাণ্ডোবার পূজা দিতে আসিয়াছিল এবং তাহারা যে মুরলার দল বায়না করিয়াছিল তাহাদের ছবি ছাপা হইল। ইহাদের পুরুষেরা মুরলাদের গর্ভজাত এবং কন্যারা পুরুষানুক্রমে মুরলা বা দেবদাসী।

এখন পুনা হইতে রেলে করিয়া জে-জুরী যাওয়া যায়। সুতরাং খাণ্ডোবার যাত্রীরা বহুর পার্শ্বস্থ পথ অতিক্রম না করিয়া জে-জুরী ষ্টেশনে আসিয়া নামে। জে-জুরী মাদ্রাজ এণ্ড সাদার্ণ মরাঠা রেলের একটি ষ্টেশন। কিন্তু খাণ্ডোবার যাত্রার সময়ে দর্শপ্রাণ মরাঠা তীর্থ যাত্রী এখনও শত শত ক্রোশ পদব্রজে অতিক্রম করে।

শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

স্ত্রীর পত্র

[শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী]

(১)

অনেক দিন হতে ভেবেছিলুম মুখ ফুটে তোমায় একটা কথা বলব, কিন্তু বলতে পারি নি। কেন যে বলতে পারি নি তা বুঝতে পারছো? বলতে পারিনি ভয়ে।

ভয়? স্বামীর কাছে স্ত্রীর ভয়? কথাটা শুনে কেউ কেউ হাসবে, কিন্তু তুমি, বা তোমার ধরণের পুরুষ যারা, তারা হাসবে না। যেহেতু তোমরা জানো স্বামীকে স্ত্রী ভয় করবেই। ভয় যদি না করে তোমরা জোর করে ভয়টাকে তার মনের মধ্যে ঢুকিয়ে দাও। তোমরা পুরুষ, প্রবল, আমরা নারী, দুর্ব্বল, দুর্ব্বলের পরে প্রবলের অত্যাচার যুগ যুগ ধরে চলে আসছে, আর বোধ হয় চলবেও এখনও কিছু কাল অন্ততঃ যতদিন সকল মেয়ে বাধা দেবার শক্তি হারিয়ে না ফেলতে পারে!

আজ প্রথম হতে কথাগুলো মনে পড়ছে, আর তা বলেও যাচ্ছি। আজ মুখোমুখি হয়ে কথা বলতে আসি নি, আড়ালে রয়েছি; আজকের ভীষণ আঘাতে মনটা আমার একেবারে ভেঙ্গে গেছে। কাল তুমি আমার এই পত্র খানা পাবে কিন্তু আমার প্রাণপূর্ণ দেহটাকে তুমি আর পাবে না, তোমার ভ্রূকুটী আমার বুককে কাঁপাতে পারবে না, তোমার প্রহার আমার দেহে বেদনা উৎপন্ন করতে পারবে না।

জানিনে—শুভক্ষণে কি অশুভক্ষণে জন্মিয়েছিলুম, আর আমার সূতিকাগার হাসিতে বা অশ্রুজলে সিক্ত হয়ে উঠেছিল কি না। তবে এটা জানি সত্যকথা যে বাংলার ঘরে মেয়ে জন্মালে বিষণ্ণতা এসে পড়ে, এবং কেউই সুখী হতে পারে না। এটা আমি আগে কোন দিনই বুঝতে পারিনি অথবা বুঝবার চেষ্টাও করি নি, আজ যেমন করে পষ্টভাবে বুঝছি। অল্পভবে আমি বুঝছি—যখন আমি জন্মেছিলুম, আমার বাপ ও অন্য আত্মীয় স্বজন সকলেরই মুখ অন্ধকার হয়ে গেছল, আমার পরে সবাই বিরূপ হয়েছিল, এবং সকলেই মনে মনে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করে ছিলেন যেন আমি না বাঁচি। কারণ বাংলার মেয়ের জন্যে তার বাপকে জ্বালা সইতে হয় বড় কম নয়। কিন্তু কেবল অল্প আদর আমার উপর ঢেলেছিলেন আমার মা আর আজ কোথায় আমার সে মা, সেই স্নেহময়ী, করুণার উৎস আমার সে মা আজ কোথায়?

আমার মা যদি আমায় স্নেহ না করতেন আমি সূতিকাগারেই তো মরে যেতুম। এ শুধু আমার বলে নয়, বাংলার ঘরে মেয়ে জন্মালে সকলেই প্রথাদ গণে, সকলেই অবহেলা করে যদি মায়ের স্নেহ সে সময়ে না পাওয়া যায়, মেয়েগুলো কখনই বাঁচতে পারে না। মেয়ে কেউ চায় না অথচ এই মেয়ে নইলেই যে সংসার চলে না এ কথাটা ভাবতে সবাই ভুলে যান।

মায়ের স্নেহ আদরেই আমি বড় হয়ে উঠলুম। বেশ মনে পড়ছে সে দিনের কথা—যে দিন মা বাবাকে বললেন আমায় স্কুলে দেবার কথা; বাবা একেবারে তেলে বেগুণে জ্বলে উঠে বললেন "রাখো, মেয়েকে আর স্কুলে দিতে হবে না।"

মেয়েকে যে জন্ম দেছেন এই লজ্জাটা যেন মারই, তাঁর অপরাধ তিনি আমায় গর্ভে ধারণ করেছিলেন। কাজেই মা শুধু নিঃশ্বাস ফেলে চলে গেলেন, যাকে জিজ্ঞাসা করে জানলুম আমি পড়তে পাব না, আমার চোখে তখন জল, মা আমাকে জড়িয়ে ধরে আমার চোখের জলের সঙ্গে নিজের চোখের জল মিশালেন। হা রে স্নেহকাতরা মায়ের জাতি!

তারপর—কি জানি কেন, কেমন করে বাবার সুমতী হল, বোধ হয় সংসারের ভাবগতিক দেখে। মেয়েরা একেবারে নিরক্ষরা থাকলে তাদের বিয়ে দেবার অসুবিধা হবে তাই তিনি আমায় স্কুলে দিলেন।

স্কুলে পড়তে পড়তে হঠাৎ পড়া বন্ধ হয়ে গেল। শুনলুম আমার বিয়ের বয়েস হয়েছে, আর স্কুলে যেওয়া উচিৎ নয়। এখন বিয়ের জন্যে নিজেকে প্রস্তুত করতে হবে।

বিয়ে—মনে করতেও যেন কি রকম হয়ে গেলুম। বিয়ে কথাটার সঙ্গে বাঙ্গালির মেয়ে জ্ঞান হওয়া অবধি পরিচিতা। তাকে সব রকমে নিজের নিজত্ব বিসর্জ্জন দিয়ে পরের মতানুসারে চলতে হয় কারণ তাকে বিয়ে করতেই হবে, বউ হয়ে শ্বশুর বাড়ীতে সকলের হুকুমের দাসী হয়ে বাস করতেই হবে? তার নিজের বলে কিছু থাকবে না, সবই পরের। নিজের বলে পর্য্যন্ত উপলব্ধি করতে সে পারবে না, সবই তার পরের জন্য।

তবু—বিয়ে এ কথাটা মনে ভাবতেও আনন্দ হয়, কেন তা জানিনে। কল্পনার চোখে দেখতে লাগলুম, বিয়ে হলে শ্বশুর বাড়ী যাব সকলকে আপনার করে নিয়ে সুখে বাস করব। তখন জানতুম না বিয়ে কি, বিয়ে কাকে বলে। আঃ, যদি জানতুম, যদি বুঝতে পারতুম, তবে আজকের এই মৃত্যুকে তো তখনই বরণ করে নিতুম।

আমার বয়স ক্রমে বারো ছাড়িয়ে তেরয় পড়ল, ক্রমে তেরও উত্তরে যায়। মা আমার বাড়ন্ত গড়নের দিকে তাকান আর নিশ্বাস ফেলেন, বাবা পাগলের মত ছুটাছুটি করেন। স্মৃতিকাগারে যে বিভীষিকা চোখের সামনে জেগে উঠেছিল, আজ তা মূর্ত্তিমান হয়ে একেবারে সামনে দাঁড়িয়েছে।

বড়লোকের মেয়েদের তবু ভালো, তাদের তো টাকার ভাবনা করতে হয় না, যত বিপদ এই মধ্যবর্ত্তী গৃহস্থদের। মেয়ের বিয়ে কিছু না দিয়ে রাখা যাবে না, বিয়ে তো দিতেই হবে, অথচ টাকা বরের কর্ত্তাপক্ষের খাঁই মিটানোর যোগ্য নেই। মেসের শিক্ষিত ছেলেদের কর্ত্তৃপক্ষ তো এত গুলি টাকার খাঁই করে বসেনই তা ছাড়া অশিক্ষিত ছেলেদের কর্ত্তৃপক্ষ ও বড়লোক চান না, তাঁদেরও তো ছেলে।

কথাটা ভারি দুঃখের যে কন্যাদায় যখন পড়ে তখন সবাই পণের বিপক্ষে দাঁড়ায়, দুঃখ করে, কিন্তু যেই ছেলের বিয়ে দেবার সময় হয়, তখনই লম্বা চওড়া কর্দ্দ বার করে বসেন দিতেই হবে। আমিই যে দেখেছি—আমার কাকার ছেলের বিয়ের সময় তিনি বেচারা বউটীর বাপের বাস্তুভিটে বিক্রী করিয়েও পণ নিতে ছাড়েন নি, কিন্তু মেয়েটীর বিয়ে দেবার সময়—এমন পণ প্রথা উচ্ছন্ন যাক বলে অনেক লাফিয়ে ছিলেন, অনেক আর্টিকেল লিখেও ফেলেছিলেন।

যাক—অনেক বাজে কথা বলে যাচ্ছি, মাপ কোরো। আমার বিয়ের ভাবনাতে মা বাপের পেটে অনেকদিন ভাত যায় নি। আমি সামনে যাবামাত্র বাবা আমায় দূর দূর করে তাড়িয়ে দিতেন, মাকে বলতেন "ঘাটুড় ঘরে যদি খানিকটে নুন খাইয়ে মারতে, তা হলে তো সব আপদই চুকে যেত, আমায় আর এত ভোগ তা হলে ভুগতে হত না।"

এই নুন খাওয়ানোর কথাটা আমার মনে ছিল, আর খানিকটা নুন খেয়েই যে মানুষ মরে যায় এই কথাটাই জানতুম, তাই একদিন বাবাকে সকল জ্বালা হতে নিষ্কৃতি দেবার জন্য খানিকটে নুনও খেয়েছিলুম, কিন্তু—পোড়া কপাল আমার, তাতে আমি মরব কেন?

অবশেষে একদিন যথার্থই বিয়ের সম্বন্ধ ঠিক হয়ে গেল। বাবা বললেন তাঁকে দেড় হাজার টাকা সবসুদ্ধ খরচ করতে হবে। ছেলেটী কোনও উপাধিধারী নয়, সামান্য লেখা পড়া জানে, তবে অবস্থা ভালো।

বিয়ে কথাটা মনে করে আমি আমার ভবিষ্যৎ স্বামীকে সর্ব্ব গুণে বিভূষিত দেখলুম। বাবার কথা শুনে মনে প্রথমেই কেমন একটা ধিক্কার এলো, কিন্তু ভাবলুম না, আমায় একেই বিয়ে করতে হবে, বিধাতার যা নিয়ম তা অবশ্য থাকবেই।

আমার বিয়ে হয়ে গেল। শুভদৃষ্টির সময় স্বামীর পানে পূর্ণ চোখে চাইলুম—চোখে জল এলো।

বলতে হবে কি—সে মিছে?

(২)

অনেক আকাঙ্খার জিনিষ তুমি, তাই চোখে জল এসেছিল, আমার চোখ আপনা হতে মুয়ে এসেছিল।

শ্বশুর বাড়ীতে এলুম।

হায় রে অভাগিনী সুখ তোর কোথায়? জগতের ঘৃণা বহন করতে এসেছিস তুই, জগতের চোখে নিতান্ত ছোট হয়েই থাকতে এসেছিস তুই—তুই পাবি সুখ এই

তোর আশা? তোকে বিধাতা পাঠিয়েছেন মা হবার জন্তে, জগতের এই শ্রেষ্ঠ সম্মান লাভ করবার জন্তে। আপনার মধ্যে পাবার মত কিছু তখনই পাবি তুই—যখন সন্তান তোকে মা বলে ডাকবে, তার আগে তুই ব্যর্থ-বোঝা মাত্র।

প্রাণভরা আশা নিয়ে শ্বশুরবাড়ী এলুম। পেলুম কি? হলাহল পান করলুম, গরল আমার কণ্ঠ পর্য্যন্ত উঠল।

জীবনের সব সুখ, সব আনন্দ, সব শান্তি হারিয়ে ফেললুম। তোমার না, তোমার শাশুড়ী আমায় কি লাঞ্ছনা করতেন তা জান কি? আমার দরিদ্র বাপ মা আমায় ভাল করে তত্ত্ব করতে পারেন নি; এ জন্ত কম অপমানটা আমায় সইতে হয়েছে? সেকি কথা? বুকের মধ্যে যায় —ঠিক যেন করাতখানা! যেতে আসতে সমান কাটে। কি কঠিন এই নারীর বুক? এত আঘাত পায় তবুও তো ফেটে যায় না, গুলো হয়ে গুলোর সঙ্গে মেশে না; সান্ত্বনা? হায়রে অবলা নারী, সান্ত্বনা তুই পাবি কোথায়? এ জগতে তোর সান্ত্বনা কোথাও মিলবে না যে।

শ্বশুর মহাশয়—তোমার বাপ আমার কি নাম রেখেছেন তা তো জানো? যখন তিনি আমায় হাড়ীর ঘরের মেয়ে বলতেন, আমার বুকের মধ্যে কি রকম করত তা কি কেউ তোমরা জানবার চেষ্টা একবারও করেছিলে? প্রাণের মধ্যে বড় বেদনা দিনরাত এই সংসারের কাজ, উঠতে বসতে লাঞ্ছনা উঠতে বসতে খোঁটা, উঃ সবইত সহ্য করতে হয়েছে। মরণকে ডেকেছি কিন্তু মরণ তো আসে নি।

তুমি—তুমি আমায় কি দিয়েছ কিছু? দিনরাত আমায় সব চেয়ে নির্য্যাতন করেছ তুমিই। সকলের সব অপমান, লাঞ্ছনা আমি সহ্য করতে পারতুম যদি তুমি আমায় একটু ভালোবাসতে, একটু আমার দিকে চাইতে।

সংসারের কাছেই লাঞ্ছিতা অপমানিতা আমি। একদিন মনে পড়ে কি—আমার মায়ের ব্যারাম তাই বাবার সঙ্গ বাবা এসে আমায় তোমাদেরই দুয়ারে দাঁড়ালেন। মেয়ের বিয়ে দেবার সঙ্গে সঙ্গে মেয়ের পরে তাঁদের সব দাবিই উঠে গেছল মেয়ের সঙ্গে সম্পর্ক থাকত—যদি হেমনি দিতে পারতেন, কিন্তু ভগবান তাঁদের দিন দিন দরিদ্র হতেও দরিদ্র করেছিলেন, তাই বিয়ের পরে একবার মাত্র তত্ত্ব করে আর তত্ত্ব করতে পারেন নি।

মা আমার মৃত্যু শয্যায়। বিয়ের পরে দুইবার মেয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু তোমরা কি অপমান-টাই না করেছিলে বল দেখি, বাবা আমার এবার আমায় নিতে এসে ছিলেন—যদিও বিয়ের আগে আমায় দুধ ঘুর করতেন তবু সেটা যে আন্তরিক নয়, কেবল আমার জন্তে এই লাঞ্ছনা সইতে হবে বলে—তাই। কিন্তু অদৃষ্টে ঘটল ও তো তাই, বাবা আমার দুবারই শুধু চোখের জল ফেলে বিদায় নেছলেন, আমার সঙ্গে দেখা করতে পর্য্যন্ত তোমরা দাও নি।

মা আমার—একবার দেখে আমায় দেখতে চেয়েছেন কিন্তু তোমরা তখনও কি নিষ্ঠুর ব্যবহার করলে? তোমার বাবা মা তখনও বাবার সেই ভাঙ্গা বুকে যা দিতে তো ছাড়েন নি, বললেন—কখনও আমায় পাঠাবেন না। যে মেয়ের বাপ মা ভাল করে তত্ত্ব করতে পারে না তাদের আবার মেয়ের সঙ্গে সম্পর্ক কি?

সম্পর্ক নেই—কেমন করে এ কথাটা তাঁরা বললেন? প্রতিদিনকার অজস্র স্নেহ, ভালবাসা—হা ভগবান, তবু সম্পর্ক নেই—কারণ তাঁরা ভালো করে তত্ত্ব করতে পারেন নি!

তাঁদের পায়ের তলায় পড়লুম—একটিবার আমায় যেতে দিন, আমি আর যেতে চাইব না। কিন্তু না, পাষাণ টলবে, তাঁদের বুক টলবে না।

অবশেষে তোমার কাছে কেঁদে পড়লুম।

হায় হায়, তখন আবেগে ভুলে গেছলুম—তুমিই কাছে আমার! চিরটা দিন চোখ রাঙিয়ে এসেছ, একটা ভাল কথা একটা দিন তোমার মুখে শুনি নি। তোমার পা জড়িয়ে ধরলুম তুমি অনুমতি দাও, আমি যাই।

ওরে নারী—ওরে শতাব্দিনী বাংলার বধূ, কি দেবি তুই? স্বামি দেবতা তোকে কি দান করলেন একবার বল্।.....

পদাঘাত মাথায় তুলে নিলুম। যাও—ওগো আরও যাও—তোমার ও পদাঘাত নয়, ও পুষ্পবৃষ্টি। এই দেহে অমন ঢের চিহ্ন আছে, এ যে দেবতার দান।

হ্যাঁ, তাই তো, আমাদের শাস্ত্রে স্বামী যে দেবতা। তোমরা যা খুসী তাই করতে পারো, স্ত্রীর তাতে একটী কথা বলবার অধিকার আছে কি? বুকের মধ্যে অন্তরটা জমে জমে পাথর হয়ে যাক, বেদনা গলা পর্য্যন্ত ভরে উঠুক কিন্তু সাবধান চোখে যেন জল না আসে, মুখের হাসি যেন না মিলায়।

ভাবি—কি অভিশপ্ত নারীর জীবন আর কতদূরই বা সে সহ্য করতে পারে? বুকটা ভেতরে ভেঙে গুঁড়িয়ে যাকে, কিন্তু ওপরে যে চামড়ার আবরণ সেটা ফাটে না, কিছু দাগ তাতে পড়ে না।

দেবতা—তাই তোমার ইচ্ছামত তুমি আমায় উৎপীড়ন করেছ, মেরেছ, আমি নীরবে তা সয়েছি। পান হতে চুনটুকু খসেছে, তুমি মেরেছ, জল দিতে গিয়ে এক দিন হাত কেঁপে জল পড়েছে, তুমিসেই গ্লাস ছুড়ে আমায় এমন মেরেছিলে,যে মাথায় লেগে আমি অজ্ঞান হয়ে সাত আট দিন ছিলুম।

যখন জ্ঞান হলো, দেখলুম আমি একটা ঘরে বন্ধ হয়ে আছি, আমার শাশুড়ী, তোমার মা শুধু আমার পাশে বসে। বাইরে অনেক লোকের গোলমাল শুনতে পেলুম, বাবার গলাও কানে এল।

শাশুড়ীর মুখে শুনলুম পুলিস এসেছে। এই বদ্ নির্য্যাতন কেউ আমার বাবাকে জানিয়েছিলেন, আমার বাবা পুলিসে খবর দিয়েছেন।

তোমার মা আমার হাত দুখানা জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগলেন, কারণ তোমার দোষ সপ্রমাণ হবে শুধু আমারি কথায়। আমারি কথায়—হয় তুমি মুক্তি পাবে, নয় তুমি জেলে যাবে। শাশুড়ি বুঝালেন—মা, হাজার হোক স্বামী, দেবতা, দেবতাও তো একটা অন্যায় করে থাকেন মা তক্ষের চোখে সবই ভাল হয়ে যায়। না বুঝতে পেরে একটা অন্যায় কাজ করে ফেলেছে, তাকে মাপ করো, তোমার বাপকে বল সে তোমায় মারে নি।.....

নিজের পরেই ঘৃণা এল, তোমার পরে আসে নি। আমি বাবাকে ডেকে পুলিসের সামনেই বলুম আমার স্বামী আমায় মারেন নি। তাকের পর হতে গ্লাস আমার মাথায় এসে পড়েছিল।"

পুলিস এ কৈফিয়তে সন্তুষ্ট হয়ে গেল, কারণ শ্বশুরের কিঞ্চিৎ অর্থও তাদের পকেটে গিয়েছিল। শুধু বাবা আমার শীর্ণ কম্পিত হাত দুখানা বুকের মধ্যে চেপে ধরে রুদ্ধ কণ্ঠে বলে উঠলেন "এ মিথ্যে কথাটা কেমন করে বলতি মা?"

কেমন করে বললুম—তা ও কি বলব? আমার নিজের পরে ঘৃণা, তাই আমায় মিথ্যা কথা বলতে বাধ্য করালে যে। আমার দেহের পর দিয়ে যা যায় যাক, আমি সহ্য করব।

সহ্য করিনি কি? কাল একবার বুকে হাত দিয়ে আমার এই মরা দেহটার সামনে তোমায় স্বীকার করতেই হবে—আমি সহ্য করেছি কিনা?

আমি কত দিন বিছানায় পড়ে ছিলুম, তোমায় একটা দিনের জন্যে ও সে ঘরে ঢুকতে দেখিনি। লজ্জায় কি? কিছুতেই না, পুরুষের স্ত্রীকে মেরে লজ্জা? তোমার মত অনেকেই তো আছে, তুমি যেমন লজ্জা অনুভব কর না, তারা ও তেমনি করে না। লজ্জা করবে মেয়েরা, কারণ সেটা যে তাদেরই একচেটিয়া করা, তাদের ভূষণ।

মরণকে দিনরাত প্রার্থনা করেছি, কিন্তু আমি মরব কেন? কথাই তো আছে মেয়েদের অখণ্ড পরমায়ু, তারা শীগগির মরে না। আমি বেঁচে উঠলুম, ভালও হয়ে গেলুম তোমাদের উৎপীড়ন ও আবার সইতে লাগলুম।

অতিরিক্ত মদ খাওয়ায় চরিত্র হীনতার ফলে এই সময় তুমি কঠিন রোগাক্রান্ত হয়ে পড়লে, মনে পড়ে কি? তখন আর কেউই তো তোমার সেবা করতে আসে নি, এই নারীই তখন যা করেছিল, তোমায় আবার বাঁচিয়ে তুলেছিল, কিন্তু তার আত্মা একেবারে ভেঙে গেল।

তা তাহুক, তা বলে তুমি যে তার দিকে সদয় চোখে তাকাবে এ হতে পারে না। এটা যে তোমার প্রাপ্য ছিল, তাই তুমি পেয়েছ, আমার আত্মা তাহলে তোমার সেবার তো বিশেষ দরকার নেই।

সংসার আর আমায় দিয়ে চলেনা। আমি আর

খাটতে পারিনে, তোমার হুকুম ঠিক তামিল করতে পারি নে। এ রকম করলে কি সংসারে টিকতে পারা যায়, কাজেই তোমার আবার একটী বিয়ে করবার চেষ্টা করতে হল।

এই বাংলা দেশে মেয়ের তো অভাব নেই, তাই সব জেনে শুনে ও কোন হতভাগিনী মেয়ের বাপ তোমার সঙ্গেই মেয়ের বিয়ে দেবার ঠিক করেছেন।

আনন্দে উৎফুল্ল তুমি, এবার বড় ঘরে তোমার বিয়ে। তোমার মা আনন্দে আত্মহারা, কেননা এই কুটুম্বেরা বড়লোক, তত্ত্ব ঠিক মতই করবেন।

আনন্দে আত্মহারা হচ্ছো হও, আমায় না তাড়ালে কি চলে না? এই ছোট ঘরটীতে আমার থাকার জায়গা দেছ, তোমরা কেউ একবার উঁকি দিয়ে ও দেখ না আছি কি মরেছি। এখান হতে তোমাদের আনন্দ কোলাহল শুনতে পাচ্ছি বুক তো ভেঙেছেই নতুন করে আর ভাঙবে না। আমায় কেন এখান হতে তাড়াতে চাচ্ছো, আমি তোমাদের কি ক্ষতি করেছি? এখন আমায় আমার বাপের কাছে পাঠাবে, কিন্তু আমি তো কিছুতেই যাব না। আমার সব তোমরা নিয়েছ; আমার স্বপ্ন, শান্তি, আনন্দ আহ্লাদ, আশা সব তোমরা নিয়ে এই শূন্য দেহটাকে পাঠাবে আমার বাপের কাছে? যাব না, কিছুতেই আমি যাব না। এইখানে, এই ঘরে আমি মরব, আমার মরা দেহটার সৎকার করে যাবাকে আমার খবর দিও তাঁর মেয়ের যে ছায়াটা ছিল সে তা নিয়ে গেছে, কিছু রেখে যায় নি।

নিজেকে একেবারেই আহুতি দেব, সম্পূর্ণ শেষ করে যাব, একটু অবশিষ্ট রেখে যাব না। শুধু আমি নই, এই বাংলার ঘরে এ রকম অনেক অভাগিনী মেয়েই আছে, যাদের চোখের জল দীর্ঘশ্বাস আর বেদনা, সব ওই আকাশের কোণে জমা হয়েছে এখনও হচ্ছে। তখন সব ভেঙে পড়বে এই পৃথিবীর পরে, সে ধাক্কা তার পৃথিবী সইতে পারবে না, সব খণ্ড সে ভেঙে চুরে যাবে।

আসবে—সে দিন আসবে। তোমরা দেখতে পাবেনা গর্ব্বোদ্ধত পুরুষ, আমি দেখতে পাচ্ছি, শূন্য পূর্ণ হয়ে উঠেছে, আর বেশী দেরী নেই। পৃথিবী টলমল করছে শূন্যের দিকে চেয়ে আছে কখন সে আঘাতে পূর্ণ হয়ে উঠবে আর পৃথিবীর বুকে ভেঙে পড়বে। আমি যাচ্ছি, আমার বুকের এ বেদনাও গিয়ে শূন্যে জমা হবে।

আনন্দ কর, আনন্দ করে নাও, আর বেশী দিন নয়।

আমি তবে বিদায়। কাল এ পত্র খানা যখন পাবে আমি তখন চলে যাব। বিয়ের পর এ পর্য্যন্ত আমার পরে অত্যাচার করে তুমি জয়ী হয়েছ ভাবছ, কিন্তু যথার্থ জয় আমারি, কারণ আমি পরিত্যক্ত হয়ে যেতে পারছি তুমি আমায় দূর করতে পারলে না।

দেবী-মূর্ত্তি।

শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী।

তুমি বহু পুত্তলিকা চিন্তহীনা মৃন্ময়ী,
নিত্য তুমি সত্য, দেবি! বিশ্বে চির চিন্ময়ী।
ভক্ত হবে ভক্তি করে যুক্ত তব বন্দনে—
পুষ্প-পাতা—পল্লবেতে, দুর্ব্বাদলে, চন্দনে,
মূর্ত্তি মাঝে প্রস্ফুটিত যুচ্ যে আকর্ষণে—
মাতৃরূপী মূর্ত্তি তব মুক্ত নহে দর্শনে।
মুক্তি দিও শক্তিময়ি! ভক্তে তারা ভাতিতে,
যুক্ত করি শক্তা হ'তে অন্তে নিও শান্তিতে।
অন্ত শুধু সন্ধ' করে, তোমায় কহে মৃন্ময়ী।
নিত্য তুমি সত্য, দেবি! বিশ্বে চির চিন্ময়ী।

আমাদের বিদ্যা।

বেতাল ভট্ট।

আমাদের বিদ্যা ঠিক পত্তর তোষন,
গিলে যাই যাহা পাই না বুঝে ওজন।
মুক্ত পেটে নাহি সয় কুকুরের মত,
টাকপড়ে, লোম ওলি হয় অপগত।
বেড়ালের মত বিদ্যা করি' তপাহার
পরীক্ষা বাতায় করি সমস্ত উদ্ধার,
অথবা গোরুর মত বহু কণ ধরি'
জীর্ণ করি বারংবার রোমন্থন করি'।

বাঙ্গালা-সাহিত্যের গতি

[শ্রীদুর্গাচরণ মৈত্রেয়]

ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে যে দেশে যখন যে ভাবে জাতীয় জীবন গঠিত হইয়াছে তখন সে দেশের সাহিত্যের ধারাও ক্রমে ক্রমে সেই ভাবেই পরিবর্ত্তিত হইয়া পড়িয়াছে। ফলতঃ জাতীয় জীবন কতদূর উন্নত বা কতদূর অবনত হইয়া পড়িল তাহার মাপকাঠি সাহিত্য; একটি অপরটির সহিত ঘনিষ্ট ভাবে আবদ্ধ থাকায় জাতীয় জীবনের গতি সাহিত্যের মারফতে ধরা পড়ে, কোন যুগের চিন্তা, রীতি-নীতি, জ্ঞান, ধর্ম্ম ও সভ্যতা কিরূপ ভাবে পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিল সেই যুগের সাহিত্যেই তাহা জানিবার বেশী সুবিধা করিয়া দেয়। কারণ জাতীয় জীবনের সর্ব্বোত্তমুখী চেষ্টা তাহার সাহিত্যের পৃষ্ঠায় যেন ছাপ না ফেলিয়া পারে না। অধ্যাপক শ্রীরামপদ মজুমদার এজন্য সত্যই বলিয়াছেন "সাহিত্য আকাশে জাল বোনা নহে,—ইহা দেশের জল ও মাটী হইতে উদ্ভূত। ইহার মধ্যে প্রাণের বেগ চাই, স্বভাবের পরিণতি চাই। .....এক এক খানি মহাকাব্য এক এক জাতির এক এক যুগের সভ্যতার ও সাধনার আলেখ্য (ভারতবর্ষ ভাদ্র ১৩২৬)," বাস্তবিকই জাতীয় জীবন উন্নত করিতে গেলেই সাহিত্যের পুষ্টির জন্য চেষ্টা করিতে হইবে।

পুথির সংখ্যা অধিক থাকিলেই কোন সাহিত্যের পরিপুষ্টি সাধিত হয় না। জ্ঞান, ধর্ম্ম এবং সভ্যতার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া দেশ বিদেশের চিন্তার সহিত পরিচিত হইয়া, দেশের ও সমাজের সমস্যাগুলি সমাধান পূর্ব্বক যে সাহিত্য এমন আদর্শ সম্মুখে ধরিতে পারে যাহা অবলম্বন করিয়া জাতীয়-জীবন উন্নতির পথে পরিচালিত হইতে পারে সেই সাহিত্যই প্রকৃত সাহিত্য নামের যোগ্য। "সৌন্দর্য্যের ধারা, প্রেমের ধারা, মঙ্গলের ধারা পাপ ভিতর হইতে একেবারে বিলীন হইয়া যাইবে, ইহাই আমাদের আধ্যাত্মিক প্রকৃতির আকাঙ্ক্ষা—সাহিত্য সেই লক্ষ্য সাধনের নিগূঢ় প্রয়াস ব্যক্ত করিয়া থাকে (রবীন্দ্র – প্রাচীন সাহিত্য)।" এই জন্যই জ্ঞানের দুর্দ্দিনে যখন যে দেশে জ্ঞান ও ধর্ম্মের অভাব পরিলক্ষিত হইয়াছিল, এক দিনে বিলাস ও অত্যাচারের স্রোত ও অপর দিকে মহামারী ও দুর্ভিক্ষের প্রকোপ দেখা গিয়াছিল,তখন দেশের ও তথাকথিত সমাজের সমস্ত পাপের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া মৃতপ্রায় জাতীয় জীবনকে পুনরুজ্জীবিত করিবার জন্য সাহিত্য রাজ্যে তুলসীদাস, কবীর প্রভৃতি চিন্তাশীল লেখকের আবির্ভাব একান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছিল। প্রত্যেক দেশেই জাতীয় জীবনের গতি অপ্রতিহত রাখিবার জন্য একদল শক্তিশালী ও চিন্তাশীল লেখকের প্রয়োজন হয়।

এই সমস্ত বিষয় আলোচনা করিবার পর যখন বাঙ্গালা সাহিত্যের দিকে দৃষ্টি পড়ে তখন স্বতঃই মনে হয় আমাদের সাহিত্য কত দরিদ্র ও উপরি উক্ত গুণ সমূহের অধিকারে কত পিছনে পড়িয়া আছে। এই বিষয় লক্ষ্য করিয়াই অমৃত বাবু তাঁহার কাঁঠাল পাড়ার অভিভাষণে বলিয়াছেন "যখে এখন সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজন —সাহিত্য" বাঙ্গলায় কবিতা পুথির সংখ্যা অল্প নহে, উপন্যাস, গল্প কবিতা চুটকি রহস্য ধারায় ভরিয়া উঠিয়াছে কিন্তু জাতীয় জীবনের উপকর্ষ সাধনের পক্ষে সহায়তা করে এরূপ চিন্তাশীল লেখার নিতান্ত অভাব। সুলভ মুদ্রাযন্ত্রের ও তদপেক্ষা সুলভ কল্পনা শক্তির সাহায্যে সকলেই সাহিত্যিক সাজিয়া নানারূপ কুরুচি সম্পন্ন অশ্লীল রচনা সাহিত্যের পৃষ্ঠায় যোজনা করিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যিক সম্পদ বৃদ্ধি করার পরিবর্ত্তে অধিকতর আবর্জ্জনাময় করিয়া তুলিতেছে। এইরূপ সাহিত্যিকদের প্রভাব আজকাল মাসিক পত্রিকা গুলিতেও বিশেষরূপে বিস্তারিত হইয়া পড়িতেছে। আজ কাল অধিকাংশ মাসিক পত্রিকাতেই ছোট বড় নানা প্রকারের গল্পের নমুনা দেখা যায়, যাহার ভিতর কেবল প্রেমের ঢলাঢলি, 'হাসির ফোয়ারা' আর রসের গড়্ডা।' এই জাতীয় গল্প বা উপন্যাস হইতে অনেক স্থলেই কোনও উপদেশ পাওয়া যায় পরন্তু এরূপ কুৎসিত ও অঘন্য চরিত্র আঁকিয়া সাহিত্যের দেহে শুধু ক্ষত উৎপাদন করা হয়। এই সমস্ত বিষয় আলোচনা

করিতে গিয়া শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্র নাথ ঠাকুর যাহা বলিয়াছেন, তাহা অতি সঙ্গতই হইয়াছে। তিনি লিখিয়াছেন "আর্টের খাতিরে আর্ট এই বুলি ধরিয়া আমাদের দেশের আজকাল বড় বড় সাহিত্যিক কেবল যে আর্টের সার্থকতা ব্যর্থ করিয়াছেন, তাহা নহে, তাঁহারা বাস্তবিকই দেশের সর্ব্বনাশের পথ উন্মুক্ত করিয়া দিতেছেন। একে ত নানা কারণে দেশ ব্রহ্মচর্য্যের পথ হইতে অনেকটা সরিয়া গিয়াছে, তাহার পর যেটুকু বাকি আছে নব প্রকাশিত উপন্যাস সমূহের কল্যাণে সেটুকুও বোধ হয় আর থাকে না। এমন বীভৎস, কুৎসিত গল্প চিত্র সকল প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে, যাহা ভদ্র-সমাজের নিকট সম্পর্কীয় স্ত্রী-পুরুষেরও পরস্পরের মধ্যে জোরে পড়া যায় কিনা সন্দেহ। কাম ভাবকে এই সকল ঔপন্যাসিকগণ তাঁহাদের চিত্রের ভিত্তি করেন (আর্ট ও সাহিত্য)।" প্রকৃতই এরূপ গল্প বা উপন্যাস প্রচার একেবারে বন্ধ হওয়া উচিত। এরূপ হীন রসাশ্রিত রচনা দ্বারা সাহিত্যের পরিপুষ্টি সাধিত হয় না। তবে সকলেই যে—

"মোরে কর সভা কবি ধ্যান মৌন তোমার সভায়
হে সর্ব্বজয়ী হে অবগুণ্ঠিতা,
তোমার আকাশ বুড়ি যুগে যুগে জাগিছে যাহারা
বিরচিব তাহাদের গীতা।" —রবীন্দ্র।

এই সাহস করিতে পারিবেন তাহা নহে, যাঁহার যতটুকু শক্তি আছে, তাহা সম্যকরূপে পরিচালনা করিয়া সৎসাহিত্যের আলোচনা করিলেই প্রভূত মঙ্গল সাধিত হয়। নতুবা নামের জন্য ছুতো সাহিত্যিক সাজিয়া কতক গুলি অশ্লীল ও অশ্লীল চিত্র অঙ্কিত করিয়া দেশের ও দশের অমঙ্গল টানিয়া আনা কোন মতেই উচিত নহে।

এক্ষেত্রে প্রবীন সাহিত্যিক অমৃত বাবুর মন্তব্য স্মরণ করাইয়া দিয়া আমি ক্ষান্ত হইলাম, তাঁহার মতে—"রক্ত বীজের ন্যায় এক শ্রেণীর লেখকের বাড়িয়া উঠিতেছেন, যাহারা দক্ষিণাধানেই পুণ্য সঞ্চয় এই নিগূঢ় তত্ত্ব পাঠক পাঠিকাকে বুঝাইয়া দিতেছেন।.....সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই।

(অভিভাষণ সাহিত্য সম্মিলনী কাঁঠালপাড়া)।"

জগতের শ্রেষ্ঠ লোক কে? মিঃ কেলওয়ে বলেন:—জীবের কষ্ট লাঘবের জন্য যাহার চেষ্টা যত ফলবতী হইয়াছে তিনিই তত বড় লোক। ইনি সেনেটর আর্কোনিকে এই আখ্যা দিয়াছেন। বার্ণাডশ বলেন যার লাইনে যে বড় সেই তাকে বড় আখ্যা দেবে—আমার লাইনে কে বড় তা বলতে হবে কি?

• • • •

মিস সিবিল অর্থচাইক বলেন আমি কবি বা আর্টিষ্টকেই বড় আখ্যা দিব। মহিলা র‍্যাচেল বা বার্ণাডশ হতে পারেন। নারী এই আখ্যা পেতে পারেন কি? কুমারী মত রয়ডেন এ আখ্যা পেতে পারেন। নারীত্ব তার মধ্যে ফুটে উঠেছে। এ্যাব্রাহাম লিঙ্কনকেই আমি বড় মনে করি।

এক জন বলছেন যে বসন্তের রোগ দেখেছে সে ডাঃ জেনারকেই বড় বলবে।

• • • •

ইউরোপে এখন ১৪ জন রাজা ও দশ জন প্রেসিডেন্ট আছেন।

জগতের লোক সংখ্যা নাকি ১৪০০,০০০,০০০। নারী মোটর চালিকার সংখ্যা ইংলণ্ডে ১০০,০০০।

• •

যুদ্ধের আগের চেয়ে অস্ত্রধারী লোকের সংখ্যা এখন ইউরোপে বেশী।

• • • •

হাউস অব লর্ডের সভ্য সংখ্যা হাউস অব কমন্স অপেক্ষা প্রায় ১০০ বেশী।

• • • •

১৯১০—১৯১৪ সালে ক্যানেডা আমেরিকার নিকট ৩০০,০০০ নূতন অধিবাসী পাইয়াছিল।

• • • •

যুদ্ধে কর্ম্ম শক্তি হারাইয়া পেনসন পাইতেছে এমন লোকের সংখ্যা ৭১২৪০০০।

• • • •

১৯১৪ সনে ইংলণ্ডের জাতীয় ঋণ জন প্রতি পড়তা পড়ে ১৫ পাউণ্ড এখন ১৭০ হতে ২০০ পাউণ্ড।

সংগ্রহ

[মানবেন্দ্র নাথ বসু]

গাছেদের কান্না :—প্রায় সত্তর বছর আগে বিলাতে একরকম গাছ দেখতে পাওয়া যেত সেগুলো মাঝে মাঝে প্রায় একঘণ্টা ধরে জল ফেলতো, লোকে গাছের কান্না বলেই তাকে অভিহিত কোরতো।

খৃঃ পূঃ ১৮৫৪ অব্দে ডেভিড লিভিংষ্টোন এই 'কান্নার' কারণ আবিষ্কার করেন, তিনি বলেন ওটা গাছের কান্না নয়—গাছের কতকগুলি কীট পতঙ্গ হতেই এই জল পতনের সৃষ্টি, উদ্যানরক্ষক বা মালীরা এই ছোট ছোট নীল পতঙ্গদের খুব সহজেই চিনতে পারে।

এই নীল পতঙ্গরা সচরাচর খুব ভোরেই গাছের রস চুষে নেয়। লোভবশত তারা এত বেশী রস টেনে নেয় যে সমস্ত দেহ পরিপূর্ণ হয়ে তাদের লেজ দিয়ে অবশিষ্ট রস বেরিয়ে পড়ে। সেই রস গাছের পাতায় জমা হয়ে থাকে পরে বাতাসে গাছ নাড়া পেলে সেই সঞ্চিত রস বৃষ্টির জলের মত ঝরে পড়ে।

কুইনাইনের জন্ম :—কুইনাইনের আজকাল আমাদের দেশে যত কাজে লাগে অত অত দেশে এর সিকি ভাগও লাগে না, ১৬৪৪ খৃষ্টাব্দের ইংরাজীতে একে বলা হোত "Je suits Powder" রাজা দ্বিতীয় চার্লস এর সময় থেকে এখন পর্য্যন্ত কুইনাইন অরের যম হয়ে বাস কোরছে।

'পেরু' ভ্রমণকালে দু'জন স্পেনবাসী ভদ্রলোক কুইনাইনের গাছ আবিষ্কার করেন, পরে দেশে Linnacus নামে বৃক্ষতত্ত্ববীদের কাছে তা পাঠিয়ে দেন। পেরুর স্পেনীয় শাসনকর্ত্তার পত্নীর নামানুসারেই Linnacus গাছগুলির নাম রাখলেন সিন্‌কোণা (cinchona) যেহেতু শাসনকর্ত্তা পত্নী ঐ গাছগুলির সাহায্যেই জ্বর থেকে আরোগ্যলাভ করেছিলেন। তারপর থেকেই দলে দলে—অত্যধিক পরিমাণে সিন্‌কোণা ভারতবাসী বিদেশের দ্বারা ভারতে আনীত হয়।

কুইনাইনের গাছ শুধু ভারতে নয়। এরপর হতে আরও অনেক দেশে পাঠানো হোল, তবে স্পেন সরকার তাতে কিঞ্চিৎ বাধা দিয়াছিলেন।

অল্পদিনের মধ্যেই পেরু থেকে সিন্‌কোণা ভারতে এত বেশী পাঠান হোতে লাগল যে ১৮৬০ খৃষ্টাব্দ থেকে পেরু সরকার পরিমিত ভাবে তা ভারতের পাঠাবার ব্যবস্থা কোরলেন।

গরুর বাহাদুরী :—পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে ভাল গরুটী ব্রিটীশ কলম্বিয়ার Agassir সহরে বর্ত্তমান আছে। গরুটীর নাম 'মেইকো,' ইকো গত বৎসরে এত দুধ সরবরাহ করেছিল যে পৃথিবীর কোন গরুই তা একবৎসরে দিতে পারে না।

গতবৎসরে সে সর্ব্বশুদ্ধ দুধ দিয়েছিল প্রায় ১৪৪৪ সের বা ৩৮৬ মণ ৩ সের। ইকোর পূর্ব্বে যে গরুটী পৃথিবীজয়ী হয়েছিল সে এর চেয়ে এক মণ তিন সের দুধ কম দিয়েছিল ইকো দিনে চারবার করে দুধ দিত—কিন্তু কেউ কখনো তাকে গোয়াল থেকে মাঠে পর্য্যন্ত নিয়ে যায় নি, তবে নিজের ঘরে বসে-ই ইকো কম খেত না যে দিন বেশী খিদে পেত সেদিন তাকে দেওয়া হোত দুমণ খইল ১৫ সের ঘাস আর অতি অল্পই জল, এরকম গরু আমাদের দেশে হলে কাজ দিত সন্দেহ নেই, তবে কম খেয়ে খাটতে পারে বেশী এমন গরুর দরকার হলে আমাদের দেশেই তা পাওয়া যাবে।

• • • •

পুচকেরা ধনবান্ :—নিউফাউণ্ডল্যাণ্ডে যতগুলি কুকুর আছে তার মোট সংখ্যা ৪০,০০০ হাজার।

• • • •

বছরে ইঁদুরে নষ্ট করে প্রায় ১৮০,০০০০০ হাজার টাকার জিনিষ।

• • • •

ডাউনশীর Weslyan গীর্জ্জার একটী ভদ্রলোক নিরানব্বই বছর বয়সে প্রথম বিয়ে কোরেছেন।

• • • •

ক্রাণ্সের মধ্যে যে সবচেয়ে মোটা তার বয়স ষোলো বার বছর, ওজনে প্রায় চব্বিশ মণ।

• • • •

রৌপ্য মুদ্রা প্রথম প্রচলিত হয় খৃষ্টপূর্ব্ব ২৬৯ অব্দে কেবিয়ন নিকটের টাঁকশালে।

ব্যতিক্রম

(উপন্যাস)

[শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্-এ]

ঊনপঞ্চাশত্তম পরিচ্ছেদ

সেদিন হঠাৎ বৃষ্টি হইয়াছিল, বালিগঞ্জের মাঠে জল দাঁড়াইয়া গিয়াছিল সুতরাং টেনিস খেলা হইল না। ছাত্রের সহিত বিনয় যখন বাসায় ফিরিতে উদ্যত হইল তখন ছাত্রটী হঠাৎ প্রস্তাব করিয়া বসিল, "স্যার একবার পিসির বাড়ী যাবেন?" বিনয় বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "পিসির বাড়ী কেন হে?" "পিসি-মা একবার আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান।" "আমার সঙ্গে? কেন বল দেখি?" "তা ঠিক বলতে পারিনি স্যার তবে পিসি-মা অনেক করে বলে দিয়েছে। যেমন স্যার গোপনে আপনাকে একটা কথা বলে রাখি আপনাকে কোন রকমে পিসিমার কাছে পৌঁছে দিতে পারলে নগদ পঞ্চাশ টাকা। অর্দ্ধেক বখরা আপনাকে দিতে পারবনা স্যার কলেজে অনেক দেনা হয়ে গেছে। তা নইলে দিতুম বুঝলেন স্যার? আমার দশ আনা আপনার ছ-আনা।" ছাত্রের অমায়িকতায় প্রীত হইয়া বিনয় বলিল, "তোমায় কিছুই বখরা দিতে হবে না, চল এখনই তোমার পিসির বাড়ী ঘুরে আসি।" ছাত্র উল্লাসে লাফাইয়া উঠিল এবং আগে আগে পথ দেখাইয়া চলিল।

ছাত্রের উল্লাসটা বিনয়কে একেবারেই স্পর্শ করিল না কারণ ছাত্রের পিতৃষসার আহ্বান তাহার নিকটে আশ্চর্য্যজনক বোধ হইয়াছিল। যেখানে ইন্দু চাকরি করে সে বাড়ীর কর্ত্রী তাহাকে কেন ডাকিয়াছেন একথাটা বুঝিতে বিনয়ের অনেক বিলম্ব হইয়া গেল। মেঘিতে মেঘিতে ছাত্র পিসির বাড়ীর দুয়ারে আসিয়া পৌঁছিল। এবং দুয়ারে দাঁড়াইয়াই হাঁকিল, "পিসি বাজির টাকাটা!" বিনয় তাহাকে একটা তাড়া দিয়া বলিল, "আগে পিসির কাছে চল তারপরে টাকার ভাগাযা কোরো।"

পিসি তখন বাড়ীর সম্মুখের বাগানে পাইচারী করিতেছিলেন। তিনি ভ্রাতুষ্পুত্রের গলার আওয়াজ শুনিয়া ফটকের দিকে আসিলেন এবং বিনয় ও তাহার ছাত্রকে দেখিয়া বলিলেন, "বিনু, এই বুঝি তোর মাষ্টার? আসুন আসুন আমি আপনার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে বড়ই ব্যগ্র হয়ে আছি।" বিনয়কে সঙ্গে করিয়া বাড়ীর দিকে যাইতে যাইতে পিসি ভ্রাতুষ্পুত্রের পুরস্কারের কথাটা এমন ভাবে ভুলিয়া গেলেন যে বিমল বেচারা পিছন হইতে বলিয়া উঠিল, "ও পিসি বাজীর টাকার কথাটা একেবারে ভুলে গেলে যে?" পিসি বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "সকল সময় ছেলেমানুষি করিস কেন বিনু?" বিমলচন্দ্র হতাশ হইয়া আহার্য্যের সন্ধানে চলিয়া গেল।

বিনয়কে সুসজ্জিত ড্রয়িংরুমে বসাইয়া বিমলের পিসি খানসামাকে চা আনিতে হুকুম করিলেন। তাহা শুনিয়া বিনয় তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, "দেখুন আমি একবার চা খেয়ে এসেছি, আর একবার চা খেলে হয়ত রাত্রে ঘুম হবে না।" বিমলের পিসি বলিলেন, "আচ্ছা চা না খান সরবৎ আনতে বলছি। একটা কিছু না খেলে আমি মন খুলে আপনার সঙ্গে কথা কইতে পারব না। বেয়ারা মিসেস্ গাঙ্গুলীকো ইধার বোলাও।" অল্পক্ষণ পরে যখন খানসামার সহিত ইন্দু আসিয়া উপস্থিত হইল তখন বিনয়ের কাল মুখখানা আরও কালো হইয়া গেল। ইন্দু আসিয়া নতমুখে ঘরের কোণে দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কি আমাকে ডাকছেন?" কর্ত্রী বলিলেন, "দেখ মিসেস্ গাঙ্গুলী, মিষ্টার ব্যানার্জ্জী চা খাবেন না তার জন্যে ভাল করে কমলালেবুর সরবৎ তৈরী করে নিয়ে এসো; আর দেখ ফল মূল কি ভাল খাবার ঘরে যা থাকে বাবুর্চির কাছ থেকে চেয়ে আনো।" বিনয় আর রাগ সামলাইতে পারিলনা সে জিজ্ঞাসা করিয়া বসিল, "সরবৎটাই আসুক আর খাবারে প্রয়োজন নাই। আপনাদের বাড়ীর

গভর্ণেসের কি এ সকল কাজও করতে হয়?" কর্ত্রী বিনয়ের মনের ভাব বুঝিয়া হাসিয়া ফেলিলেন, এবং বলিলেন, দেখুন আমাদের দেশের ঘরে থাকতে হলে একটু আধটু ফাই-ফরমাস খাটতে হয়।" বিনয় যখন কর্ত্রীর সঙ্গে কথা কহিতেছিল তখন, ইন্দু চলিয়া গিয়াছিল, বিনয় কর্ত্রীর উত্তর শুনিয়া আর কিছু বলিল না বটে কিন্তু মনের ভিতরে রাগ বাড়িয়াই চলিল। ইন্দু যখন সরবৎ ও খাবার লইয়া আসিল তখন বিনয় ঘরের দুয়ার পর্য্যন্ত আগাইয়া গিয়া সমস্ত জিনিস বহিয়া আনিল। সরবতের গ্লাসটা তুলিয়া লইয়া খাবারগুলা একটা টেবিলের উপর রাখিয়া দিল। ঠিক এই সময়ে একটি কালা সাহেব ড্রয়িং রুমে প্রবেশ করিলেন, তাহার হাবভাব দেখিয়া বিনয় বুঝিল যে তিনিই বাড়ীর মালিক। কর্ত্রী উঠিয়া বিনয়ের সহিত স্বামীর পরিচয় করাইয়া দিলেন এবং বলিলেন, "দেখুন মিঃ ব্যানার্জ্জী মিঃ ঘোষালের সঙ্গে আপনার পিতার পরিচয় আছে।" বিনয় বলিল, "ওঃ।" মিঃ ঘোষাল বলিলেন, "আপনি হরিহরপুরের মিঃ হরসুন্দর ব্যানার্জ্জীর ছেলে ত?" ইন্দু তখনও ঘরের কোণে সামান্য দাসীর মত দাঁড়াইয়াছিল বিনয়ের দৃষ্টি তাহারই দিকে আবদ্ধ ছিল সুতরাং সে উত্তর দিল না। মিঃ ঘোষাল ঘোরতর সংসারী লোক তিনি অল্প সময়ের মধ্যে কাজ সারিয়া লইবার অভিপ্রায়ে স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি গো মঞ্জরীর সঙ্গে আলাপ করে দিয়েছ ত?" কর্ত্রী বলিলেন, "মিঃ ব্যানার্জ্জী এই মাত্র এলেন, বিমু এসেছে মঞ্জরী এখন তাকে খাওয়াতেই ব্যস্ত আছে। মিসেস্ গাঙ্গুলী বিমুর যদি খাওয়া হয়ে থাকে তাহলে তাকে আর মঞ্জরীকে ড্রয়িংরুমে ডেকে আন ত বাছা! ইন্দু চলিয়া গেল।

মিঃ ঘোষাল নানা প্রসঙ্গের অবতারণা করিয়া বিনয়ের সঙ্গে পরিচয়টা ঘনাইয়া লইলেন কিন্তু বিনয় সে দিন অধিক কথা কহিল না। বিমল ও মঞ্জরী যখন আসিয়া পৌঁছিল তখন সে ঘোষালের কন্যার সহিত দুই চারিটা কথা কহিয়াই উঠিয়া পড়িল। বিনয় ও বিমল বিদায় হইয়া বাহিরে আসিলে বিমল হঠাৎ বলিয়া উঠিল, "ঐ যা তার বাজীর টাকাটা আনতে ভুল হয়ে গেছে। আপনি একটু দাঁড়ান না তার আমি পিসির কাছ থেকে টাকাটা নিয়ে আসি?" এই বলিয়া শিক্ষকের উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া সীমান বিমল চন্দ্র দুই লাফে বাড়ীর ভিতরে ঢুকিয়া পড়িল। ড্রয়িংরুমের খোলা জানালার ভিতর হইতে আওয়াজ আসিল, "দেখ পিসি গভর্ণেসটি ভদ্রলোকের মেয়ে তাকে আমার মত খাটালে টিকবে না। এত তো চাকর বাকর রয়েছে তাদের হুকুম করলেই পার।" "মেম ঘোষাল চাকর চাকরের মতই রাখতে হয়।" বিনয় শুনিয়া শিহরিয়া উঠিল। কর্ত্রী আবার বলিলেন, "দেখ মিসেস্ গাঙ্গুলী এইবার থেকে যখন ড্রয়িংরুমে ঢুকবে সাড়া দিয়ে ঢুকবে, বুঝলে?" ইন্দু বলিল, "যে আজ্ঞে।" ইন্দু যে ভাবে কথাটা বলিল, জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে তাহাদের যি চাকর ঠিক এই ভাবেই উত্তর দিত, বিনয়ের হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল যে ইন্দুর মানুষ করা যি রামার মা এই রকম সুরেই বিনয়ের কথার উত্তর দিত, রাগে তাহার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া যাইতে লাগিল।

এই সময় বিমল চন্দ্র আসিয়া বলিল, "তার পিসেমশাই বোধ হয় আজ ফিতে এনেছে হড়াৎ করে নগদ পঞ্চাশটা টাকা ফেলে দিয়েছে। দেখুন তার মঞ্জরীর গভর্ণেসটা বলে যে আমার এখন কীটসের বই পড়া উচিত কিন্তু রাবণের বই পড়া উচিত নয়। মেয়ে মানুষের অতটা ন্যাকামো ভাল নয়। আর দেখুন পিসি বলে দিয়েছে যে আপনি আর একদিন আসবেন তাহলে আবার পঁচিশটা টাকা!" বিনয়ের ছাত্রের বিনয়ে সান্ত্বিশয় প্রীত হইয়া বলিল, "বাপু তুমি আছাড় খেয়ে পোড়ো, তোমার আর বয়রণ, শেলী বা কীটস্ পড়ে দরকার নেই।"

পঞ্চাশত্তম পরিচ্ছেদ

বিনয় যখন কাল মুখখানি অন্ধকার করিয়া বাসায় ফিরিয়া আসিল তখন হরসুন্দর মহোল্লাসে স্ত্রীর নিকটে বিনয়ের নূতন বিবাহের সম্বন্ধ করিতেছিলেন, অর্থাৎ সম্বন্ধের কথা বলিতেছিলেন। মাতা যত শীঘ্র পুত্রের মনোগত ভাব বুঝিতে পারেন অন্য কেহ তাহা

পারে না। বিনয়ের মাতা সমস্ত বুঝিয়াও নীরবে নূতন বিবাহের কথা শুনিয়া যাইতেছিলেন। হরসুন্দর বলিলেন "দেখ, বিনুর প্রথম বিয়েটার সময়ে পয়সার লোভ এড়াতে পারি নি, কি বিষম ভুলই করে ফেলেছি। যা হবার তা হয়ে গেছে এবারে বিনুর পছন্দমত বিয়ে দেবো। তা দেখ গিন্নি সত্যেরো আঠারো বছরের ধাড়ী বউ যদি বুট জুতা পায়ে দিয়ে ফস্‌ফস্ করতে করতে একেবারে হরিহরপুরের পুজোর দালানে গিয়ে ওঠে তাতেও আপত্তি কোরবো না। ঐযে অবিনাশ ঘোষালের মেয়েটি, যার কথা তোমায় বলছিলুম, সেটি দেখতে মন্দ নয়। লেজে থাকে বেন পরীটি। ঘোষালের পোকে বলে দিয়েছি কোন রকমে বিনুকে ভুলিয়ে ভালিয়ে তার বাড়ী নিয়ে গিয়ে যদি একবার দেখাতে পারে তাহলে নিশ্চয় তার মনে ধরবে। তুমি কি বল?" বিনয়ের মাতা উত্তর দিল না দেখিয়া হরসুন্দর আপন মনে বকিয়া যাইতে লাগিলেন, "দেখ, ঘোষালের অবস্থা ভাল, দেবে থোবে মন্দ নয় তবে এবার আর কর্ণ-টর্ণ দেবো না, মেয়ের বাপ নিজের ইচ্ছায় জামাইকে যা দেবে তাই নেবো।" এই সময়ে বিনয় আসিয়া উপস্থিত হইল, পুত্রের মুখের ভাব দেখিয়া তাহার মাতা স্বামীকে বলিলেন, "দেখ কদিন ধরে দেখছি বিনুর মুখখানা বড়ই ভার, বিয়ের কথাটা এখন আর দিন কতক তুলোনা। কিছু দিন পরে বিনুর মন ঠাণ্ডা হলে বিয়ে দিলেই হবে।" হরসুন্দর কখনও বাধা সহ্য করিতে পারিতেন না তিনি স্ত্রীর কথা শুনিয়া একটু রাগিয়াই বলিলেন, "তোমরা পুরুষের মনের ভাব একেবারেই বুঝিতে পার না। রাঙা টুকটুকে বউ পেলে ছেলের মন একদিনে ভাল হয়ে যাবে। ঘোষালের মেয়ে পছন্দ না হয় আর কারও মেয়ে দেখুক, ওর যাকে পছন্দ হয় তাকেই বিয়ে করুক।" হঠাৎ বিনয়ের মাতা বলিয়া উঠিলেন, "বিনুর যাকে পছন্দ হবে তাকেই বিয়ে করতে দেবে ত, এরপর অমত করবে না?" "কেন অমত করবো তবে বামুনের মেয়ে হলেই হোলো।" "বামুনের মেয়ে নয়তো কি মুচির মেয়ের সঙ্গে ছেলের বিয়ে দিতে যাব? বামুনের মেয়ে বিনুর পছন্দ, আমারও পছন্দ সব ক্ষান তবে তোমার "পছন্দ হলেও হয়।" "দেখ গিন্নি একবার যা হয়ে গেছে তা হয়ে গেছে এবার যদি বিনু পীরালির মেয়েকে বিয়ে করতে চায় তাতেও আমার অমত নেই।" বিনয়ের মাতা মনে মনে হাসিলেন প্রকাশ্যে কিছু বলিলেন না।

এই সময়ে নির্মল আসিয়া হরসুন্দরকে বলিলেন, "হরিহরপুর থেকে আমার শ্বশুর এসেছেন, বাবা একবার আপনাকে নিয়ে যেতে বলেছেন।"

হরসুন্দর সহাস্যে আগমন সংবাদ শুনিয়া সকল কথা ভুলিয়া জোড়াসাঁকো যাত্রা করিলেন। নির্মল তাঁহার জন্য গাড়ী আনিয়াছিল, সে হরসুন্দরকে গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া উপরে আসিল। বিনয় বাসায় ফিরিয়া আসিয়া প্রথমে মাতার কাছে গিয়াছিল কিন্তু সেখানে পিতাকে দেখিয়া একেবারে নিজের ঘরে চলিয়া গেল। নির্মল যখন হরসুন্দরকে গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া ফিরিয়া আসিল তখন বিনয় নিজের ঘরটা অন্ধকার করিয়া বসিয়াছিলেন। সে এতটা অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছিল, যে নির্মলের সদার আওয়াজ তাহার কানে পৌঁছায় নাই। সে যখন বিনয়ের মাতাকে তাহার কথা জিজ্ঞাসা করিল তখন তিনি বলিয়া দিলেন, "ঐদিকের ঘরে বাবা! নির্মল কিন্তু কোণের ঘরে গিয়া অন্ধকারে বিনয়কে দেখিতে পাইল না। সে যখন মৃদুস্বরে ডাকিল, "বিনু," তখন চমকাইয়া উঠিয়া বিনয় বলিয়া উঠিল, "কে রে, নিরু?" নির্মল জিজ্ঞাসা করিল, "অন্ধকারে কি করছিস্?" বিনয় উত্তর দিল, "আলো সহ্য হচ্ছে না।" এই বলিয়া সে সম্মুখের বাতীদানের একটা বাতী জ্বালিয়া দিল, নির্মল সেটা ফুৎকারে নিভাইয়া দিয়া বলিল, "তোর কি মাথা ধরেছে?" বিনয় বলিল, "মাথা ধরেনি তবে সেটা ঠিক জায়গায় আছে কি না সন্দেহ।" "ছাত্র পড়াতে গেলি নে?" "সে আজ পিসির বাড়ী, পঞ্চাশ-টাকা বাকি দিয়েছে বলে ছুটী নিয়েছে। আচ্ছা নিরু, মলিনাক্ষরা তো চাটুয্যে, তবে ইন্দুকে তার মনিব দিদেস মাখুজ্জি বলে কেন?" "তুই কি ঘোষালের বাড়ী গিইছিলি নাকি?" "হাঁ, গিয়েছিলুম, ছাত্র বন্ধু, আমাকে তার পিসীর কাছে প্রদর্শন করতে নিয়ে গিয়েছিল, সে অবশ্য বোঝেনি যে সে তার মাষ্টারটিকে এক্সিবিট করতে নিয়ে

যাচ্ছে কিন্তু আমি তাই বুঝলুম।" "বিনু, ঘোষাল যে কেন ইন্দুকে মিসেস গাঙ্গুলি বলে তাকে তা তো এখন বুঝতে পারলুম না। আমার সেখানে যাওয়াও অসম্ভব।" বিনয় সহসা বলিয়া উঠিল, "বোধ হয় শীগ্‌গিরই যেতে হবে নিরু।" নির্মল উদ্বিগ্ন হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কেন রে? ইন্দু কি ভাল নেই?" "তবে শরীরে কোন অসুখ দেখলুম না বটে তবে সে সুখে নেই।" "সেখ বিনু, তার এ জীবনের সুখ বিবাহের সঙ্গে সঙ্গেই শেষ হয়ে গিয়েছে।" "তাই কি?" আবার কি?" বলিয়াই নির্মলের বুকটা ধড়াস করিয়া উঠিল, সে আর কথা কহিতে পারিল না। তখন অন্ধকারে নির্মলকে বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া বিনয় বলিয়া উঠিল, "নিরু তার সকল দুঃখের একমাত্র কারণ আমি, আমি যদি তোদের বাড়ী না যেতুম, আমি যদি তাকে ভাল না বাসতুম, তাহলে কখনই তোর বাবা নলিনাক্ষের সঙ্গে তার বিবাহ দিতেন না। আর এ বয়সে তার এদশাও হত না। নিরু, আমি তাকে মেয়ে পড়ানোর চাকরি করে বিয়ে ছিলুম, সেখানে যে তাকে দাসী বৃত্তি করতে হবে তা আমি জানতুম না।" নির্মল একটু উত্তেজিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "দাসী বৃত্তি? সে আবার কি?" বিনয় তাহাকে ছাড়িয়া দিয়া বলিল, "তা ছাড়া আর কি ভাই? তোদের বাড়ীতে চাকর মা যে কাজ করে ইন্দু আজ মিস্ মজুমী ঘোষালের গভরনেস হয়েও ঠিক তাই করছে। ঘোষাল মহিষী আমায় নিয়ে গিয়েছিলেন যাচাই করতে, আমি কতটা কালো, বানিসের উপরে পালিশ আছে কি না এবং ঘোটের উপরে চলব কিনা, তাই দেখবার জন্য, কারণ ঘটকী বলেছে হরিহরপুরের হরসুন্দর বাবুর অনেক টাকা আছে।" নির্মল বিনয়ের কথা শুনিয়া নির্বাক হইয়া বসিয়া রহিল। এই সময়ে বাড়ীর বাহিরে একখানা গাড়ী আসিয়া থামিল, সঙ্গে সঙ্গে নৃত্যকালী ঠাকুরাণীর গলার আওয়াজ শোনা গেল, "কট কোথা গেলি ভাই, লড়াই জিতে এলুম। বকে বকে ভেটা পেয়েছে, এক ঘটী জল গড়িয়ে দে। বর কোথা গেলি রে?" হরসুন্দর জিজ্ঞাসা করিলেন, "বর কে, ঠান্-দি?" ঠানদিদি বলিলেন, "কেন তোর ছেলে।" হরসুন্দর প্রীত হইয়া বলিলেন, "ঠান্-দি আশীর্বাদ কর, বিনুর যেন শীঘ্র আর একটি বিয়ে হয়।"

একোনপঞ্চাশত্তম পরিচ্ছেদ

সকাল বেলায় খানসামা যখন ইন্দুকে বলিল, "হুজুর, মেমসাহেব সালাম দিয়া," তখন সে মঞ্জরীকে পড়াইতে বসিতেছিল। মিসেস ঘোষালের মর্নিং-রুমে গিয়া ইন্দু দেখিল যে কর্ত্রীর মুখখানা ঘন মেঘের মত অন্ধকার। ইন্দু কোনও অপরাধ করে নাই, সুতরাং সে তিরস্কার ও লাঞ্ছনার জন্য আদৌ প্রস্তুত হইয়া আসে নাই। সে যখন জিজ্ঞাসা করিল, "মা, আপনার শরীরটা কি খারাপ হয়েছে?" আর তার উত্তরে কর্ত্রী যখন বলিলেন, "মিসেস গাঙ্গুলি আপনি ভুলে যাচ্ছেন যে, আপনি মাইনে খান! আমি চাকর বাকরকে এতটা প্রশ্রয় দেওয়া পছন্দ করি না, তখন তাহার মুখ প্রথমে রাগে রক্তবর্ণ হইয়া উঠিয়া পরে দুধের মত শাদা হইয়া গেল। মিসেস ঘোষাল তখন জিজ্ঞাসা করিলেন, "হরিহরপুরের মিঃ হরসুন্দর ব্যানার্জ্জির ছেলে মিঃ বিনয় মুখার্জের সঙ্গে আপনার কত দিনের আলাপ?" ইন্দু অনেক কষ্টে মনের রাগ চাপিয়া বলিল, "তিনচার বছরের।" মিসেস ঘোষাল মুখখানা আরো কঠোর করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তার আপনার অপরাধটা কতদিনের?" ইন্দু চমকাইয়া উঠিয়া পড়িতে পড়িতে রহিয়া গেল, তাহা দেখিয়া মিসেস ঘোষাল আনন্দ গোপন করিতে না পারিয়া একটু হাসিয়া ফেলিলেন এবং আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "সেই জন্যই বুঝি তোমার স্বামী বিষ খাবার পরে নিজে যেচে এসে আমিন হয়ে তোমার চাকরি করে দিয়ে ছিলেন? ইন্দু কতকটা সামলাইয়া উঠিয়া বলিয়া উঠিল, "এসব কথা কি বলছেন, মা? আমি হিন্দুর মেয়ে, ভদ্র ঘরের মেয়ে।" মিসেস ঘোষাল স্থূল অধর বিকৃত বর্ণ চক্ষু দন্ত চাপিয়া বলিলেন, "ভদ্র ঘরে, বিশেষত হিন্দুর ঘরেই এই সমস্ত হয়ে থাকে শুনেছি। যেমন মিসেস গাঙ্গুলি যে সমাজে আমরা চলি, সে সমাজটা পুরাদস্তুর হিন্দু না হলেও এরকম দুর্নীতির প্রশ্রয় দেয় না। আমি আপনার মত চরিত্রের স্ত্রীলোকের উপরে আমার শিশু মেয়েটির ভার রাখতে

পারি না। দেখুন, মঞ্জরী আমার দুধের বালিকা, এসকল কথা তার কানে গেলে, হয় তো তার মৃত্যুও হতে পারে।" ইন্দু মাথা নত করিয়া সমস্ত শুনিয়া গেল। প্রথমে তাহার চোখে জল আসিয়াছিল, রাগে দুঃখে অভিমানে সে অন্ধ হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু মনের বলে চোখের জল চাপিয়া সে বলিয়া উঠিল, "আশীর্ব্বাদ করি মঞ্জরী চিরজীবিনী হোক মা, আমি এখনই বেরিয়ে যাচ্ছি।" তখন তাম্বূল রসে বিদ্রূপ বর্ণ ওষ্ঠাধর বিকশিত করিয়া ঘোষাল গৃহিনী বলিলেন, "আপনি নিজে থেকেই যখন চলে যেতে চাইছেন তখন আমাকে বাকী কথা গুলো আর বলতে হল না। আপনি একটা কুসংস্কারাপন্ন হিন্দু জমিদার ফ্যামিলীতে চাকরি খুঁজে নিন, এ অঞ্চলে আপনার অন্ন হবে না।" ইন্দুর শুষ্ক মুখে হঠাৎ হাসি দেখা দিল, সে হাত জোর করিয়া বলিয়া উঠিল, "আজ অনুগ্রহ করে যে ক্যারেক্টার আমায় দিলেন মা, আমার পরম শত্রুও আমাকে কখনো এরকম চরিত্রের লোক বলতে সাহস করে নি। যে ক্যারেক্টর দিলেন তাই যথেষ্ট আর নূতনে প্রয়োজন নেই। আমি যে কাপড়ে এসেছিলুম সেই কাপড়েই চল্লুম, আপনার দেওয়া কাপড় আমা সমস্তই আপনার বাড়ীতেই রইল। ইন্দু মিসেস ঘোষালকে প্রণাম করিবার চেষ্টা করিল কিন্তু পারিল না।

সে যখন মিসেস ঘোষালের মর্নিং-রুম পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছিল তখন কর্ত্রী হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, "ওহো, মিসেস গাঙ্গুলি, আপনাকে যখন নোটীশ দেওয়া হয়নি তখন এক মাসের মাইনে আপনার পাওনা। চলে গিয়ে হয় তো উকিলের চিঠি দেবেন, চাকর বাকরের সঙ্গে মামলাটা আমরা পছন্দ করিনে, টাকাটা নিয়ে যান। "ইন্দু একবার ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "মা, আপনার টাকা আমার সহ্য হবে না, আপনার কাছেই থাক।" বাড়ীর বাহির হইয়া আসিয়া ইন্দু দেখিল যে দুয়ারে একখানা থার্ডক্লাস গাড়ী দাঁড়াইয়া আছে এবং তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া একটি বৃদ্ধা রমনী ঘোষাল-সাহেবের দরোয়ানকে প্রশ্ন করিতেছেন।

তিনি ইন্দুকে দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন, "হ্যাঁ দিদি, তুমি কি বাংলা কথা একেবারেই ভুলে গেছ, না, যাবে যাবে বলে থাক?" ইন্দু দেখিল যে বৃদ্ধা অতি বংশজাতা কিন্তু একেবারে সেকালে গ্রাম্য মহিলা, তাঁহার পরণে একখানা সাদা গরদের কাপড়, আর একখানি নামাবলী, গলায় তুলসীর ও রুদ্রাক্ষের মালা। সে উত্তর দিল "বাংলা কথা কেন ভুলে যাব মা? রোজই বাংলা বলি।" বৃদ্ধা বলিলেন, "সাহেব বাড়ী থেকে বেরুলি কি না দিদি, তাই ভয়ে ভয়ে কব কি নির্ভয়ে কব, জিজ্ঞাসা করছিলুম। আমাকে মা বলিস নে ভাই, আমি দেশশুদ্ধ লোকের ঠান্‌দিদি। তুই কি এই বাড়ীতেই থাকিস ভাই?" ইন্দু বলিল, "থাকতুম বটে ঠান্-দি,' এখন চলে যাচ্ছি।" "একটা কথা বলে যা ভাই, এইটা কি ঘোষাল-সাহেবের বাড়ী? দরওয়ান মুখপোড়া কি বল্লে কিছুই বুঝতে পারলুম না।" "ঘোষাল সাহেবের বাড়ী এইটা বটে আপনার কি মোকদ্দমা আছে?" "না ভাই, মামলা-মোকদ্দমা কি আমরা বুঝি? তার বাড়ীতে একটি মেয়ে আছে, তাকেই দেখতে যাচ্ছি।" "দেখুন, ঠানদি, এঁরা বড় বেশী রকমের সাহেব। আপনি এখন এরকম ভাবে গেলে মিস মঞ্জরীর দেখা পাবেন না।" "সে আবার কে ভাই?" "তবে আপনি কার সঙ্গে দেখা করতে যাবেন? মিস মঞ্জরী ঘোষাল-সাহেবের মেয়ে। তিনি এখন ভেসেবিল—ভাল করে কাপড় চোপড় পরেন নি।" "আমি তার সঙ্গে দেখা করব না ভাই, ইন্দু বলে একটি মেয়ে ঘোষাল-সাহেবের মেয়েকে পড়ায়, আমি তার সঙ্গেই দেখা করতে এসেছি।" নিজের নাম শুনিয়া ইন্দু স্তম্ভিত হইয়া গেল, নৃত্যকালী ঠাকুরাণীর নাম সে কোন দিন শুনে নাই, তাঁহার প্রকৃত পরিচয়ও সে জানিত না। সেদিনকার সকাল বেলাকার ঘটনায় তাহার মাথাটা খারাপ হইয়া গিয়াছিল। সে গায়ের জ্বালায় ছুটিয়া বাহির হইয়াছিল মাত্র কিন্তু কোথায় যাইবে কেমন করিয়া যাইবে তাহা সে স্থির করে নাই। হঠাৎ ঠাকুরুন দিদির মুখে নিজের নাম শুনিয়া ইন্দু বিষম সমস্যায় পড়িয়া গেল, ঠাকুরুন-দিদি যখন তাহার সঙ্গেই সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন তখন সে তাঁহাকে কোথায় লইয়া যাইবে, কেমন করিয়া কথা কহিবে তাহা ইন্দু ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিল না, হঠাৎ তাহার মুখ দিয়া বাহির হইয়া গেল,

"দেখুন, আমারই নাম ইন্দু, আমি এখনই চাকরি ছেড়ে দিয়ে যাচ্ছিলুম। আমি তো আপনাকে চিনিনে, আমার সঙ্গে আপনার কি প্রয়োজন আছে?" নৃত্যকালী ইন্দুর কথা শুনিয়া একটু হাসিয়া বলিলেন, "আমারও তাই মনে হয়েছিল, মুখ দেখেই বুঝেছিলুম তুইই ইন্দু। আমার সঙ্গে উঠে আয় দিদি। বাঙালী সাহেবের বাড়ী ঢুকতে হবে বলে গয়নার কাপড় পরে এসেছি কিন্তু তাহলেও নাইতে হত। বেঁচে গেলুম, তোর সঙ্গে পথেই দেখা হয়ে গেল। এখন কোথায় যাবি দিদি?"

ইন্দু এ প্রশ্নে সদুত্তর খুঁজিয়া পাইল না, তাহার মুখের ভাব দেখিয়া নৃত্য-কালী তাহার মনের অবস্থা কতটা বুঝিতে পারিলেন। তিনি বলিয়া উঠিলেন, "দিদি, আমার পরিচয় পরে পাবি এখন, তোর বাপ গৌরমোহন ও আমায় চেনে আর তোর ভাই নির্ম্মলও আমায় জানে। কালীঘাটে আমার একটু বাসা আছে, চল্ তোকে নিয়ে সেখানে যাই।" ইন্দু কোন উত্তর দিতে পারিল না। ঠান্-দিদির আদেশ মত তাড়াতাড়ি গাড়ী বালীগঞ্জ হইতে কালীঘাটের দিকে চলিল। বাসায় পৌঁছিয়া নৃত্যকালী নূতন করিয়া সংসার পাতিয়া বসিলেন কারণ মোহিনীর বিবাহের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সংসারের প্রয়োজন শেষ হইয়া গিয়াছিল। তাহার সঙ্গে হরিহরপুর হইতে এক-জন লোক আসিয়াছিল, সে যখন জিজ্ঞাসা করিল, দিদি ঠাকরুণ, কেতরে যাবে কবে?" তখন তাহাকে মুদীর দোকানের কর্দ্দ দিয়া নৃত্যকালী বলিলেন, "আজো সময় হয় নি ভাই, জগন্নাথ ডাকলেই যাব।"

(ক্রমশঃ)

মিলন ক্ষণে

শ্রীচণ্ডীচরণ মিত্র।

নয়ন কোণে অশ্রু তোমার,
　　অধর-কাঁকে হাসি!
শরৎ-মেঘের বৃষ্টিতে কি
　　রৌদ্র পড়ে আসি'?
আজ চিনেছি আপন-জনে
চির-মধুর মিলনক্ষণে;—
　ফুল কি মোতি, কোনটা যে নিই,
　　দুই ত পাশাপাশি!
বহুদিনের পরে আমার
　　দেখে' মনের সুখ,
শিশির-স্নাত সদ্য-ফোটা
　　তোমার কমল-মুখ।
নয়ন-ধারায় হাসির সোঁতা,
রামধনু কি আঁকতে গোধা?—
　ফিরেছে যে এর তরে মোর
　　দুখের উপবাসী।

একটী।

(শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী)

একটী নিশ্বাস টুটে
　　গন্ধভরা কোটা ফুল,
একটী পলকে যায়
　　ভাঙ্গিয়া হৃদয়-মূল।
একটী চাহনি প্রাণে
　　হানে যে বিষম বাণ,
একটী বেসুরা কণ্ঠে
　　ঘুরছিয়া পড়ে তান।
একটী চুম্বনে যায়
　　শুকায়ে কমল মধু
একটী পরশে চলে
　　সরমে লতিকা বধূ।
একটী রসনা হতে
　　গলে মহা হলাহল,
একটী হাসিতে হায়
　　বাসি হয় শতদল।

কর্পোরেশন—অভিযান

(কর্পোরেশন সদস্য পদাভিলাষিণী রমণীর ভোট সংগ্রহের কৌশল—প্রসাধনের সাহায্যে ভোট সংগ্রহ)

১ম—ঠোঁট দুটী রাঙা কর্ত্তে হবে।

২য়—ভুরু দুটো পেন্ট করে
মোড়া ভুরু কর্ত্তে হবে।

৩য়—চোখ দুটী টচ্ করে
"হরিণ নয়ন" কর্ত্তে হবে।

৪র্থ—গাল দুটোয় রুজ
লাগাতে হবে।

৫ম—সাড়ীখানা ঘুরিয়ে
পরে রুক্ষ ঝাঁটতে হবে।

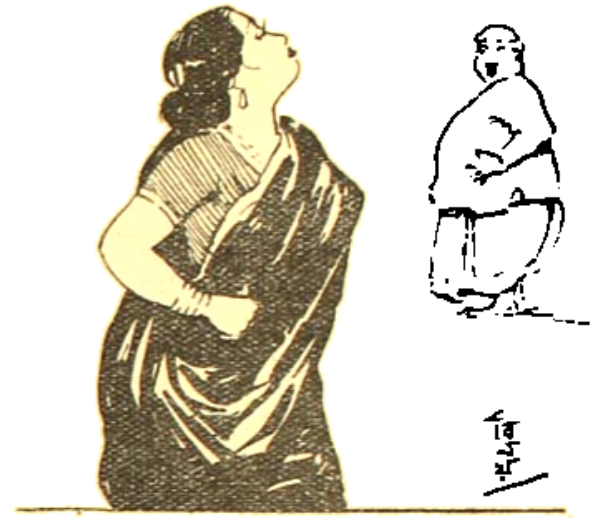

৬ষ্ঠ—এইবার কোন পুরুষ
আমার প্রতিদ্বন্দ্বী হবে—

জানা দরকার

[শ্রীমতী শোভা রুদ্র]

দুধ জ্বাল দেওয়া হয়ে গেলে সেটাকে বেশ হাওয়া চলাচলের জায়গায় রাখতে হবে। তার কাছে পেয়াজ বা অন্য রকম হেজাল্লো জিনিষ যেন না রাখা হয়, তাতে দুধ নষ্ট হবার সম্ভাবনা ঢের বেশী।

• • •

গরম জলে একটু বোরাক্স আর একটু নিশাদল ফেলে দিলে সেই জল কার্পেট পরিষ্কারে অনেক সাহায্য করে, জলটা একটু বেশী গরম হলেই ভাল হয়।

• • •

মাখনে এক টিন্ চিনি মিশিয়ে রাখলে, গরমকালে মাখন শীঘ্র নষ্ট হোতে পারে না। তবে বেশী চিনি যেন না পড়ে।

যে কড়া অনেক দিন ব্যবহার হয়নি তা থেকে গন্ধ ওঠাতে হলে প্রথমে তাতে খানিকটা জল গরম কোরতে হবে, পরে ফুটন্ত জলে দু' এক খণ্ড জলন্ত কয়লা ফেলে দিলে তা থেকে সমস্ত গন্ধ উঠে যায়।

• • •

একটা ব্যাগে করে খানিকটা গরম নুনজলের সেঁক ঘুমি মুখের চারপাশে দেওয়া যায় তাহলে দাঁতের ব্যথায় আর কষ্ট পেতে হয় না।

• • •

"মাথা ধরলে পায়ের তলায় খুব করে তেল ঘষতে হয়"—কথাটা সত্যি বটে কিন্তু—নিজের পায়ে তেল দিও, পরের পায়ে নয়!

ইণ্ডিয়ান সোপ কোম্পানীর
মেসিনে প্রস্তুত
চন্দন, রয়েলবকুল, মাল্ক ও ভেলভেট সাবান
ব্যবহার করুণ। টেলিফোন, ২৪৯৬

নারী মঙ্গল

পঁচিশ ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে পুণার ওদিকে কোন বয়স্কা মেয়েকে স্কুলে যাইতে দেখা যাইত না। এখন তথাকার বালিকা বিদ্যালয়ে ৪০০ উপর বালিকা পড়ে। প্রতি বৎসর গড়ে ২০টি করিয়া ম্যাট্রিক পাশ করে। সেবা সদনে প্রায় ১০০০ মেয়ে আছেন, বিধবা ও বিবাহিতারাও উহার নানা বিভাগে শিক্ষা পাইতেছেন। সাসুন হাসপাতাল হইতে প্রতি বৎসরে প্রায় ত্রিশটি তরুণী নার্স, সব এ্যাসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন হইয়া বাহির হইতেছেন। অধ্যাপক কার্ভের বিদ্যালয়েও প্রায় ৩০০ বালিকা আছে। কলেজেও প্রায় ৫০ জন মহিলা পাঠ করিতেছেন। উচ্চ বর্ণের মধ্যে বালিকাদের বিবাহের বয়স বাড়িয়া অন্যূন ষোল বছর দাঁড়াইয়াছে। বিধবা বিবাহও তথায় চলিতেছে

• • • •

খাদ্যের অভাবে ও শরীরের ধারণ ক্ষমতার অভাবে এবং শিশুদের পালন অনভিজ্ঞতার জন্য আমাদের দেশে শিশু মৃত্যু বড় বেশী। ইহাতে সুস্থ সবল জাতি গঠিত হইতে পারে না। অনেক সমস্যা লইয়া পাশ্চাত্যে বড় বড় চিন্তাশীল মাথা ঘামাইতেছেন অথচ এ দেশে যে ইহার আবশ্যক আছে ইহাই অনেকে মনে করেন না। বিবাহ ও সম্পত্তির ভোগাধিকার সম্বন্ধীয় আইন পরিবর্ত্তিত হওয়া উচিত। পর্দ্দা প্রথা যত কমে ততই ভাল, নারীদের কর্ম্মক্ষমতা সম্বন্ধে তাহাদের সজাগ হওয়া কর্ত্তব্য।

• • • •

জাতীয়তা ও বিবাহিতা নারী :—এক জাতির নারী যদি অপর জাতির কোন পুরুষকে বিবাহ করে তবে বিবাহের পর নারীর জাতীয়তা বদল হইবে স্বামীর জাতি অনুসারে না তাহা অক্ষুণ্ণ থাকিবে ইহা লইয়া বিলাতে সম্প্রতি আলোচনা চলিয়াছে। ফ্রান্স, বেলজিয়াম প্রভৃতি দেশে নিয়ম হইয়াছে—যে কোন বৃটিশ মহিলা যদি ভিন্ন দেশী কোন পুরুষকে বিবাহ করেন তবে তাঁহার বৃটিশ জাতীয়তা যাইবে না অবশ্য যদি স্বামীর দেশে তেমন কোন নিয়ম থাকে তবে নারীকে তাহাই পালন করিতে হইবে।

• • • •

অষ্ট্রীয়ার ইলেকশানে নারী :—সম্প্রতি কার নির্ব্বাচনে আটজন মহিলা পার্লামেণ্ট সভ্য নিযুক্ত হইয়াছেন, ৯ জন ভিয়েনার কৌন্সিলে নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

• • •

কিউবায় নারী :—এখানে প্রথম মহিলা কংগ্রেসের অধিবেশন হইয়া গিয়াছে—সমাজ নীতি রাজনীতি ও নারী বিষয়িনী নানা কথার আলোচনা কংগ্রেসে হইয়াছে।

বংশী শ্রবণে

শ্রীচণ্ডীচরণ মিত্র।

কা'র বাঁশী বাজে সই
তুলি' হেন মম ?
মোর নামে সাধা' যেন
বাঁশরীর দম্ভ !
মধুর, মধুর স্বর
ছাইল যে অম্বর,—
তেমনি এ নিশি খানি,
হাসে নভে চন্দ্র !

চুপ চুপ শোন্ দেখি,
কথা তোরা ক'স্ না ;
লুটোপুটি খায় আজ
ছুইছুটে জ্যোৎস্না।
আলোয় বাঁশীর গানে
আমার পরাণ টানে,—
আয় সই যেথে' আসি
যে বাজায় মম !

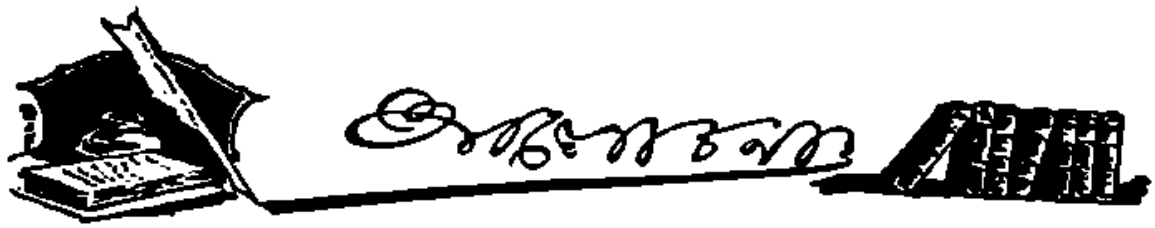

মুসলমান বা ক্রিষ্টান বলিতে এক সঙ্গে একটা ধর্ম্ম বা সম্প্রদায়ের একটা পরিপূর্ণ অখণ্ড ধারণা আমরা করিতে পারি। মোসলেম জগৎ বা ক্রিষ্টান জগৎ বলিতে ধর্ম্ম-গত একটা জাগতিক প্রাধান্যের কথা স্মরণে তৎতৎ সম্প্রদায়ের চিত্ত গৌরবে পূর্ণ হইয়া উঠে। হিন্দু বলিতে আমরা সেরূপ ধর্ম্মগত বা সম্প্রদায়গত একটা পরিপূর্ণ অখণ্ড ধারণা করিয়া লইতে পারি না—কেমন শতধা বিচ্ছিন্ন একটা মানব-সমাজ ও সম্প্রদায়ের কথা মনে হয়। হিন্দু জগতের কল্পনা আমরা করিতে পারি না—হিন্দুর সম্প্রদায় গত বা ধর্ম্ম গত জাগতিক প্রাধান্যের কথা স্মরণে প্রতি হিন্দুর শিরায় শিরায় উষ্ণ রক্তস্রোত প্রবাহিত হইতে পারে না, নব ভাবের প্রেরণা আনিতে পারে না। কোন ধর্ম্ম বা সম্প্রদায়ের লোকের পক্ষে ইহা গৌরবের কথা নহে।

—•—

সমাজ-বদ্ধ মানব-চির দিনই কোন না কোন ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া সমাজে ও সংসারে বাস করিতে বাধ্য হয়। যাহার আশ্রয় গ্রহণ ভিন্ন সংসারে ও সমাজে চলিবার উপায় নাই তাহাকে যাহারা উপেক্ষা করিয়া চলে তাহাদের পরিণাম মঙ্গলকর হয় না। অত্যন্ত উদার নীতিক অর্থাৎ ভাসা ভাসা ভাবে যে ধর্ম্মের লোক সেই ধর্ম্মকে শুধু অনুগ্রহই করিতেছেন মনে করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করেন ধর্ম্মগত ভাবে সে লোকদ্বারা ধর্ম্ম বা দেশের উন্নতি আশা করা যায় না। আর ধর্ম্মগত এই উপেক্ষা ও ভাসা-ভাসা ভাব যদি কোন ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যাপক হইয়া পড়ে তবে সে ধর্ম্ম ও সে সম্প্রদায় ক্রমশই রসাতলে যাইতে থাকে।

—•—

জগতে অনেক জিনিসই উপেক্ষা করা ও সেই উপেক্ষারও কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ নির্ণয় করিয়া একটা সদর্থ বাহির করা সোজা। কিন্তু কোন জিনিস গঠন করা বা যাহা যে অবস্থায় আছে বা পাইয়াছি তাহাকে তদপেক্ষা উন্নত পর্য্যায়ে লইয়া যাওয়াই কঠিন ব্যাপার। তেমন কার্য্য হইতে আত্ম-অবিশ্বাসী লোক ক্রমশই সরিয়া পড়িতে থাকে। এই ভাবেই ধর্ম্মগত, সম্প্রদায়গত, জাতিগত, ও দেশগত একটা ব্যভিচার উচ্ছৃঙ্খলতা আসে। সেই উচ্ছৃঙ্খলতা ব্যাভিচারের স্তিমিত অবসাদের মধ্য দিয়া জাতি বা সম্প্রদায় তাহার অতীত গৌরবের স্বর্ণস্তূপ স্বপ্নে ক্বচিৎ কখনও দেখিলেও ভবিষ্যৎ শঙ্কিত বিরাট ভস্মস্তূপের ধূম্র কুহেলিতে সে স্বর্ণ সূত্রের যাদু স্পর্শচ্যুত হইয়া পড়িয়া আঁধারে হতাশায় বিভ্রান্ত ভাবে ঘুরিয়া বেড়ায়।

—•—

এমনি অবস্থায় পড়িয়া বিরাট বিচ্ছিন্ন হিন্দু সম্প্রদায়-ভুক্ত হিন্দু জাতি আজ আঁধারে ঘুরিয়া মরিতেছে। তাহার হৃদয়ে আশা নাই, উৎসাহ নাই, ধর্ম্মগত, সম্প্রদায়-গত, জাতিগত, দেশগত একাত্মবোধ নাই, আছে শত ভাবে আরও বিচ্ছিন্নতা বাড়াইবার অগ্নিকুণ্ড—এ উহাকে সেই অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে ফেলাইয়া দিয়া পরম উৎসাহ ভরে তাহারই ভস্ম-লীলা দেখিতেছে। ভারতের দেশ দেশ, গ্রাম গ্রাম, নগর পল্লীর শতধা বিচ্ছিন্ন অথচ নামে হিন্দু যাহারা তাহাদের জাগাইয়া যদি এক ধর্ম্ম সূত্রের অবিচ্ছিন্ন-তার বদ্ধ না করা যায়, তবে বিশ্বাসে হোক অবিশ্বাসে হোক নামে যাহারা এ সম্প্রদায় ভুক্ত হইয়া আছে তাহাদের মঙ্গল নাই।

—•—

আমি মুসলমান বা আমি ক্রিষ্টান বলিলে যেমন সমগ্র মুসলমান বা ক্রিষ্টান সমাজের মধ্যে একটা প্রাণের স্পন্দন পাওয়া যায়—আমি হিন্দু বলিলে তেমন প্রাণের সাড়া হিন্দু ধর্ম্ম গ্রাহী লোকদের মধ্যে মেলা সুদূর পর হইবে না। এই সঙ্ঘবদ্ধতা এই ধর্ম্মগত একত্ববোধ থাকার জন্য এক

জন মুসলমান বা ক্রিষ্টানের উপর কোন আঘাত বা জুলুম করিতে লোকে ঘতবার ভাবে, বিচার করে অরক্ষিত সজ্ঞবদ্ধ একত্ব বোধ বিরহিত কোন হিন্দুর উপরে আক্রমণ করিতে লোকে তাহা ভাবেনা বিচার করে না।

—•—

পৌষ শেষ হইয়া গেল—অকাল তিরোহিত হইল, এইবার বাংলা দেশের বিবাহের আসর আবার সরগরম হইবে। বক্তামাংসগ্রস্ত পিতা-মাতার হা-হুতাশ, নয়ন জল ও ঋণ ভারের মধ্য দিয়া বরের পিতামাতার গৃহ আবশ্যক অনাবশ্যক সজ্জায় সজ্জিত হইবে, জীবন পথে অজ্ঞ বর প্রাণ ভরা হাসি মাদকতার উচ্ছ্বাসের মধ্যে অশ্রু-মুখী বধূকে বক্ষে ধরিবার প্রয়াস পাইবে—তারপর—তারপর, জীবনে বিবাহের এই হাসি অশ্রুর শেষ কোথায়?

—•—

দেশে সমাজগত এত পাপ দেশবাসীর বক্ষের উপরে পাষাণ ভার চাপাইয়া রাখিয়া দেশের লোকের রক্ত ও জীবনী শক্তি তিলে তিলে চুষিয়া খাইতেছে—অথচ সমাজ বা দেশবাসী কোন দিক দিয়া তাহার এতটুকুও প্রতিকার করিতে পারিতেছে না। কেন পারিতেছে না—দেশে কে কাহার বিধান শুনিবে? বিধান দিবার লোক দেশে কই? রাজ গ্রাহ্য বিধান ভিন্ন তাহা সমাজ গ্রাহ্য হওয়া সম্ভবপর কি?

—•—

মুখে মুখে সকল জাতি ও সকল দেশের লোকেই শান্তি শান্তি করে। কিন্তু কার্য্য কালে দেখা যায় সকল শক্তি-শালী দেশের লোকই অশান্তির উপাদান যুদ্ধ বিগ্রহের সাজসজ্জা জোগাইতেই ব্যস্ত থাকে। জাতির শ্রেষ্ঠ মস্তিষ্ক সমূহ মানুষ মারিবার মারাত্মক ভীষণ অস্ত্র ও বাষ্প প্রণয়ণে নিযুক্ত থাকে। যেন মানুষ যে যত সুকৌশলে অধিক সংখ্যক একবারে বিনাশ করিতে পারিবে কৃতিত্ব তাহারই অধিক।

—•—

আত্মরক্ষা যদি মানুষের ধর্ম হয় তবে অপরের বিনাশে ও বোধ হয় কোন পাপ নাই। জগত সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে আত্ম রক্ষা ও নিজ প্রাধান্য বাড়াইবার জন্য অপরের বিনাশ সাধন চলিয়া আসিতেছে। বীরের কাম মানুষের ধর্ম যুদ্ধ লীলাতেই ইহার প্রলয় ভীষণতা রুদ্র রূপে ফুটিয়া উঠে। রুদ্র শান্ত—শান্ত রৌদ্র একটি না হইলে অপরটি বোধ হয় ফুটিতে পারে না। সৃষ্টির ইহাই বোধ হয় রহস্য—ইহাই বোধ হয় বিচিত্র মাধুর্য্য।

—•—

এবারকার ভারতীয় প্রতি প্রাদেশিক কৌন্সিল হইতে ও মূল ভারতীয় এসেম্বলি হইতেও মহাত্মা গান্ধী ও অন্যান্য রাজ-বন্দীদের মুক্তি দেওয়ার প্রস্তাব হইবে। এই প্রস্তাবের স্বপক্ষে ও বিপক্ষে কতটি হাত উঠে তাহা দেখিবার বিষয় এবং জন মত প্রবল হইলে দেশের বিধান নিয়ন্তা জনমতের মর্য্যাদা কতটা রাখেন তাহাও দেখিবার বিষয়!

—•—

সবই তোমাদের শুধু চাবি কাঠিটি আমার হাতে বা দৈত শাসন প্রথা ইহার মারফতেই ভারতীয় আইনের তন্ত্র সর্ব্বশক্তি মান, এবং সংস্কার বা জনমতে শাসন একটা হাস্যকর প্রহসন মাত্রে রূপান্তরিত। এ শাসন প্রথায় ভারতীয় সর্ব্ব সম্প্রদায়ের রাজনীতিক মতাবলম্বীরাই বিরূপ। তবু সংস্কারের নামে এই হাস্যকর দৈত-শাসন প্রথা এদেশে কত কাল চলিবে? এবার বোধ হয় এই হাস্যকর প্রথারও উচ্ছেদ সাধন হইতে পারে।

—•—

বাংলা দেশের স্বাস্থ্য শিক্ষা, ও কৃষি বিভাগের তিনটি মন্ত্রীর কথায়ই এ পর্য্যন্ত তাঁহাদের কার্য্য প্রণালীর যতটুকু আঁচ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে বোঝা যায় তাঁহারা তিন জনেই স্বাধীন মতানুসারে জন মতের মর্য্যাদা রাখিয়া নিজ পদ সম্ভ্রম রক্ষার চেষ্টা করিবেন। বাহিরের লোকের ধারণা আছে যে মন্ত্রীদের হাতে অনেক ক্ষমতা আছে—এবং এই ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও আমলাতন্ত্রের বিরাগ ভাজন হইবার ভয়ে ও পদ-মর্য্যাদার লোভে তাঁহারা জনহিতকর কার্য্যে তেমন মন দেন না। ইহা সত্য কথা কিনা সাধারণে জানে না—জন সাধারণের এ বিশ্বাস ভুল হইলে তাহা অপনোদন করা মন্ত্রীদের কর্ত্তব্য। আর যদি

কার্য্য করিতে করিতে তাঁহারা বোঝেন যে এই শাসন পদ্ধতির দ্বারা কিম্বা কোন কার্য্য করা সম্ভবপর নহে—মূল পদ্ধতিই দেশ কার্য্যের উপযোগী নহে তবে একথাও স্পষ্ট ভাবে তাঁহাদের জনসাধারণকে জানাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য হইবে। তাহা হইলে দেশেরই কোন বিশিষ্ট লোকের সম্বন্ধে দেশবাসীর মনে কোন ভুল ধারণা হইতে পারিবে না।

—•—

কোকনদের ছাত্র সম্মেলনে শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাস বলিয়াছেন যদি তোমাদের অ-সহযোগী হইবার সাহস না থাকে তবে যাহারা অ-সহযোগ করিয়াছে তাহাদের সাহায্য কর; ১৯২১ সনে ছাত্রদের অনেকে আন্দোলনে মাতিয়া আদর্শ ও ত্যাগের খাতিরে কেহ বা ভাল শিক্ষা পাইবার জন্য বিদ্যালয় ত্যাগ করিয়াছিল। দুই ভাবের ভাবুক ছাত্র দলই নিরাশ হইয়াছে—শিক্ষাও তেমন হয় নাই। কংগ্রেসের নেতাদের মতান্তরে ত্যাগের কার্য্যও কিছু হয় নাই। ছাত্র সমাজকে আবার এই ভাবে উদ্বুদ্ধ করাইলে ইহার ঘারিত্ব ও বিপদ কত তাহা বুদ্ধিমান মাত্রই বুঝিতে পারিবেন। যেরূপ শিক্ষা বর্ত্তমানে হইতেছে তাহা অপেক্ষা ভাল শিক্ষার ব্যবস্থা না হওয়া পর্য্যন্ত তাহাদের জাতীয় বিদ্যালয়ে আনা সঙ্গত নহে। কর্ম্মী ও আহ্বানকারীর নিজের কার্য্য প্রণালীর উপরে যতক্ষণ স্থির বিশ্বাস না থাকে এবং ছাত্রদের ত্যাগকে তাঁহারা দেশের কার্য্যে নিয়োজিত করিয়া দেশের মঙ্গল আনিতে পারিবেন, যতক্ষণ এমন কর্ম্মধারা নির্দ্ধারিত না হয় ততক্ষণ তাহাদের আহ্বান করা উচিত নহে। শিক্ষার পরেই ছাত্রদের জাতীয় কার্য্যে যোগ দেওয়া কর্ত্তব্য। জীবনারম্ভের পূর্ব্বে দু'এক বৎসর জাতীয় কর্ম্মে নিয়োজিত করিলে শিক্ষার সুবিধা সব দিক হইতেই হয়। গ্রাম্য কার্য্যই ছাত্রদের উপযোগী। ইহাতে ছাত্রদের দেশের ও তাহার অধিবাসীর সঙ্গে প্রকৃত যোগ বন্ধন আসিবে। তাহারা দেশের কথা ভাবিবার সুযোগ পাইবে। স্বরাজ না পাওয়া পর্য্যন্ত ছাত্রদের পক্ষে এই ব্যবস্থা যদি বাধ্যতা মূলক করা যায় তবে ভাল হয়।

নদীর ভাঙ্গন পারে।

(শ্রীসতীন্দ্র মোহন চট্টোপাধ্যায়)

নদীর ভাঙ্গন পারে,—
কলসী পাকা, আমলা বোঁটায় ঝুলছে বারংবার!
মুহুর্মুহু ঝাঁকড়ে ধরে,—
গণছি প্রহর কেমন করে;
কখন যাবে, কখন যাবে—ভাবনা চমৎকার!
নদীর ভাঙ্গন পারে;—
অঙ্ক বুঝি পড়লো বরে মুখখানি দা' তার!
নদী গহে স্বামী শয্যা' পরে—
আই বা বধূ আসল ঘরে।
চুরির আওয়াজ, খস-খসানি, শুনছে পরিষ্কার!

সুধা ও ক্ষুধা।

সুধা আর সুধা একই অনে কেন
হাওনাক ভগবান্?
যারে দাও সুধা ক্ষুধার বিহনে
করে না সে তাহা পান।
একটি মুষ্টি তণ্ডুল যার
মধুময় সুধা চালা,
তারে শুধু দেছ দুখানল সম
ধিকি-ধিকি ক্ষুধা জ্বালা।
দুর্দ্ধ দুনয়ে গভীর সাগরে
সুধাময় তবু।
জীবলোকে আর দুলোকে তোমার
একই বিধান প্রভু।

মাসিক সাহিত্য-সমালোচনা।

প্রবাসী, অগ্রহায়ণ, ১৩৩০ এবার ৭টি রঙিন ছবি ছাপা হয়েছে। তার মধ্যে বেছেই ছাপা হয়েছে। প্রথম ছবিখানি বিখ্যাত চিত্রকর শ্রীযুক্ত ইন্দু কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের "প্রবল বৈরাগ্য"। ইণ্ডিয়ান আর্টের অনভিজ্ঞের মধ্যে ছবিখানি ভাল। ছাত্রাবস্থার প্রথমদিকে চলে পড়ানো একটু অস্বাভাবিক হলেও অন্য ছবির তুলনায় ঢের ভাল। প্রবাসী এই সংখ্যায় গল্প ও উপন্যাস ছাড়া প্রবন্ধ কটি বাদ করে বেছে দিয়েছেন। এবং তাঁর দিনে প্রবাসীতেও এত অল্পে ছিন্ন ছিন্ন লেখার লেখা প্রবন্ধটি সুখপাঠ্য সন্দর্ভ এক সঙ্গে ছাপা হতে দেখা যায় না। প্রথম প্রবন্ধে বিজ্ঞানাচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়ের "প্রাচীন ভারতে রসায়ন শাস্ত্র চর্চ্চা"। এখন বাঙ্গালি বিদেশ যায় যাবার সময় করে তুলতে পারেন। প্রবন্ধটি সংক্ষিপ্ত এতে কোন রসের কথা নাই থাক আধুনিক Chemistry ও প্রাচীন রসায়নের সম্পর্কটা সুন্দর ভাবে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে। এ সংখ্যার বাকী প্রবন্ধ কবিতা শ্রীযুক্ত নাথ মোহন সাল সমাপ্ত। মৌরাদ আর জলাই ডাকাইএর কাহিনী। হুন মেয়েদের আসলে কথা বৃষ্টির পরদিন সন্ধ্যাকাশ অমন ভাব একটুখানি কবির সম্বন্ধে করা অন্যায় যাই। তৃতীয় প্রবন্ধ চুরিচিত্র ভাল, শ্রীবর্ণনী কাজ ভাল লিখিত। ঠিক এখন কয়েই pure সাহিত্যের আলোচনা করতে হয়। লেখক চুরিচিত্র উপেক্ষা বিষয়ে আর পরিষার সুন্দর ভাবে প্রকাশ করেছেন, তার সমালোচনা করতে গেলে তার চাইতে বড় আর একটা প্রবন্ধ লিখতে হয়। প্রবন্ধের পরেই পান পুরুষের জন্য হয়ে একটা কবিতা তা ছাপবার কোনো প্রয়োজন ছিল না। শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্র সুধারী মেয়ে ব্রত বুলি আবার "মোটিবার" নাম দিয়ে আর একটা বোঝা আউটা কবিতা ত্রিপদী ছন্দে লিখেছেন। কবি ভুলে যাচ্ছেন যে ভাবের বিকাশের সঙ্গে অনুপ্রাসের লক্ষ্য মানুষী এ আউটা গানের তান। এখন ব্রত বুলি লিখতে গেলে রবীন্দ্র নাথের ভানু সিংহের পদাবলীর অনুকরণ করা উচিত। তা নইলে সমস্ত উদ্যম ব্যর্থ হয়ে যাবে। শ্রীসৌরীন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের "ভূতের কাহিনী" গল্পটি মোটা রকমে অস্বাভাবিক। ঘোড়ার ডাকি পাকে পড়লে আর যায় তাকিয়ে পড়ির জন্য গাঁজা আসবে কিনে কেমন করে আমাদের পড়লে তা বোঝা যায় না, রাত্রি বেলা আর হলেও ছেলেরা সে কিনে তাকে খেলে কেন? পরেশের বিদ্যির মেয়েটা তার তাকিয়াদির মত কিন্তু শরচ্চন্দ্রের মেয়ে-বিদ্যির মত আর একটা Side light বা আলোর contrast এর অভাবে করুণ রস একেবারেই ফোটেনি। শ্রীযুক্ত নাথ মুখোপাধ্যায়ের "বন্দী জীবন" অসম্পূর্ণ প্রকাশ। "আশা" একটা চার লাইনের পাদপূরণের কবিতা। শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরীর "সুরের নেশা" কবিতাটিতে কবি যদি বিজ্ঞান পরিচয় দিতেন তবে তার অর্থাৎ রসাত্মক বাক্যের একান্ত অভাব ঘটত :—

> আকাশ! আকাশ! ছুটে চল সব ছন্দের পক্ষিক।
> ভূলোক আঁধার। করো তবু তায়। বাঁচাও জীবন।
> পরাণপাখির ডানা আজ ঘোর সাধন অধিক,
> সকলের তবু হবে জয়, সকল সাধন।

শ্রীসত্যেন্দ্র নাথ দত্তের "সাম্রাজ্য বাদ ও ভারতে বহির্বাণিজ্য" আর একটি সুচিন্তিত প্রবন্ধ তার সমালোচনা ছাড়ার পাঠকের অন্য করা আবশ্যক। অধ্যাপক শ্রীমোহিনী মোহন মুখোপাধ্যায়ের "দুই-কূল" গল্পটি মন্দ নয়, কাঠামোটা ভাল কিন্তু gumishing অস্বাভাবিক :—

(১) যুবক বাবের ঘরে ঘুমন্ত মেয়ের মধুর কথা ও বাবলিনে যায় যাওয়া।

(২) একটা ছোট্ট পুরু কাশ্মিরী কার্পেটে মোড়া, তার উপর নিচু একটি টেবিল পাতা।"

(৩) ঘুমন্ত পাখার ঘুরু—Dramatic ছন্দের লোকে এমন বোধ করে না।

শ্রীযোগিরীন্দ্র ঠাকুরের "বিজ্ঞান ও ধর্ম" উচ্চ অঙ্গের দার্শনিক তত্ত্ব, তার অনেকেই তা বুঝতে পারবেন কারণ এ পড়তে ভোলের কাগজ পেন্সিল নিয়ে হিসাব করে পড়তে হয়। এ শ্রেণীর লেখা অবশ্য বিশ্ব বাঙ্গালার মাসিক পত্রে দেখিনি। এ জাতের কথা বুঝে দেখবার লোক অনেক তবে থাকে তা হচ্ছে তা আর মুক্তন করে হচ্ছে না। অন্য পক্ষ শ্রীবিনয় কুমার সরকারের "ভারতীয় পর্যটক" সুখ পাঠ্য প্রবন্ধ। ভারতীয়ের অনেক একাঙ্ক উপন্যাস, প্রবন্ধ, জীবনী, বড় বেড়ে থাকে কিন্তু কখনো শেষ হয় না। শ্রীমতী অনুরূপা দেবীর "সতী" শরচ্চন্দ্রের "দেবের দাবী" তুলসীর নাথ দত্তের "বর্ত্তমান বাঙ্গলার অর্থনৈতিক রাষ্ট্রনৈতিক ইতিহাসের এক অধ্যায়" এই জাতীয়। শ্রীপ্রমথনাথের সেন গুপ্তের "বৃদ্ধ বয়সে পথে" কবিতাটি Blotting paperএর মত নীরস, না লিখলেই হত ভাল। অধ্যাপক বিনয়ের "বাঙ্গালার সামাজিক প্রথা" প্রথমে প্রকাশ হলেও বড় সুখপাঠ্য এক একটি Instalment সম্পূর্ণ যে ভঙ্গিতে পড়ে প্রবন্ধ লিখেছেন চলে। অধ্যাপক প্রসন্নকুমার রায়ের "একখানি পুরাতন পুস্তক" একটি সরস সন্দর্ভ, এতে সংস্কৃত সাহিত্যের সমস্যা পুরাণের কতকগুলি সুন্দর বর্ণনা আছে। শ্রীমতী মোহিনী সেন গুপ্তা অযথা অযথা লিখে বঙ্গবাণীর চারটি পাতা নষ্ট করেছেন। বাঙ্গালাদেশের মাসিক পত্র গুলোতে এ মাসিক কবে শেষ হবে?

প্রীপরিমল কুমার ঘোষের "যুবরাজ" কবিতাটি অনেকটা কবিতার মত। প্রীযুক্ত তুলসীদাস লাহার "প্রেমের" নাম দিয়ে নীরস প্রবন্ধের যে নীরস ব্যাখ্যা বাঙ্গালী পাঠক পাঠিকার মাথার লিখেন করেছেন তার আঘাত থেকে সকলের রক্ষা। তুলসী বাবু একখানি বই লিখেই বসা-মহোপাধ্যায় প্রীযুক্তদের পাঠান চাল অবলম্বন করেন। কারণ এই সুরহৎ প্রবন্ধটার একটীও foot note নেই, অন্যথা পাঠক যে কি করে বুঝবে দেখবার সময় তা তাদের নাই। তুলসী বাবুর প্রবন্ধ থেকে সাধারণ লোকে বুঝতে পারে যে বৌদ্ধ ধর্ম কেমন করে আমাদের তান্ত্রিক আচারের সঙ্গে মিশে আছে অর্থাৎ বাঙ্গালী বৈষ্ণব ও শাক্ত প্রভৃতির হিন্দু হলেও এখনও আট আনা রকম বৌদ্ধ আছে। প্রীকালিদাস রায়ের "বাপ পিতামহের ভিটে" কবিতাটি শক্তি শালী কবির শক্তির অপচয়ের নমুনা। আচার্য্য অধ্যাপক নাথের "শিরির ক্রিয়াকাণ্ড" দুর্লিখিত প্রবন্ধ, এইরূপ প্রবন্ধই মাসিক পত্রে ছাপা উচিৎ। অগ্রহায়ণের বঙ্গবাণী প্রবন্ধ গৌরবে মহিমান্বিত, আমরা বঙ্গবাণীর দীর্ঘ জীবন প্রার্থনা করি।

মাসিক বসুমতী, অগ্রহায়ণ ১৩৩০, এ মাসের প্রথম প্রবন্ধ বিজ্ঞানাচার্য্য শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল চন্দ্র রায়ের "বাঙ্গালির মস্তিষ্ক" প্রবন্ধে অনেক তথ্য সত্য কথা আছে কিন্তু সত্য কথা শোনবার লোকের এত অভাব যে মিথ্যাই সত্য বলে চলে যায়। শ্রীযুক্তপ্রভাত তুষার "বাঙ্গালার শীতিকাব্য"—

বৈকল্প কাল ক'ন্তির আর এক instalment ব্যাপার ঝোঁকা ও সম্বরণ বোধ হয় সম্পাদকীয় কালে যায় নেই। ছবি গুলি ভাল ছাপা হয় নি। তবে লেখাটি সময়োপযোগী। শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে উঠট সাথর একটি উৎকৃষ্ট কবিতা প্রেরণ করেন সেটি পাত্র পূরণের জন্য ব্যবহার হয়েছে। শ্রীবিমলা দেবী আবার "স্ত্রীজাতির শ্রেষ্ঠত্ব" শীর্ষক প্রবন্ধ। "বাঙ্গালার নব-যুগের ইতিহাস" বিষয়ে প্রবন্ধ, বোধ হয় সম্পাদকীয়। প্রবন্ধটি অত্যন্ত গভীর এবং সংক্ষিপ্ত বলে অপাঠ্য। শ্রীকালিদাস রায়ের "ইরাবতি ও তাপসে" একটি মোট কবিতা, তাতে আমাদের আপেক্ষার পরিচিত কালিদাসের ঘরোয়া অভাব। শ্রীঅজয় কুমার সরকারের "কাল বৈশাখী" গল্পটি বেশ হয় কিন্তু হিন্দুর ঘরে মালদুতো ভাই বোনের বিবাহ দেখলে একটু চমকাতে হয়। সে কালে রামচন্দ্র ও সীতার এই রকম বিবাহ হয়েছিল শুনতে পাওয়া যায় বটে আর একলে মাসীর ভালবাসার জন্য মামাতো আর মালদুতো বোন বিয়ে করা চলে কিন্তু বাংলা দেশে হিন্দুর সমাজে এটা Criminal in cest। "পুরাতন প্রসঙ্গ" প্রবন্ধটিতে বেশী রস পাওয়া গেল। মুন্সিগঞ্জে থেলার ব্যবস্থের আগলে এই রকম করে বাজে তৈরারী করা হতো। "প্রবিধা" সম্পাদকের কৃপায় একটা উপন্যাস এই সংখ্যায় শেষ হয়ে গেল। শ্রীসুরেন্দ্র নাথ সেনের "অবিস্মরণীয় রত" শীর্ষক প্রবন্ধ এখনও শেষ হয় নি। "প্রাচীন বাংলা" নামে বিয়ে যার বাহাদুর ডাক্তার শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেনের চোল সিটোকেন, চাকের বাদ্যে বাদলেই মিষ্টি হয় এবথা বোধ হয় সম্পাদক মাঝে মাঝে ভুলে যান। দীনেশচন্দ্রের এখন চোল পেটাই আছে কারণ তার কর্ম তিনি পরমা প্রেমভরে মন দিয়ে একেবারেই বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। শ্রীমাতঙ্গের মুখোপাধ্যায়ের কার্টিকেচরের প্রতি কবিতাটি বন্ধ নয় তু' একটা মারমার ঘতি ভঙ্গ হয়েছে যথা :—

তুমিতে তোমার অগ্নি-প্রতিম,
অমিতু তুমি চও—
পার এ বিশ্ব করিতে ভস্ম
নিমিষে লক্ষ-ভও।

শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ পাত্রীর "কৈশোর স্মৃতি" এই সংখ্যায় শেষ হয়ে গেল। বিজেন্দ্রলাল ঘোড়শোড় "বাঙ্গ-cartoon" বহুবঙ্গীয় মত মাসিকপত্রে শোভা পায় না, এগুলি অবতার না দিলিয়ে ভোগ। শ্রীযুক্ত মাসিক ভট্টাচার্যের বই চত্র গল্পটী অবাস্তবিক হলেও সুখপাঠ্য। মাসিক বাবু যাদের যে ছুটো চারটে গল্প লিখেছেন তার মধ্যে এই টাই সব চেয়ে ভাল। "ভারতে মুসলমানের দান" শীর্ষক গবেষণা উদ্দীন মোসাম্মেলের চেষ্টা—মুসলমান মাত্রেরই অবশ্য পাঠ্য যত দিন সকল মুসলমান এই ভাবে মাতৃ ভূমিকে দেখিতে আরম্ভ না করিবে ততদিন ঘরের ঘর সবই থাকিয়া যাইবে। নাটোর যুবরাজ শ্রীযুক্ত অমৃত লাল রায় "বিসর্জন" প্রবন্ধে আমাদের যৌবনের সাধীর দেবতা রবীন্দ্রনাথকে বিসর্জন দিয়াছেন। শেষে বৃদ্ধ ছুটো একটা বড় রকমের সত্য কথা বলেছে তাহা তুলবার লোভ সম্বরণ করতে পারলুম না।

"মরা প্রয়াগের পূর্ব্বে তুমি ভাবিয়া যাইতে পারিবে যে বঙ্গদেশে আর একটী রবীন্দ্র কাব্য অনেক দিন জন্মিবে না। শেষে দুঃখে তুমি বলেই যাও We shall never find your like again। আর শেষে তোমার জীবন যাইবার লোভ দেখিয়া লোক শিক্ষা করিবে যে তাদের মধ্যে সাধনা না করিলে একটু তুমিকে কেহই ৫-টুকু পদ প্রদান করিয়া স্থায়ী হইতে পারিবে না।"

শ্রীযুক্ত ক্ষেত্র মোহন মুখোপাধ্যায়ের "লক্ষ্মী" প্রবন্ধটি সুখপাঠ্য হয় পাঠ, অবশ্য চর্চিত চর্বণ নয়। শ্রীমতী স্বর্ণ কুমারী দেবীর কিন্তু ক্ষতি হয়েছে। কুমারী বিদ্যা কীর্তির নামটি মৌলিক বটে কিন্তু তাঁর অবদান কবিতাটি নেহাৎ অপাঠ্য না হলেও সুপাঠ্য না, কবির পরিচয় তার নেই। এই সংখ্যার বাটোর্ধ্য শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার সাহিত্যসেবী ৺পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্যিক শ্রাদ্ধ করেছেন। বাটোর্ধ্য প্রবীন কিছু তার লিখবার ক্ষমতা কেন থাকে না। মোহনের এমনুর রহমান চৌধুরীর অথবা মধ্যে কবিতাটি চিরকাল আমের মত মিষ্টি। কালে কেমন মাসিক পত্রের সম্পাদকের এরকম কবিতা না ছাপলে বোধ হয় পরিচালনা হয়। সেই বহু প্রশংসী, ভারতবর্ষ আর বহুবঙ্গী এই রকম কবিতা ছেপে কাগজ নষ্ট করেন। আর জানা ঐতিহাসিক শ্রীযোগেন্দ্র নাথ সমাদ্দারের "শিবাজী মুক্তাশ্রীন্" নামক ঠাঁড় ভাষা প্রবন্ধটি উপভোগ্য হিসাবে। কেন লেখা হয়েছে বুঝতে পারা গেল না। পরং বাবুর 'আবরণ' কোন্ জাতীয় মাসিক অবলম্বন করে চলেছে। শ্রীমৈত্রেয়ী দেবীর ভট্টাচার্যের 'রবীন্দ্র বন' কবিতাটি 'ইরাবতী হইতে', এটি সম্পাদকীয় ওজরে পেপার বাস্কেট হইতে বন্ধুলেই ভাল হত। প্রবাসীর মত বহুবঙ্গীও মাসিক পত্রে এক কর্ণা ধরে চালিয়েছেন। মাসিক পত্র গুলোর এই অংশ একেবারে অপাঠ্য।

বৃটিশ সাম্রাজ্যে স্কুলের সংখ্যা ৭১২৬৪, আর ছাত্র সংখ্যা ১৭৪০০০০।

• • • •

জার্মেন বিশ্ববিদ্যালয় :—জার্মেন বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র ও ছাত্রী সংখ্যা ক্রমেই বাড়িতেছে। যুদ্ধের পূর্ব্বে জার্মেন বিশ্ববিদ্যালয় গুলির ছাত্র সংখ্যা ছিল ৬০০০০, ১৯২১—২৩ সনের হিসাবে ছাত্র সংখ্যা ৮১০০০। টেকনিক্যাল বিদ্যালয় সমূহে যুদ্ধের পূর্ব্বে ছাত্র সংখ্যা ছিল ১২০০০ এখন সেই স্থলে ছাত্র সংখ্যা ২৩৫০০—প্রায় দ্বিগুণ। যুদ্ধের পূর্ব্বে ছাত্রী সংখ্যা ছিল ৪০০০ এখন সেই স্থলে ৮০০০। যুদ্ধের পূর্ব্বে অপেক্ষা এখন মোটের উপর জার্মেনীতে ছাত্র সংখ্যা ৩৮৫০০ বেশী।

• • • •

হাত ব্যাগের কারখানা :—ফরাসী প্যারিসের জন্য দেশ। সম্প্রতি সেখানে নূতন রকমের হাতব্যাগ বাহির হইয়াছে, ব্যাগ খুলিলে তাহার মধ্যে ছোট একটি বিজলী বাতি জ্বলিয়া উঠে। আঁধারে আর কিছু হাতড়াইয়া মরিতে হয় না।

দেশ-বিদেশ

পুত্র কর্ত্তৃক মায়ের নাসিকা কর্ত্তন।

ভাবী পত্নী দর্শনে উন্মাদ

ফ্রান্সে মার্শের বয়স একুশ বৎসর। সে একজন ব্যাভেরিয়া দেশীয় কৃষক। তাহার মা বহুদিন হইতে তাহাকে পলিন বার্গট নামে এক ৬০ বৎসরের বিধবাকে বিবাহ করিবার জন্য অনুরোধ করিতেছে, কিন্তু সে কিছুতেই রাজী হয় না। বলে ও রূপ বৃদ্ধি, কুৎসিৎ রমণীকে বিবাহ করিতে তাহার কিছুতেই প্রবৃত্তি হয় না। কিন্তু তাহার মা তাহাকে কেবল বিধবার টাকার লোভ দেখাইত অবশেষে মায়ের তাড়নায় সে বৃদ্ধাকে বিবাহ করিতে রাজী হয়। গির্জা ঘরে বেদীর উপরে সে তার ভাবী পত্নীকে দেখিয়া সে একেবারে উন্মাদ হইয়া যায় এবং একখানা ছোরা বাহির করিয়া তাহার মায়ের নাক কাটিয়া দেয়। তাহার ভাবী পত্নী বেগতিক দেখিয়া পলায়ন করে।

• • • •

এক গর্ভে চারিটি সন্তান—ইংলণ্ডে মিডলবরোর নিকট গ্রেঙ্গটাউনে মিসেস জেম্‌স ম্যাথুস নাম্নী এক স্ত্রীলোকের একই সময়ে দুইটি পুত্র ও দুইটি কন্যা প্রসূত হইয়াছে। সন্তান চারিটি ভালই আছে। এই মিসেস ম্যাথুসের ভগ্নীরও সম্প্রতি এক জোড়া সন্তান হইয়াছে। বার্লটিমোরে মিসেস জর্জ এস্ উটিগেরও এক সময়ে চারিটি সন্তান হইয়াছে।

• • •

ভারতের চরকার অদৃষ্টে যাহাই থাকুক, জার্ম্মেণীর এক ব্যাভেরিয়াতেই ৫ লক্ষ চলিতেছে, জার্ম্মেণীর নরনারী চরকায় সূতা কাটিতেছে। ভারতের মহাত্মার এত চেষ্টায়ও যাহা সম্ভব হইতেছে না, জার্ম্মেণীতে তাহা সম্ভব হইতে চলিয়াছে কেন? কারণ আমাদের কর্ম্ম ক্ষমতা নাই! আর জার্ম্মেণীর নরনারী কর্ম্ম-প্রবণ! সময় পাইলে আমাদের নরনারীরা সেখানে পাশা, তাস খেলেন, গল্প গুজব করেন, আলস্যে কাল কাটান, জার্ম্মেণীর নরনারী সেখানে, কাজ করে। এই চরকা-কাটা-স্বভাবটি জার্ম্মেণীর আছে বলিয়া সে কৃতকার্য্য হইতেছে, আমরা সেই চরকা-কাটা-স্বভাবটি, অর্থাৎ শিল্পীর নীরব কর্ম্ম-পটুতা ও কর্ম্ম-প্রবণতাটুকু হারাইয়া বসিয়াছি বলিয়াই চরকা আমাদের চলে না।

জার্ম্মেণী বেদ ছাপাইয়াছিল, বেদের প্রশংসা করিয়াছিল, ভারতবাসী সেই বেদ পড়ে, সেই বেদের প্রশংসা করে; জার্ম্মেণী এইবার চরকা ধরিয়াছে, সুতরাং ভারতবর্ষ এইবার চরকা হয়ত ধরিবে। কিন্তু সকলের মূলে ঐ কর্ম্ম-নিষ্ঠা। যাহা জার্ম্মেণীর আছে, ইংরেজের আছে, জাপানের আছে আমাদের নাই।

• • •

নর-রাক্ষস—পত্রান্তরে প্রকাশ যে, সিরাজগঞ্জ সহরতলীতে সম্প্রতি এক নর-রাক্ষসের আবির্ভাব হইয়াছে। সহরের নিকটবর্ত্তী কোন মাঠে দুইটী রাখাল বালক ছাগল চরাইতে ছিল; এমন সময় কোথা হইতে এক নর-রাক্ষস আসিয়া নখদন্ত দিয়া দুইটী জীবন্ত ছাগল ছিঁড়িয়া খাইতে আরম্ভ করে। বাধা দিলে সে একটী রাখাল বালকের গাল কামড়াইয়া দেয়। গ্রেপ্তার করিয়া তাহাকে ম্যাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে হাজির করিলে সে তাঁহার সঙ্গে ইংরাজী ভাষাতেই কথা চালায়। অতঃপর তাহাকে হাজতে রাখা হয়। কিন্তু নরমাংসের লোভ সংবরণ করিতে না পারিয়া সে একটী কয়েদীকে আক্রমণ করে। জানোয়ারটীকে সাবধানে রাখিবার প্রয়োজন মনে করিয়া তাহাকে বহরমপুরে প্রেরণ করা হইয়াছে।

• • • •

বিলাতের রাজনীতিক মহলে গলার ব্যাধিটা যেন সংক্রামক হইয়া উঠিয়াছে। মিঃ বোনারল ত ঐ রোগের জন্যই ছুটি লইয়া শেষে মারা গেলেন। খবর আসিয়াছে, মিঃ এসুইথেরও নাকি গলার ব্যাধি হইয়াছে। তবে তাঁহার এ ব্যাধি আশঙ্কাজনক নহে, এইটীই আশার কথা।

Printed by Bijoy Krishna Dass at the Lakshmibilas Press,
14, Jaggannath Dutta Lane, Calcutta.

বাসন্তী—

মদন ও রতি।

সচিত্র সাপ্তাহিক পত্রিকা

বাসন্তী

২য় বর্ষ] ১২ই মাঘ শনিবার ১৩৩০, ইং ২৬শে জানুয়ারী [২৮শ সংখ্যা

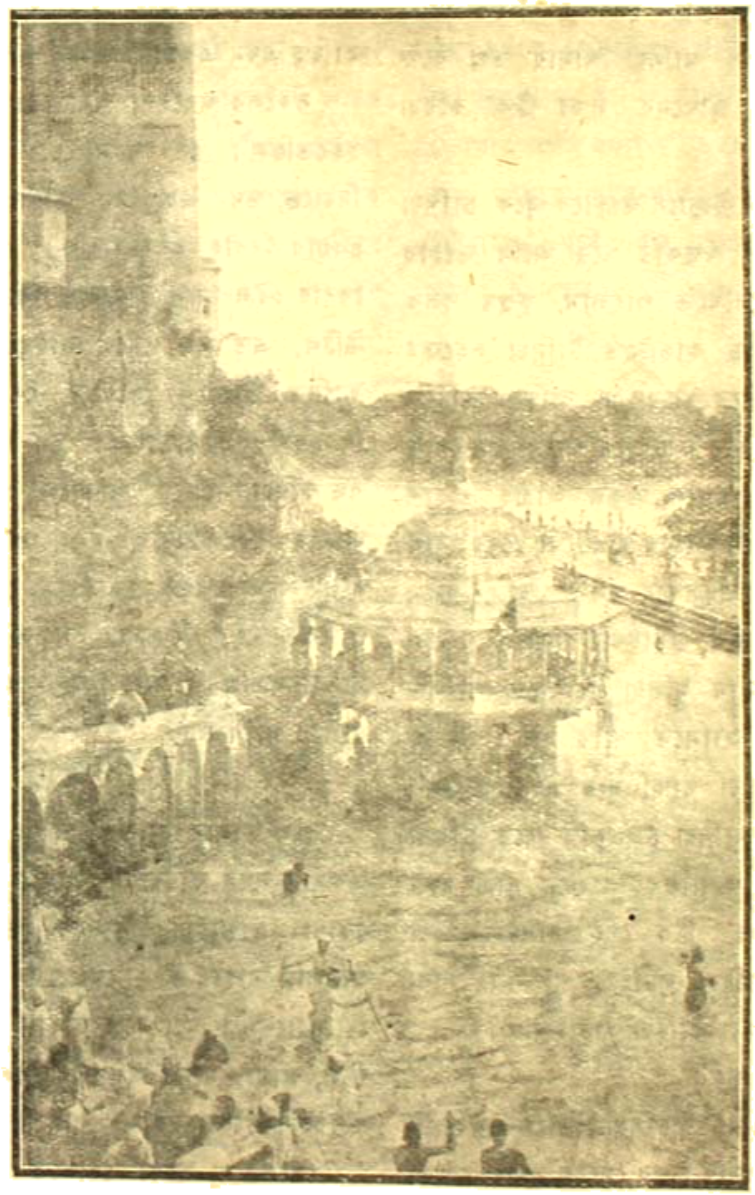

স্নানের ঘাট, হরিদ্বার।

অনাদৃতা

[শ্রীঅমিয়া রায়]

এক

যখন জীবনের আকুল আকাঙ্ক্ষায় বারবার নিরাশ হইয়া ব্যর্থতার গভীর বেদনায় সমস্ত হৃদয়টা আমার ভাঙিয়া পড়িবার উপক্রম করিতেছিল, জীবনটাকে একান্ত লক্ষ্য হীন বলিয়াই মনে হইতেছিল, ঠিক সেই সময়টিতে—আধ ফুটন্ত ঝরা ফুলটীর মত সে আসিয়া আমার তপ্ত বুকে আশ্রয় লইল,—আমার জীবনের লক্ষ্য ঠিক করিয়া দিল।

গভীর পুলকের ব্যাকুল উচ্ছ্বাসে তাহাকে বুকে চাপিয়া ধরিলাম। নীরব রাত্রিতে অন্ধকার ঘরে আমি তাহার ঘুমন্ত মুখ খানিতে হাসি দেখিতে পাইলাম, কুসুম পলক ক্ষুদ্র দেহ খানি বুকের বড় কাছটিতে টানিয়া লইতেই হৃদয় জুড়াইয়া যাইত। ধীরে ধীরে সে বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। যখন আমি তাহার কচি মুখে আধ আধ বাণী শুনিবার জন্য অশ্রু ভরা প্রাণে অকুল আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলাম তখনই সে তাহার বাক্য স্ফুরণের ব্যর্থ চেষ্টা দিয়া আমাকে বুঝাইয়া দিল যে সে বোবা। ক্রমে বাড়ীময় তাহার বোবা নাম ছড়াইয়া পড়িল। কোন এক সকালে তাহার রাণী নাম মুছিয়া বোবাতে পরিণত হইয়া গিয়াছে আমি তাহা জানিতে পারি নাই। অসহ্য বিদ্রূপে সে বাড়ীতে টিকিয়া থাকা দায় হইয়া উঠিল; এক দিন সন্ধ্যা বেলায় সে আসিয়া চুপি চুপি ঘরে ঢুকিয়া আমার বুকের যে জায়গাটা অশান্তির আগুনে দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া যাইতেছিল, ঠিক সেই খানটায় মাথা রাখিয়া অব্যক্ত ব্যথায় কাঁদিয়া লুটাইয়া পড়িল। সারা রাত্রি মা-মেয়ে অভুক্ত অবস্থায় কাঁদিয়া কাটাইলাম।

দুই

এমনি করিয়া পাঁচ ছয় বৎসর চলিয়া গিয়াছে—ইহারই মধ্যে এক অশুভ মুহূর্তে আমার উপর মেয়ের সমস্ত বোঝা চাপাইয়া দিয়া মেয়ের বাবা নিশ্চিন্ত মনে সংসার হইতে চির বিদায় গ্রহণ করিলেন। যে দিন বোবা আমার পিতৃহীন হইয়া বাসি ফুলটীর মত সমস্ত মুখে কালিমা মাখাইয়া আমার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল সেই দিনই সে আমায় ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিল যে, তাহার সমস্ত দায়িত্ব এখন একমাত্র আমার ওপরই নির্ভর করিতেছে।

সকলের অবহেলা অনাদরের মাঝখান দিয়া সে বড় হইতেছিল। সে যখন চৌদ্দ ছাড়াইয়া পনেরোয় পা দিয়াছে, তখন এক দিন তাহার খুড়তুতো ছোট বোন বেলুর বিবাহ হইয়া গেল। বোবা সে, তাই তাহার বিবাহ হইল না। নিষ্ঠুর বিদ্রূপে গ্রাম খানি ভরিয়া উঠিল, এত বড় মেয়ে আইবুড়ো। দলে দলে লোক আসিত তাহাকে দেখিতে—সে যেন একটা দেখিবার জিনিষই হইয়া দাঁড়াইল। সে আমার একলা ঘরে কবাট বন্ধ করিয়া নিজেকে আড়ালে রাখিতে চেষ্টা করিত,—আমার বিউতিবিনীর দল তাহাকে শুনাইয়া শুনাইয়া বলিত—'এত বড় মেয়ে এখনো যেন নেকা, কিছুটি আর বোঝেন না।' কেহবা বলিত 'যাগো! আমরা হ'লে মরেই যেতাম।' অশ্রু সিক্ত মুখে সে শুধু আমার পানে চাহিয়া থাকিত।

তিন

বয়স তাহার বাড়িয়া চলিল। আমি তখন কান্নাই একমাত্র সম্বল করিয়া লইলাম। সেবার সে আঠারোর কোটা ছাড়াইয়া উনিশে উঠিয়াছে—তখন একদিন শুনিলাম তাহার কাকা মেয়ের বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করিয়া আসিয়াছেন। বাড়ীতে তাহার লাঞ্ছনার চূড়ান্ত হইতেছিল, আমার মনের অশান্তির ঝাল ও মাঝে মাঝে তাহার ওপরই মিটাইয়া লইতেছিলাম।

ছেলের মা পাকা দেখিতে আসিয়া আমার বাড়ীর

ঠাকুরাণীকে বলিলেন—"তা'মা, আমারই কি আর মত ছিল ; সবাই বল্‌লে 'একটা বোবা মেয়েকে উদ্ধার করে আর বিধবা মাকে রক্ষা কর তারপর পছন্দ মত ছেলের বিয়ে দিয়ে সুন্দরী বৌ ঘরে এনো।' ছেলের ও মন ভিজে গেল। বল্‌লে মা একটা দাসীরও তোমার দরকার এখন। এরপর না হয় দেখে শুনে মনোমত বৌ এনে নিয়ো এখন। তাই না সম্মত হলুম।" আমার শাশুড়ী বলিলেন "হা ম; এটাকে আগে উদ্ধার করে দাও তার পর টুকটুকে বৌ ঘরে আন্‌বে আশীর্ব্বাদ করি।" ইচ্ছা হইতে ছিল- বলি 'ওগো বৌ করে না ও তো মেয়ের বিয়ে দেব নইলে দাসী হয়ে থাকার জন্যে আমার অভাগা -মেয়ের বিয়েতে কাজ নেই।' তাড়াতাড়ি পেছন ফিরিতেই দেখি বোবা আমার কাছে দাঁড়াইয়া,—তাহার চোখ ছাপাইয়া অশ্রুর বন্যা বহিতেছিল। জোর করিয়া হাত ধরিয়া টানিয়া ঘরে আনিয়া বলিলাম "হতভাগা মেয়ে। ওখানে কি শুনতে যাওয়া হয়েছিল? একেবারে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খেলে যে আমায়।' মুক সে একটা অস্ফুট চীৎকার করিয়া বিছানায় লুটাইয়া পড়িল।

রাত্রিতে ডাকিতে আসিয়া দেখি সমস্ত শরীর আগুনের মত গরম। জ্বরে সে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিল। পাশে বসিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া সারাটী রজনী আসিয়া কাটাইলাম। আহা! আমার বড় সাধের মেয়ে সে, কত আদরের ধন! ভোরের বেলা সকলের পায়ে ধরিয়া কত সাধিলাম—একবার একটা ডাক্তার আনিয়া দেখাও গো।" নিষ্ঠুর হৃদয় হীনের দল মুখ ফিরাইয়া বলিল 'বোবা মেয়ে মরে না লো, অমনিই সেরে যাবে। তিন দিন কাটিল। তাহার বিবাহের দিন আসিয়া পড়িল। দেখিলাম দিনের আলোর সঙ্গে সঙ্গে বাছার আমার চোখের আলোও নিভিয়া আসিতেছে। গোলমালে বাড়ী ভরিয়া উঠিয়াছে। সন্ধ্যা হইলে একমুষ্টে সে আমার পানে তাকাইয়া রহিল। তপ্ত দেহখানি খানি জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিয়া কহিলাম 'তোমায় আমি দাসী হ'তে দেব না মা!' চাহিয়া দেখিলাম তাহার মৃত্যু-মলিন মুখে স্বর্গের মাধুরী ফুটিয়া উঠিয়াছে,—মনে হইল দেবতারা তখন তাহাকে রাণীর আসন দিয়াছেন।

ভ্রান্ত

[শ্রীসতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়]

(গান)

কেন গো মিছে বলে, সতত কথা ছলে,
　জীবনে পলে পলে, ভুলাও আমারে হায়!
চাহিনা বারেবারে, শুনিতে শতবারে
　কিবা ও আঁখি আছে। বচা সে সমুদায়!
তোমারি কথা দিয়ে করেছ বাকহীন—
ওহ ও আঁখি আছে, আঁখি যে হ'ল লীন!
　সরল প্রাণে হায়, অবশ করি হেয়
মানস ছলিতেছ কেমনে কহি তায়?

ভুলে যাই, ভুলে যাই বেদনার এ বহন
দুয়ারে দাঁড়াইয়া কেড়ে যে লহ মন!
　কঠিন কথা যত কহিব ভাবি মনে,
　মধুর হয়ে তত কেমনে বাহিরায়!
ছলনা কর ক্রুর, বুঝিতে দাও কেন?
　আঁধারে আবরিয়া চমকি' চপলা হেন
প্রভাত-আলো সম, ছুটা'য়ে অনুপম,
　জ্বালা'য়ে রাখো মম, মানস বিরালায়।

স্বরাজ-মন্দিরে

মন্ত্র একতা

[শ্রীফটিক চন্দ্র সরকার]

দল-বেদল খেলার সময় আর নাই এখন চাই একতা, চাই মিলন, চাই কাজ এক যোগে এক প্রাণে। যারা সামনে গিয়ে পড়েছে তাদের আরও আগিয়ে দিতে হবে, পেছু টানলে আর চলবে না; ও আমরাই স্বরাজ পথের প্রথম পথিক, স্বরাজ রথের প্রথম যাত্রী; তাদের সে অনিশ্চয়ের হাঁটা পথে এক পথ চলতি অচিন্ মানুষ নিজ মনে গাইছে :—

ভাই প্রাণে বাজে
এ প্রলয় মাঝে

চল্ চল্ চল্ সামনে চল্
সবাই মিলে চল্ মনের মিলে চল্
ঝুকে ধররে বল্ ধররে আশার বল্
চল্ চল্ চল্ সামনে চল্।

এ প্রলয় সাঁঝে দেশ মায়ের বিলাপ-রোলের মাঝে কে বলেরে বারে বারে কাণ করে ঐ শোন্ —

একতাই বল
পথের সম্বল
ফেলে রাখ দল
'একমন্ত্র' বল।

আজ এ ছিন্ন ছিন্ন দেশকে এক করতে জাগতিক মঙ্গলের জন্য, অনুষ্ঠান, প্রতিষ্ঠানের মাঝে পরম কেমঙ্কর শুভঙ্করী নবলীলায় অবতীর্ণ। এমন এক সময় এল বলে যখন রণ্ রণ্ করে সাড়া ভারত জুড়ে জাতীয়তার শুভ-প্রেরণা, বিশ্ব-মঙ্গলের ঘনীভূত অপ্রতিহত ইচ্ছা এ ঘোর দুর্দিনে দেশ আঁধারে উঠবে জেগে, উঠবে জ্বলে; ব্যক্তির, সম্প্রদায়ের ও দলের আদর্শ তখন কম বেশী মলিন হয়ে যাবে; উপস্থিত কর্ত্তব্য বুদ্ধিতে পরিবারদের চালিয়ে নিয়ে লীলাময় তখন এক মজার খেলা ঘটাবেন। যা ঘটবার তাতো ঘটবেই, তবে বিনা সময়ের ইঙ্গিতে খেলা না করাই ভাল। এখন তাই চাই তাঁর সে কাজের জন্য সময় প্রেরিত সে সব আত্মা যাঁদের সামনে পথের বাধা সব কেটে যাবে, স্বরাট্-রথ অবাধ হয়ে ঘর্ ঘর্ চলতে থাকবে; এ দুঃসময়ে সব দরবারে আমাদের তেমন সব মানুষ রাখার দরকার যাঁরা সময়ের ডাক শুনেছেন ও কালের হুমকি মানতে চান না। ঐ ডাকছে সময় বারে বারে সে সবারে—

এস এস দেশ মায়ের ছেলে
এস গো এখন দলে দলে
গড়তে সে মহাদল
লভতে স্বরাজ ফল।

শুন বিধাতার ধ্রুব আহ্বান—

ভেদের সময় নয় এ
এ মহা মিলন বে।

এখন সকল অনুষ্ঠান, প্রতিষ্ঠানের ভিতরে সে কর্ম্মী সাধকের দল মজবুত রইলে দেশ জোড়া ঐ প্রলয় বন্যা কতকটা নিয়ন্ত্রিত ও শুদ্ধ হয়; সকল অনুষ্ঠান নিয়ে সে সারা দেশ জোড়া মহাদল ছোট হতে ছোট কত না দল ভিতরে ঘরে খুব বড় হয়ে গড়ে উঠুক; সঙ্ঘবদ্ধ যার মন কলরোল, ধ্বনি অবিরাম—

এ ঘন আঁধারে বিপদ মাঝারে
আছে কি সম্বল?
একতাই বল।
স্বরাজ মন্দিরে সেব স্বাধীনতা
স্বপনে গাওরে
মন্ত্র সেই একতা।

ইণ্ডিয়ান সোপ কোম্পানীর
মেসিনে প্রস্তুত
চন্দন, রজেলবকুল, মাস্ক ও ভেলভেট সাবান
ব্যবহার করুণ। টেলিফোন, ২৪৯৯

শাস্তি

[Maurice Iwel হইতে]

[শ্রীসুকুমার ভাদুড়ী, বি, এস্, সি]

"——"ব্যাঙ্কের অর্থ সংগ্রাহক র‍্যাভেনো ছিল একজন আদর্শ যুবক। তা'র বিরুদ্ধে অভিযোগ আনবার উপযুক্ত বিন্দুমাত্র অপরাধও কেউ তা'র কার্য্যাবলীর মধ্যে খুঁজে পেতো না। তা'র হিসাব নিকাশের খাতার মধ্যে কেউ একটী সামান্য ভুলও বে'র কর্ত্তে পার্ত না।

সে ছিল সম্পূর্ণ একাকী; নূতন লোকের সঙ্গে পরিচয় ক'র্ত্তে রূপসী যুবতীদের প্রেমে প'ড়তে সে চাইত' না মোটেই; এবং এমনি ধারা নিরস নিঃসঙ্গ ভাবে একাকী বাস ক'র্ত্তে সে একটা অসীম তৃপ্তি ও আনন্দ অনুভব ক'র্ত্তো। কেউ যদি তা'র কাছে কখনও ব'লতো "এত টাকা নিয়ে ঘাঁটা ঘাঁটি ক'র্ত্তে গেলে লোভে পড়াটা কিছু অসম্ভব নয়" সে তা'তে অত্যন্ত সহজ ভাবেই উত্তর ক'র্ত্তো "কেন? যে টাকা আমার নিজের নয় সে টাকাত' টাকাই নয়।"

যে অঞ্চলে র‍্যাভেনো বাস ক'র্ত্তো সে অঞ্চলের লোকের কাছে সে ছিল একটী আদর্শ মহাপুরুষের ন্যায়। তা'র উপদেশ এবং পরামর্শ প্রায় প্রত্যেক ব্যক্তিরই আবশ্যক ও ফলপ্রদ হ'ত।

হঠাৎ একদিন সন্ধ্যার সময় অর্থ সংগ্রহের পর র‍্যাভেনোকে আর গৃহে ফিরতে দেখা গেল না।.....যা'রা তা'র পরিচিত আত্মীয় বন্ধু ছিল তা'রা কিছুতেই তা'দের ধারণাতেই আনতে পার্লে না যে র‍্যাভেনো কখনও কোনও অসৎ কাজ ক'রে থাকতে পারে।.....হয় ত' বা সে কোনও একটা গুরুতর অপরাধই ক'রে ফেলেছে।... পুলিসের লোক তা'র সমস্ত দিনের গতি বিধিই লক্ষ্য ক'রে এসেছিল।.....র‍্যাভেনো ঠিক সময়েই ব্যাঙ্কে তা'র রসিদ প্রদান ক'রেছিল, এবং সর্ব্বশেষ অর্থ সংগ্রহ ক'রেছিল সে "বন্ধু গেটের" নিকট; তখন তা'র কাছে অর্থ ছিল প্রায় ২০০,০০০ ফ্রাঙ্কেরও উপর।.....এর বেশী সন্ধান আর কেউ জান্ত না।.....সন্ধ্যার পর তা'রা অনুসন্ধান ক'রে বেড়ালো কিন্তু কোনও ফল হ'ল না। .....তা'রপর তা'রা চারিদিকে তারযোগে সংবাদ পাঠিয়ে দিলে——র‍্যাভেনোর অনুসন্ধান কর্ব্বার জন্য। .....কিন্তু ব্যাঙ্কের তত্ত্বাবধায়কগণ এবং পুলিসের লোকেরা নিঃসন্দেহে অনুমান ক'র্লে যে সে কোথাও অর্থের জন্য অপেক্ষা ক'রছিল, এবং এমনি সময় ডাকাতের দল তা'র টাকা লুঠ ক'রে নিয়ে তা'কে নদীর জলে নিক্ষেপ করেছে; কয়েকটা তারের মন গড়া প্রমাণ দিয়ে এই সংবাদটাই তা'রা সত্য সংবাদ ব'লে কাগজের সাহায্যে চারিদিকে ঘোষনা ক'রে দিলে।

কিন্তু প্যারীতে এক ব্যক্তি যখন এই সংবাদটা সংবাদ পত্রের বুক থেকে অবগত হল—তখন সে ঘাড় নেড়ে মনে মনে এর অসত্যতা-টুকু বেশ স্পষ্ট ক'রেই অনুভব ক'র্লে। সে ব্যক্তি হ'চ্ছে আমাদের সেই র‍্যাভেনো।

গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে পুলিসের কুকুর গুলো যখন অবশেষে তা'র পায়ের গন্ধের দিক নির্দ্দেশক রেখা হারিয়ে ফেল্লে——র‍্যাভেনো তখন এসে পৌঁছেছে সিন্ নদীর তীরবর্ত্তী এক নির্জ্জন প্রদেশে। সেখানে সে পূর্ব্ব রাত্রে তা'র কয়েকটী দৈনন্দিন পোষাক রেখে গিয়েছিল।..... তথায় উপস্থিত হ'য়ে সে, একটা 'ব্রিজের' পাশে দাঁড়িয়ে আস্তে আস্তে নীরবে সে গুলিকে প'রলে;——সেই ২০০,০০০ ফ্রাঙ্ক সে তা'র পকেটের মধ্যে রাখলে;— তা'র পর সেই পরিত্যক্ত বস্ত্র গুলিকে একটা পুঁটলি ক'রে বেঁধে এবং ভিতরে একটা পাথর দিয়ে ভারি ক'রে নদীর জলে নিক্ষেপ ক'রলে, তার পর সে ফিরে এলো নির্ব্বিবাদে প্যারী সহরে।.....সেখানে এসে সে এক হোটেলে সারারাত্রি নিদ্রা গেল মহা শান্তিতে।.. .....এই কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই সে হ'য়ে দাঁড়িয়েছে একজন আদর্শ সংযুবক থেকে একটা মস্ত সম্পূর্ণ মিথ্যাবাদী জুয়াচোর।

চুরি ক'র্ব্বার পর সে অনায়াসেই যে কোনও একখানি ট্রেন ধ'রে কোনও এক দূর দূরান্তর স্থানে পালিয়ে যেতে পার্ত। কিন্তু সে মনে ক'র্লে যে চুরি করার পর অধিক দূরের চেয়ে কোনও এক নিকটবর্ত্তী স্থানই অধিকতর নিরাপদ।.....অবশ্য সে তা'র ভবিষ্যৎ ভাগ্যের কথা

খুব ভাল ক'রেই জান্তো।.....সে নিঃসন্দেহে জান্তো যে একদিন না একদিন তা'কে পুলিশের নির্দ্দয় কবলে পড়তেই হ'বে।.....আর সঙ্গে সঙ্গে তা'র পরিণামটাও সে স্পষ্ট উপলব্ধি ক'র্ত্তে; উপরন্তু তা'র মৎলবটা ছিল একটু বিভিন্ন ধরণের।.....

রাত্রি প্রভাত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে সেই নোট গুলোকে এক খানা খামের মধ্যে পুরে' সেটাকে ভাল ক'রে 'সীল' ক'রে ফেল্লে; তারপর সে এক আইন ব্যবসায়ীর কাছে এসে উপস্থিত হ'লো।

র‍্যাঙ্কেনো ব'ল্লে, "মশাই, এইটার জন্তে আমি একবার আপনার কাছে এসেছি। এর মধ্যে আমার কতক গুলো এমন আবশ্যকীয় কাগজ পত্র আছে যা' আমি খুব একটা নিরাপদ স্থানে রাখতে চাই। .....আমি এবার খুব দূর জায়গায় যাচ্ছি—এবং কবে যে ফিরবো তা'রও স্থিরতা নেই। আমি এই বন্ধ খামটাকে আপনার কাছে রেখে যেতে চাই .....বোধ হয় এতে আপনার আপত্তি নেই?"

না, না,—আমি এখনই আপনাকে এর রসিদ্ দিচ্ছি।" র‍্যাঙ্কেনো এতে সম্মত হ'য়ে মনে মনে কি ভাবতে লাগ্লো।—সে ভাবলো যে রসিদ নিয়ে সে রাখবে কোথায়? এমন কে তা'র বিশ্বাসী বন্ধু আছে যা'র কাছে রেখে সে নিশ্চিন্ত হ'তে পারে! তা'র নিজের কাছে রাখাও বর্ত্তমানে কিছুমাত্র নিরাপদে নয়।.....সে ঠিক ক'রে উঠতে পার্লে না বাস্তবিক সে রসিদটা নিবে কি না।.....অবশেষে অনেক চিন্তার পর সে ব'ল্লে,—দেখুন, এ পৃথিবীতে আমি সম্পূর্ণ একা—আত্মীয় বন্ধুহীন। .....আমার ভ্রমণে বিপদেরও সম্ভাবনা আছে ঢের। আমার ভয় পাছে এ রসিদটা হারিয়ে ফেলি।.....তা'র চেয়ে আপনি এটা বিনা রসিদেই আপনার কাছে রেখে দিন্—পরে আমি যখন ফিরব তখন আপনার বা আপনার ছেলেদের কাছে থেকে আমার নাম ব'লে আমি জিনিষটা নিয়ে যাব? সেই সুবিধা।"

"কিন্তু তা' যদি ক'র..

"রসিদের উপর লিখে দিন যে ওটা আমি এম্নি ক'রেও পেতে পারি। যেমন ক'রেই হ'ক, তা'তে যদি কোনও বিপদ হয় তার জন্ত দায়ী আমি।"

"বেশ আপনার নাম কি?"

"হু' বাজার.....

তারপর আইন ব্যবসায়ী ডাক্লে "হেন্‌রি হেন্‌রি!"

* * *

রাস্তায় এসে র‍্যাঙ্কেনো একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেল্লে। তা'র কার্য্য তালিকার প্রথম পর্ব্ব সম্পন্ন হ'য়ে গেল। এবার তা'র হাতে বন্দীর শৃঙ্খল প'ড়লেও কোন ক্ষতি নাই।.....

বিচারের পর তা'র শাস্তি হবে। কিন্তু শাস্তির মেয়াদ ফুরিয়ে গেলে সে ত' এই সমস্ত অর্থই নির্ব্বিবাদে উপভোগ ক'র্ত্তে পার্ব্বে! মাত্র কয়েকটা বৎসর একটু কষ্ট সহ্য ক'র্ত্তে পার্লেই ত' সে খুব একটা ধনী লোক হ'য়ে পড়বে। সে তখন আবার তা'র দেশে ফিরবে।... ...দেশের মধ্যে তখন সে একটা মস্ত বড় গণ্য মান্য লোক হ'য়ে দাঁড়াবে। তারপর সে পূর্ণ নিবিড় সুখে ও শান্তিতে তা'র জীবনের শেষ ভাগটা কাটিয়ে দিতে পারবে।.....

তারপর পূর্ণ ২৪ ঘণ্টা ধরে সে তা'র নোটের নম্বর গুলো মুখস্থ ক'র্লে এবং পরিশেষে সে স্বয়ং এসে পুলিশের হাতে ধরা দিলে।.....

আদালতে বিচারকের সাম্নে সে ব'ললে, যে সে যখন একটা বেঞ্চের উপর অচেতনাবস্থায় ঢুলছিল একটা দস্যু এসে তখন তা'র সমস্ত অর্থ, লুট ক'রে নিয়ে যায়।.....তারপর বিচারকের আজ্ঞায় পাঁচবৎসর কারাবাসের ব্যবস্থা হ'ল।.....অত্যন্ত সহজ ভাবেই নিঃসঙ্কচিত্তে সে তা'র হুকুম শুন্লে,——তারপর ধীরে ধীরে হাসি মুখে কারাগারের উদ্দেশ্যে প্রস্থান ক'র্লে।

* * *

অবশেষে পাঁচবৎসর কারাবাসের পর সে যখন মুক্তি পেল, তখন সে সর্ব্ব প্রথমেই বরাবর সেই আইন ব্যবসায়ীর কাছে উপস্থিত হ'ল।..... .....মনে মনে সে ভাবলে, হয়ত সে তাকে চিন্তেই পার্ব্বে না। এই দীর্ঘ পাঁচ বৎসরে তা'র চেহারার কত পরিবর্ত্তনই না সংঘটিত হ'য়েছে। তা'র অর্দ্ধেক চুল পেকে গেছে, গালের উপর চামড়া

শিথিল হ'য়ে প'ড়েছে—সে প্রায় নুয়ে হ'য়ে এসেছে। .....বাস্তবিক যদি সে তা'কে চিন্‌তে না পারে, তবে কি মুস্কিলটাই না হবে তা'র।

"কি চান মশাই ?"

"আজ পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে আমি আপনার কাছে যে জিনিষটা জমা রেখে গেছলাম, আজ সেইটা নিতে এসেছি।"

"কি জমা ? কি নামে ?

"নাম হ'চ্ছে....." হঠাৎ থেমে গিয়ে ব্যাকেলো মনে মনে কি যেন বিড় বিড় ক'রে ব'কতে লাগ্‌লো।..... যে ছদ্ম নামটা সে সেদিন তা'র কাছে ব'লেছিল—সেটা তা'র কিছুতেই মনে আস্‌ছিল না।

সে মাথা চুলকাতে চুলকাতে একখানা বেঞ্চের উপর ধপ ক'রে ব'সে প'ড়ল; অত্যন্ত অবসাদ গ্রস্তের মত হাঁফাতে লাগ্‌লো।.....কিন্তু শত সহস্র চেষ্টা সত্ত্বেও সে তা'র সেই ছদ্ম নামের লুপ্ত স্মৃতিটাকে তা'র মনের মধ্যে টেনে আন্‌তে পার্লে না।

প্রায় এক ঘণ্টা সে চুপ করে একখানা বেঞ্চের উপর ব'সে তা'র ব্যগ্র মনটাকে ডুবিয়ে দিলে স্মৃতির অতল গর্ভ পর্য্যন্ত, যদি সে তা'র সেই বিস্মৃত নামটার পুনরুদ্ধার ক'র্ত্তে পারে। তার মনে হ'তে লাগ্‌লো নামটা যেন কণ্ঠ পর্য্যন্ত এসে হঠাৎ আট্‌কে যাচ্ছে—জিহ্বায় আর এসে পৌঁছুতে পার্চ্ছে না।.....তা'র চোখের সামনে যেন সেই নামের, তা'র সেই অক্ষর গুলোর একটা অস্পষ্ট প্রতিচ্ছবি নৃত্য ক'রে বেড়াতে লাগ্‌লো। প্রত্যেক মুহূর্ত্তেই সে মনে ক'র্ত্তে লাগলো যে পরমুহূর্ত্তেই বুঝি তা'র মনের মধ্যে ভেসে উঠ্‌বে সেই ক্ষুদ্র নামটা এবং তার অধরের মুক্ত দ্বার দিয়ে সে আপনাকে মুক্ত ক'রে দেবে।

কিন্তু কৈ.....সমস্ত চিন্তাই তা'র বৃথা! সমস্ত দেহের মধ্যে দিয়ে একটা তীব্র তড়িৎ-প্রবাহ ছুটে গেল ——তা'র শিরা উপশিরার প্রতি রক্ত কণাটিকে উত্তপ্ত ক'রে দিয়ে। তা'র মাংস পেশী গুলো যেন ক্রমে শিথিল হ'য়ে প'ড়তে লাগলো;—এমন স্থির হ'য়ে ব'সে থাকা তখন তা'র পক্ষে অসম্ভব হ'য়ে উঠলো। সর্ব্বাঙ্গ কাঁপ্‌তে লাগলো। নিষ্ফল আক্রোশে সে দাঁত দিয়ে তা'র শুষ্ক অধর দংশন ক'র্‌তে লাগ্‌লো।

একি নিষ্ঠুর বিড়ম্বনা তা'র!.....রোষ ক্ষোভ, অনুতাপ সকলে মিলে তা'র হৃদয়টিকে উদ্বেল ক'রে তুল্‌লে;—অত্যন্ত ক্রন্দনের ইচ্ছা সত্ত্বেও তা'র চোখের কোণে এক বিন্দু অশ্রু এলো না; দুই চক্ষু দিয়ে তা'র বেরিয়ে আসতে লাগ্‌লো যেন—দাবাগ্নির দীপ্ত অগ্নি স্ফুলিঙ্গ। উদ্বেল অন্তরের মধ্যে সহস্র মনোবৃত্তির সংঘর্ষণে যে দারুণ বহ্নির সৃষ্টি হ'য়েছিল—তারই উত্তাপে তা'র হৃদয়ের সমস্ত অশ্রু শুকিয়ে বাষ্প হ'য়ে গিয়েছিল।

যতই সে অধিক মনোযোগের সঙ্গে তা'র সেই বিস্মৃত নামের পিছনে ছুটিয়ে দেয় তা'র ব্যাকুল মনটাকে—ততই তা'র নামটা যেন দূরে আরও দূরে স'রে যেতে লাগ্‌লো —সীমাহীন বিশ্ব চক্রবালের মত।

মাটির উপর সজোরে একটা পদাঘাত ক'রে সে উন্মত্তের মত চীৎকার ক'রে উঠলো—"না—মিথ্যা আর ভেবে লাভ কি? বেশী ভাবলে ত কিছুতেই মনে আসবে না;—তা'র চেয়ে না ভাবলেই বরং শেষে আপনি মনে আস্‌বে।

কিন্তু যতই সে তা'র সমস্ত চিন্তাকে মন থেকে ঝেড়ে ফেল্‌তে চায় ততই যেন সেই চিন্তাটা আপনি এসে তা'র মনের কোণে উঁকি দেয়।.....ভুল্‌বার জন্য সে রাস্তার পথিকদের মুখের পানে চেয়ে রইল;—যেখানেই ভিড় দেখে সেই খানেই হঠাৎ থেমে প'ড়ে অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে রাস্তার কলরোল শুন্‌তে চেষ্টা ক'চ্ছে।.....কিন্তু সমস্তই বৃথা। সমস্ত চীৎকার সমস্ত ভাবনার স্রোতকে ছাপিয়ে সেই একই চিন্তা তা'র মাস্তিষ্কের মধ্যে নৃত্য ক'র্ত্তে লাগ্‌লো—অবাধ্য সরল শিশুটির মত——তা'র সেই বিস্মৃত নামের প্রবল চিন্তা।

ক্রমে সূর্য্য অস্ত গেল; রাত্রির অন্ধকার বিশ্বের বুকে জমাট বেঁধে উঠ্‌লো। দিবসের জন-কোলাহল মুখরিত নগরের রাস্তা নিবিড় নির্জ্জনতায় ভ'রে উঠ্‌লো। .....নিতান্ত অবসন্ন দেহে একটা হোটেলে গিয়ে আশ্রয়ের জন্য একটা ঘর নিয়ে ব্যাকেলো তা'রই মধ্যে একটা শয্যার উপর শুয়ে প'ড়লো।.....উত্তেজিত

মস্তিষ্কে দীর্ঘ চিন্তার পর শেষ রাত্রের দিকে তার চোখ ছেয়ে এলো নিদ্রার শান্তিময় আবরণে!..... .....যখন সে জাগলো তখন বেলা অনেক হ'য়েছে ; একটু স্মৃতি অনুভব ক'রে সে একবার সমস্ত শরীরটাকে শক্ত ক'রে বিছানার উপর ছড়িয়ে দিয়ে আলস্য ভেঙে নিলে ;—কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই আবার তা'র সেই পূর্ব্ব দিনের চিন্তা তা'র মনের মধ্যে উদিত হ'য়ে মনকে আবার তেমনি ব্যাকুল ক'রে তুল্‌লো।.....

আবার তা'র লুপ্ত স্মৃতি নূতন ক'রে তা'র তীব্র বেদনা নিয়ে বিপুল বিক্রমে জেগে উঠ্‌লো—তা'র সমস্ত দেহ মনকে ব্যাধাতুর ক'রে তুল্‌তে। সঙ্গে সঙ্গে তা'র মনে একটা ভয়ের সঞ্চারও হ'লো। তা'র ভয় হ'ল—সত্যই বুঝি আর এ নাম তা'র মনে হ'বে না হ'বে না ; আর বুঝি সে তা'র সেই সঞ্চিত অপহৃত অর্থ ফিরিয়ে পাবে না! আর বুঝি সে .....।

অকস্মাৎ সে তা'র শয্যা পরিত্যাগ ক'রে উঠেই বেরিয়ে প'ড়লো—জাগ্রত কোলাহল পূর্ণ সেই মহানগরীর পথিমধ্যে। আপন মনে নিরুদ্দেশ গতিতে সে হেঁটে চ'ল্‌লো যে দিকে তার দুই চক্ষু তা'কে নিয়ে যেতে চায়, অনন্ত পথের যাত্রীর মতন শ্রান্তিহীন ক্লান্তিহীন ভাবে! .....আবার সূর্য্য ডুবে এলো ; আবার সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে রাত্রি নেমে এলো—একটা ঘনকৃষ্ণ যবনিকায় নিজের সর্ব্বাঙ্গ আবৃত ক'রে তা'র চির নিয়মিত গতিতেই ; কিন্তু রাত্রিজাগরণ চলার আর শেষ হ'ল না।..... .. অবশেষে হঠাৎ সে আপন মনে উন্মত্তের মতই তীব্র চীৎকার ক'রে উঠলো—"পাগল হ'য়ে যাবো—পাগল হ'য়ে যাবো।"

তা'র মনে হ'ল——এই ২০০,০০০ ফ্রাঙ্কের জন্য সে কতই না করেছে। সাধু থেকে চোর হ'য়েছে ; নিজের সমস্ত সুনাম, সুখ্যাতিকে বেচ্ছায় বিনষ্ট ক'রে কলঙ্কের পসরাকে সে বহতে মাথায় তুলে নিয়েছে ;——নিজের সুখের সংসারকে পরিত্যাগ ক'রে সে পাঁচবৎসর কারা-বাসের যন্ত্রনা পর্য্যন্ত ভোগ করেছে! কী না ক'রেছে—সে এই অর্থ লাভের জন্য! কিন্তু সেই অর্থ অপহৃত হ'লেও যা' আজ ন্যায়ত তা'র নিজেরই আজ তা'র হাত থেকে অনেক দূরে—; প্রাপ্তির শেষ আশা টুকু পর্য্যন্ত আজ লুপ্ত হ'য়ে গেছে..... মাত্র ক্ষুদ্র বাক্যের বিস্ফরণের জন্য! এই সামান্য নামটাই আজ অটল হিমাদ্রির মত তা'দের উভয়ের মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছে——একটা কঠোর দুর্ভেদ্য ব্যবধানের সৃষ্টি ক'রে।.....উত্তেজনার তাড়নে সে ঘন ঘন মস্তকে করাঘাত ক'র্ত্তে লাগলো ; মাতালের মত টল্‌তে টল্‌তে সে কখনও বা রাস্তার ল্যাম্প পোষ্টের গায়ে প'ড়ে খাচ্ছা খায়, কখনও বা পথিকদের ঘাড়ের উপর গিয়ে প'ড়ে, তা'র চিন্তা শক্তি ও যেন ক্রমে লুপ্ত হ'য়ে এলো!.....জ্ঞানহীন উন্মত্তের মত সে তন্দ্রা হীন চক্ষে পথে পথে ঘুরে বেড়াতে লাগ্‌লো ;—উত্তেজনার উৎপীড়নে ঘন স্পন্দিত বক্ষের শোণিত কণাগুলো তা'র যেন তখন তাণ্ডব নৃত্য সুরু ক'রেছে!.....ক্রমে তা'র স্থির বিশ্বাস হ'ল যে আর সে কিছুতেই তা'র হৃত নাম স্মরণ ক'র্ত্তে পার্ব্বে না! মনে হ'ল——পথের লোকগুলো যেন সবাই তা'কে চোর ব'লে জান্‌তে পেরে তারই পানে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ ক'র্চ্ছে ; তা'দের ব্যঙ্গের অট্টহাস্য ভয়াবহ বজ্র-নিনাদের মতই তা'র কানে এসে বাজ্‌লো!..... বিশ্বের সমস্ত লোক চক্ষুর অন্তরালে নিজেকে লুক্কায়িত ক'র্ব্বার জন্য সে অকস্মাৎ পাগলের মত ছুটতে আরম্ভ ক'র্লে! কত লোক তার কঠোর ধাক্কায় রাস্তায় লুটিয়ে প'ড়লো—কত লোকের কত জিনিষ প'ড়ে নষ্ট হ'য়ে গেল কোন দিকেই তা'র বিন্দুমাত্র লক্ষ্য নেই। তা'র ভয় হ'চ্ছিল যেন সবাই তার পিছনে তাড়া ক'রেছে—আবার তা'কে ধ'রবার জন্য যেন কে তা'কে পিছন থেকে চীৎকার ক'রে ডাক্‌ছে—"ধরো, ধরো"

ছুটতে ছুটতে নরলোকের বাইরে এসে যখন সে দাঁড়ালে, তখন সে সম্মুখে দৃষ্টিপাত ক'রে দেখলে—নীল সলিল পূর্ণ কলোনিনী সীন্ নদী তা'র অনন্ত যাত্রার পথে বেয়ে চ'লেছে—আকাশের অগণ্য নক্ষত্র রাজির উজ্জ্বল প্রতিচ্ছবি গুলিকে নিজের বুকের মধ্যে সযত্নে অঙ্কিত ক'রেছে—পতি-বিরহিনী প্রেমিকা সতীর মত।

বাইরের ও ভিতরের সমস্ত জগতকে সে তোলপাড় ক'রে অনুসন্ধান ক'র্লে—কিন্তু নামের তা'র কোন সন্ধানই পাওয়া গেল না।.....একি কঠোর নিয়তির

নির্দ্দয় বিচার! এই কি তবে তা'র পাপের প্রায়শ্চিত্ত!

ক্রমে ক্রমে সে ঘাটের সিঁড়ি বেয়ে জলের কিনারায় এসে উপস্থিত হ'ল। তারপর সে তা'র উত্তপ্ত মস্তকটাকে স্নিগ্ধ শীতল ক'র্ব্বার অভিপ্রায়ে আস্তে আস্তে সেটাকে নদীর জলে ডুবিয়ে দিলে! সারা দিনের পরিশ্রমণের গভীর প্রান্তিতে তা'র সর্ব্বাঙ্গ শিথিল অবসন্ন হ'য়ে প'ড়েছিল!.....তাই সে আর নিজেকে সাম্‌লাতে পার্লে না; পা' পিছ্‌লে নদীর জলে প'ড়ে গেল। কন্‌কনে জলের কবল থেকে উদ্ধার পাবার জন্যে সে অনেক চীৎকার ক'র্লে, এবং অবশেষে কোন রকমে একটা শুক্‌নো আশ্রয়কে অবলম্বন ক'রে তীরে এসে উঠলো!..... তা'র সর্ব্বাঙ্গ তখন থর থর ক'রে কাঁপ্‌ছে।

নির্জ্জীবের মত মুহূর্ত্তকাল সেই নির্জ্জন নদী তীরে প'ড়ে থেকে সে অকস্মাৎ চীৎকার ক'রে লাফিয়ে উঠলো—"পেয়েছি—পেয়েছি—দু'বাজার, দু'বাজার।

সঙ্গে সঙ্গে নদী তীরের অন্ধকারাচ্ছন্ন প্রতিধ্বনি নিনাদিত হ'য়ে উঠলো—"দু'বাজার, দু'বাজার!"

মুহূর্ত্ত মধ্যেই একটা বিরাট জলোচ্ছ্বাস বিপুল গর্জ্জনে নদীতটে এসে উন্মত্ত বিক্রমে আছড়ে প'ড়লো।..... র‍্যাঙ্কেলের শিথিল দুর্ব্বল দেহ সে আক্রমণে অটল থাক্‌তে পার্লে না—নদীর অতল জলে তা'র কম্পিত দেহ অদৃশ্য হ'য়ে গেল।..... তারপর সেই নিস্তব্ধ নিশা প্রকৃতি নির্ব্বাক বিস্ময়ে চেয়ে রইল—তার উদাস দৃষ্টি নিয়ে সমগ্র বিশ্বের পানে——আর মাঝে মাঝে সেই নিবিড় স্তব্ধতা ভঙ্গ ক'রে তটিনীর অবাধ্য উচ্ছ্বাস তটতলে আছ্‌ড়ে প'ড়তে লাগলো ছলাৎ ছল্‌ছল্ ছলাৎ!" .....

জানা দরকার

[শ্রীমতী শোভা রুদ্র]

কাপড় থেকে চায়ের দাগ ওঠাতে হলে প্রথমে এক খণ্ড ভাকরা গ্লিসারিনে ভিজাতে হবে, পরে দাগের জায়গায় ভাল করে ঘষলেই কাপড় হতে চায়ের দাগ উঠে যায়।

• • • •

পিতলের কল বা ধরজার কবজা পরিষ্কার কোরতে হলে মাটীর সঙ্গে টারপিন তেল মিশিয়ে জিনিষ গুলি-গুলো কোরে ঘষতে হবে, পরিষ্কার হয়ে গেলে তাতে কিছু কেরসীন মাখিয়ে রাখলে আর মরচে পড়বার ভয় থাকে না।

গ্রীষ্ম কালে দুধকে টাটকা রাখতে হলে দুধে এক টিপ নুন মিশিয়ে রাখতে হবে।

• • • •

এনামেলের বাটি পরিষ্কার করবার সময়ে গরম জলের সঙ্গে কিছু টারপিন্ তেল মিশিয়ে দিতে হয়, শুকিয়ে যাবার পর তবে পালিশ কোরতে হবে।

• • •

মাংসকে অবিকৃত রাখতে হলে তা'র সঙ্গে কিছু চিনি মিশিয়ে রেখো।

আগামী শ্রীপঞ্চমীর দিন হইতে বাসন্তী পত্রিকার সর্ব্ববিষয়েই উন্নতির বিশেষ চেষ্টা হইতেছে।

ছবি, লেখা কাগজ রঙ্গ ও ব্যঙ্গ প্রভৃতিতে বাসন্তী আরও উন্নত হইবে।

বঙ্গের খ্যাতনামা লেখকগণের লেখা, প্রসিদ্ধ শিল্পীগণের ছবিও অসংখ্য থাকিবে

দাম কিন্তু সেই দুই আনা।

টুক্‌রা খবর

[শ্রীবাণীভূষণ মুখোপাধ্যায়]

ছোট জিনিষের খরচ

মোটামুটি হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে, ইংলণ্ডে ও আমেরিকায় যথাক্রমে গড়ে প্রত্যহ ২০ কোটি ও ৫০ কোটি দেশলাই ব্যবহৃত হয়। সমস্ত জগতের মধ্যে প্রত্যহ গড়ে ৩০ লক্ষ ছুঁচ ব্যবহৃত হয়। বিলাতে এক বৎসরে মোট ৩০০ কোটি পিন্ নির্ম্মান হয়।

চিন্তার ফটো গ্রাফ্।

পাশ্চাত্যের জনকয়েক বিখ্যাত বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক চিন্তার ফটোগ্রাফ্ লইতে সুরু করিয়াছেন। প্রথমে এক খণ্ড কুচ্‌কুচে কাল কাগজে ফিলিম্ মুড়িয়া চিন্তাশীল ব্যক্তির চোখের এক ফুট্ তফাতে হুমড়ে আনে মুড়িয়া ঝুলাইয়া দিতে হয়। তাহা হইলেই বুঝি দশ-মিনিট চিন্তার পর, চিন্তার বিষয় গুলির ছাপ ঐ কাল কাগজে মোড়া ফিলিমের উপর পড়ে। ইহাতে সাধারণ ফটো গ্রাফারের মতন ক্যামেরার প্রয়োজন হয় না। সম্প্রতি কয়েক জন শিক্ষিত ব্যক্তির সম্মুখে পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে। যাহার মনের ফটো গ্রাফ লওয়া হইবে তাহাকে ইতিপূর্ব্বে একটি কাগজে চিন্তার বিষয়টি গোপনে লিখিয়া রাখিতে দেওয়া হইয়াছিল। উপরিলিখিত নিয়ম অনুসারে ফটো লইয়া wash করিয়া দেখা গেল একটী ফুলের ছাপ উঠিয়াছে। তখন তাহার কাগজ খুলিয়া ঐ ফুলের কথাই লেখা ছিল, দেখা গেল। কিন্তু তাহাকে ফিলিম পর্য্যন্ত ও স্পর্শ করিতে দেওয়া হয় নাই। উপর্য্যুপরি কয়েক বার পরীক্ষা করিয়া একই ফল পাওয়া গিয়াছে।

শিশুর প্রতিভা

ইংলণ্ডে একটি প্রতিভাশালী চৌদ্দ বৎসর বয়স্ক বালক আসিয়াছে, সে বারোটী ভাষায় প্রগাঢ় পণ্ডিত, তা ছাড়া একজন ভাল সঙ্গীতবিদ্ ও বৈজ্ঞানিক। কেহ কেহ মুক্ত প্রকাশ করিয়া বলেন যে, বাল্যকালের প্রতিভা কণ স্থায়ী বা বয়স অনুসারে প্রতিভা ম্লান হইয়া যায়। কিন্তু নিম্ন লিখিত ব্যাপার গুলি হইতে এ ভুল ভাঙ্গিয়া যায়।

১। ৮ বৎসর বয়সে মেকলে ঐতিহাসিক হন।

২। " টেনিসন্ কবি হন।

৩। ১০ বৎসর বয়সে বায়রণ কবিতা লেখেন।

৪। " " বেকন দর্শন আলোচনা করেন।

৫। ৬ " মোজার্ট সঙ্গীত রচনা করেন। ও তিনি পাঁচ বৎসর বয়সে একখানা এত শক্ত গান রচনা করেন যে, তাঁহার সঙ্গীতবিদ্ পিতাও হস্ত সহজে বাজাইতে পারেন নাই।

১২ " এলজারও সঙ্গীত রচনা করিতে পারিতেন।

৭। " হাতে চতুর্দ্দশপদী কবিতা লেখেন।

৮। ভার্গেট চিত্রাঙ্কন করেন।

৯। মিলেও "

১০। ৬ ভাইকন্‌টি প্রচারক হন।

১১। ৬ মাসে টানো কথা কহিতে ও সাত বৎসরে বিশুদ্ধ লাটিন কহিতে পারিতেন।

১২। ৩ বৎসর বয়সে ফরাসী বিপ্লব নেতা গিয়াছে প্রচার কার্য্য করেন এবং দশ-বৎসর বয়সে ১ পুস্তক প্রণয়ণ করেন।

১৫ বৎসর বয়সে প্যাস্কেল গণিতের বই লেখেন।

১৪। ১৩ " আর্কিমিডিস গণিতজ্ঞ ও বৈজ্ঞানিক বলিয়া খ্যাতি লাভ করেন।

১৫। ৬ " ওয়েস্‌লি ভাল অর্গ্যান্ বাজাইতেন, ও ৮ বৎসর বয়সে সঙ্গীত পুস্তক রচনা করেন।

১৬। ৯ " ভালিও গান রচনায় যশঃ অর্জ্জন করেন।

১৭। ১৩ " ফেরোল্‌ড্ দক্ষতার সহিত বীজগণিত দেখান।

১৮। ১৭ " হেনরী আথার্টাও

শিশু অভিনেত্রী

সাড়ে তিন বছরের বেবি পেগীদওগোমারী নাম্নি একটি বালিকা সম্প্রতি আমেরিকার একটী থিয়েটারে অভিনয়ে

অভিনয়ের জন্য নির্ব্বাচিত হইয়াছে। এই বালিকা উক্ত কোম্পানীর সহিত এই সর্ত্ত করিয়াছে যে তিন বৎসরের অভিনয়ের জন্য ৫০ লক্ষ টাকা দেওয়া হইবে। সর্ত্ত উত্তীর্ণ হইবার পর (তিনবৎসর পরে) আরও পনর লক্ষ টাকা পাইতে পারে। সিনেমায় ইহার চেয়ে কম বয়সে কেহ অভিনয় করিতে পারে নাই। বিবেচনা করিবার বিষয় এই যে চারি বৎসরে আমেরিকার রাষ্ট্র নায়ক মাত্র নয় লক্ষ টাকা পান।

সবচেয়ে বড় কাগজ

নিউইয়র্কে ১৮৫৯ খৃঃ অঃ 'কেয়াড্রপল কনষ্টেলেশন পমে একখানা ছবিওলা কাগজ প্রকাশিত হয়। ঐ কাগজ খানা লম্বায় ৮।০ ফুট ও প্রস্থে ৬ ফুট ছিল এবং ৪ পৃষ্ঠা কাগজের প্রত্যেক পাতায় বড় কম করে ১৩টি করিয়া কলম থাকিত। সংবাদপত্র একখানা কাগজ ছাপিতে কেবল মাত্র এক রিম কাগজ খরচ হইত।

পুস্তকের প্রচারক

বাইবেলের পর হইতে আজ পর্য্যন্ত যত পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে তন্মধ্যে পিলগ্রিম্‌স প্রগ্রেসের ন্যায় পুস্তক এযাবৎ এত বেশী প্রচার হয় নাই। এই পুস্তক খানা ১০৭টি ভাষায় অনুদিত হইয়াছে।

কৌতুক-কণিকা

[শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য]

ভব তারণ বাবু পারতপক্ষে নৌকায় চড়েন না। কুষ্ঠিতে নাকি তাঁর ফাঁড়া আছে। কিন্তু সেদিন কাছারী থেকে কোন বিশেষ কারণে বাধ্য হয়ে তাকে নৌকায় ফিরতে হয়েছিল।

যাবনদীতে এসে তিনি সভয়ে মাঝিকে জিজ্ঞাসা করিলেন হাঁরে, বলতে পারিস, নৌকায় পারাপার হ'তে আজ অবধি কেউ নৌকডুবি হয়ে তলিয়ে গেছে?

মাঝি চটপট উত্তর দিলে উটা বলবার যো নেই কত্তা। এনদীতে অনেকবার নৌকাডুবি হয়েছে বটে, কিন্তু আজ অবধি একটী লোকও তলিয়ে যায় নি। পরের দিন তার লাশ ভেসে উঠেছেই উঠেছে।

২

হরিপদর পিঠে মস্ত বড় একটা ফোড়া হয়েছে। কিছুতেই সেটা কাটল না দেখে সে ডাক্তারকে ডেকে পাঠালে অস্ত্র করবার জন্যে। হরিপদ কখনও শরীরে অস্ত্রোপচার করায়নি। ডাক্তার এলে সে ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বললে ডাক্তার বাবু, অস্ত্র করলে আমি বাঁচবত?

ডাক্তার বললেন সেজন্যে তোমার কোন চিন্তা নেই, অস্ত্র করলে এখনি আমরা সেটা টের পাব।

ব্রহ্মচারী প্রদত্ত এম, এল, বসু এণ্ড কোং লিঃ কৃত

ভারতের একমাত্র অদ্বিতীয়।

শিশুর কথা

(শ্রীহিরণ্ময় ঘোষাল)

শিশুকে দুধ খাওয়ান আজকাল, বিশেষতঃ বাঙ্গালী মাতার পক্ষে একটা দুষ্কর ব্যাপারের শ্রেণীতে প'ড়েছে। এমন কি দুধ খাওয়াতে গিয়ে অনেক মাতা অনেক শিশুর প্রাণ হানির কারণও হ'য়েছেন। এদেশের মাতারা ভাবেন, শিশুকে বেশী খাওয়াতে পা'রলেই বুঝি সে ছষ্ট পুষ্ট হ'য়ে উঠ্‌বে; কিন্তু এতে যে কতখানি কুফল হয় তা তা'রা একবার ভেবে দেখা প্রয়োজন মনে করেন না।

দুধ খাওয়াতে গিয়ে' কেহবা "ঘুঘুং" ভয় দেখান, কেহবা একটা চড় চাপড় দিয়েও গায়ের ঝাল মিটান, আবার কেহবা শিশুর বুকে হাঁটু দিয়ে জোর ক'রে তা'কে দুধপান ক'রতে বাধ্য করেন; এবং ফলে শিশুদের এক একটি খাঁটি আধুনিক "বীর-বাঙ্গালী" ক'রে তোলেন। অনেকেই আবার কৈশোরে পা-দিবার পূর্ব্বেই "বিষ্ণু নাম" স্মরণ করে। সে যাই হউক "শিশুরা দুধ খেতে চায় না কেন," এর কারণ তাঁরা বলেন দুষ্টামী; কিন্তু সেটা মোটেই ঠিক নয়, কারণ,—শিশুতে আর পশুতে কোনই প্রভেদ নেই, যেমন একটা গরুকে মাংস দিলে সে খায় না, কারণ মাংসটা হচ্ছে তার পক্ষে ক্ষতিকর, সেই রকমই শিশুর পক্ষে যা' ক্ষতিকর তা' সে কিছুতেই গলাধঃকরণ ক'রতে চায় না। শিশু যখন দুধ খেতে চায় না তখন বু'ঝতে হ'বে তা'র ক্ষুধা নেই অথবা সেই আহারটা—তার পক্ষে অনিষ্টকর। ব'লবেন "২৪ ঘণ্টাই কি তা'র ক্ষুধা থাকে না।" কেন থা'কবে না? শুধু সেটা বয়-ভেদে আর অভাব-ভেদে কমবেশী হ'য়ে থাকে। তার ওপর অভ্যাস খেয়ে খেয়ে তার হজম-শক্তি কমে যায়। শিশু যতক্ষণ শান্ত হয়ে দুধ পান করে ততক্ষণ তাকে খাওয়ান উচিত। তার বেশী খাওয়ালেই সে উদ্গীরণ ক'রে দেবে। সুতরাং যাও বা সে খেয়েছিল তা'ও বাহির হ'য়ে যাবে; আর ফলে সে হয়ে দাঁড়াবে একটি "হাত-নাড়ু নাড়ু পা-লকড়া" গোছের।

আচ্ছা এমনও ত, দেখা যায়, শিশুদের বেশী খাওয়ান না হলেও তারা খেতে চায় না, তাদের না খাবার কারণ কি? আর কিছুই না, শুধু দারিদ্র্য। সেই যে জন্ম অবধি সে ঐ খোরাকীর পাহাপানি খে'য়ে আ'সছে, তা'তে তা'র হজম ক'রবার ক্ষমতা একেবারেই নিভে' গেছে। তার ওপর ওই এক ঘেয়ে জিনিষ শিশুদের ক্ষুধা কমিয়ে দেয়।" খাদ্য-পরিবর্ত্তন শিশুর পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়। সে শুধু "প্রটিন"ই পাচ্ছে, "কার্ব্বোহাইড্রেট্‌স্" পাচ্ছে না কিছুই। কার্ব্বো-হাইড্রেট্‌সের মধ্যে চিনিটা শিশুদের ক্ষুধা বাড়ায়। তাই বলে যে তাকে শুধু চিনি গুলে খাওয়াতে হ'বে এমন নয়। সব জিনিষেরই মাত্রা আছে। অল্প পরিমানেই চিনি দুধের সঙ্গে মেশাতে হবে।

খাঁটি জলও শিশুদের পক্ষে যথেষ্ট উপকারী। যাই হোক্ একথায়,—যে শিশু দুধ খেতে না চায় তা'কে জোর করা অনুচিত, তার মুখ বদলান দরকার আর মাঝে মাঝে তা'কে একটু একটু খাঁটি পরিষ্কার জল, খাওয়াতে হ'বে।

সুলভে

অথচ আপনার মনের মতন তৈল-চিত্র (Oilpainting) যদি আপনি করিতে চান, তাহা হইলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।

সর্ব্বপ্রকার চিত্র-বিদ্যায় পারদর্শী

শ্রীনারায়ণচন্দ্র কুশারী

২৯০ নং আপার সারকিউলার রোড, কলিকাতা

ব্যবসায়ীর বিশেষ সুবিধা।

ব্রহ্মদেশের বাজারে কোন জিনিষের বিক্রয় বা বিজ্ঞাপন প্রচারের জন্য প্রতিনিধি বা এজেন্ট নিযুক্ত করিতে হইলে নিম্নের ঠিকানায় পত্র লিখিয়া বন্দোবস্ত করিতে পারা যাইবে।

মি, ঘ-সু। ব্যবসায়ী, কমিশন ও বিজ্ঞাপনের এজেন্ট।

৬ নং তালঘাউন ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন।

শ্রাদ্ধের যোগাড়

পুরোহিত ও যজমান

পু—কাল্টিপরমা রাশের বাৎসরিক শ্রাদ্ধ আজ নিরামিস কর্ত্তে—

যজ্—নিশ্চয়ই—মা। ছুটো 'ডিমই' যাব তাতে তো আর আঁশ নেই কি বলেন—ফাউল্ বোধ হয় চলবেনা?

পু :—বড় কুকুট চল্‌তে পারে—কারণ তারও আঁশ নেই—

যজ্—দেখুননা শ্রাদ্ধের জন্য কি রকম প্রি.পেয়ার্ড হচ্ছি—পৈতায় সাবান দিয়ে কসাইকর্ত্তে দিয়েছি—আর বেশী বেলা হবে নাতো?

পু :—রাম :—আমি ৯টার মধ্যেই সেরে দেব—আমারও ত আবার আফিস কর্ত্তে হবে।

যজ :—বেশ বেশ থ্যাঙ্ক্ ইউ।

প্রেমের নিদর্শন

(শ্রীপ্রভাতকিরণ বসু)

পোলা নেগ্রি যাহাদের বিখ্যাত অভিনেত্রী। যাঁরা Passion নামক সুপরিচিত ফিল্মটী দেখিবার সুযোগ পাইয়াছেন, তাঁরা নিশ্চয়ই স্বীকার করিবেন যে মুখশ্রী এবং অঙ্গভঙ্গির সৌন্দর্য্যের বৈশিষ্ট্যে দর্শকের মনে মাদকতার সৃষ্টি করিবার ক্ষমতা পোলার আছে। এই প্রতিভাময়ীর বাস্তব রূপরাশি একজন যুবাকে উদ্ভ্রান্ত করিয়া কেমন করিয়া তাহাকে যশস্বী হইবার অবসর দিয়াছিল, পাশের ছবি খানা তাহার নিদর্শন।

Tade তাহার নাম, ফ্রান্সের একজন তরুণ চিত্রশিল্পী সে। এক জায়গায় সামান্য পারিশ্রমিক লইয়া সে কাজ করিত, আর ভবিষ্যতে কত বড় হইবে তারই কল্পনায় স্বপ্নসৌধ নির্ম্মাণ করিত।

হঠাৎ প্যারিসে পোলা নেগ্রির আবির্ভাব হইল। দরিদ্র চিত্রকর এক পরিমাণ সকাল বেলায় অভিনেত্রীর বিচিত্র দেহের গঠন দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গেল, তারপর তুলির ফিরিয়া কর্কশ ক্যানভাসের বুকে তার স্বপ্নময়ী সুন্দরীকে ফুটাইয়া তুলিল, রং বেরংএর তুলির রংএ।

সে ছবির সব ঠিক হইয়াছিল, কিন্তু চোখ দুটির সঙ্গে পোলার দুষ্টু-বিদ্রূপ-ভরা নয়ন যুগের সাদৃশ্য তেমন আসে নাই। শিল্পীও তা বুঝিল।

যে হোটেলে বিপুল বিলাসের মধ্যে প্রবাসের সুখ বিশ্রামের কয়টি দিন পোলার কাটিতেছিল, দুই দিন চেষ্টা করিয়াও সেখানে অখ্যাত-নামা শিল্পীর প্রবেশাধিকার ঘটিল না। তৃতীয় দিনে যখন নটী-শিরোমণি স্নানান্তে আপনার মোটরে গিয়া উঠিতেছিল, তখন টেড্ দুঃসাহসে ভর করিয়া তার চোখ দুটি দেখিবার জন্য কাছে গিয়া দাঁড়াইল।

পোলা তাকে সস্নেহে প্রশ্ন করিয়া ছবির কথা জানিল, জানিয়া খুব উৎসাহ দিয়া বলিল—সময় থাকিলে আমি একটা Pose দিতাম, কিন্তু উপস্থিত আমার সময় যে মোটেই নাই!—সেই দিনই সে আমেরিকা চলিয়া গেল।

তারপর বলিয়া বলিয়া খুব অল্প সহকারে শিল্পী সেই ছবিখানা শেষ করিল। বন্ধুলোক দেখিয়া বলিল, আর একটু মিলিলেই ঠিক পোলা নেগ্রি হইত!

এই সব শুনিয়া এক দিন টেড্ প্যারিস হইতে নিউইয়র্ক যাত্রা করিল। সেখান হইতে পোলাকে অনুসরণ করিয়া Los Angeles এ আসিয়া তাহাকে ছবির জন্য বসিতে রাজী করাইল। অল্প দিনের মধ্যে ছবি শেষ হইল, কিন্তু দুর্ভাগ্য আর্টিষ্ট সুবিখ্যাত রূপ-বিলাসিনীর প্রেমে আত্মহারা হইয়া একদিন বিবাহের প্রস্তাব তুলিল। কপর্দ্দক হীন পটুয়াকে ফিল্মষ্টার পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ করিতে সম্মত হইল না; সে ছবি লইয়া চলিয়া গেল।

ক্রমে সেই ছবি একজন ক্রোড়পতির নজরে পড়িল। দশহাজার পাউণ্ড অর্থাৎ দেড়লাখ টাকা দিয়া সেই ভদ্রলোক ঐ শিল্প আদর্শ খানি ক্রয় করিতে চাহিলেন; পাকা-পাকি বন্দোবস্ত হইতেছে, এমন সময়ে খবর আসিল চার্লি চ্যাপলিনের সঙ্গে পোলা নেগ্রির বিবাহের বন্দোবস্ত হইতেছে।

এই সংবাদ পাইয়া টেড্ বলিল—এ ছবি আমি

বিক্রয় করিব না, যাহাকে হৃদয়ে পাইলাম না, তার মুখ-ছবির স্মৃতি বেড়-লাখ কেন, পঞ্চাশ লক্ষ টাকার বিনিময়েও আমি ত্যাগ করিতে পারিব না।

অকৃত্রিম প্রেমিক সেই যুবক সেই নিদর্শন টুকু লইয়া চিরযাত্রিত্ব বরণ করিয়াছে, নহিলে তাহার নাম আজ বিশ্বের চিত্র জগতে স্মরণীয় হইয়া থাকিত।

মাসিক সাহিত্য-সমালোচনা।

ভারতবর্ষ—পৌষ ১৩০০।

ভারতবর্ষের কথায় বলেছে, নূতন কথাটার চিত্রকর চিরকাল পর্ব্বতের তলায় জীবন সমুদ্রের ধারে মানুষ মূর্ত্তির পরিকল্পনা করেছেন কিন্তু কল্পনাটি কাগজে মোটেই ফোটে নি। হিমালয় পাহাড়ের ওপরে বরফের মতো হলুদে, হিমালয় পাহাড়ের মতো বেগুনে, সমুদ্রের অসম্ভব নুন, মায়ের কোলে কোলে বেবার চেহারাও অসম্ভব। ভারতবর্ষের বরাতের দোষ মানুষ-মূর্ত্তির ছবিটাও ফোটে না।

এবারকার ভারতবর্ষের প্রথম ছবি "ঘর," চিত্রকর শ্রীপূর্ণচন্দ্র সিংহ। ছবিখানি কি "আর্ট থিয়েটারের" জন্য আঁকা হয়েছিল? ঘরে মানুষের নিতান্ত অভাব। এবারকার ভারতবর্ষে প্রথম প্রবন্ধ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের "অবতার বাদ"। প্রবন্ধটি যে কি তা প্রত্নতত্ত্ববিৎ ঐতিহাসিক দর্শনতত্ত্ববিদ এমন কি ভূতত্ত্ববিৎ পর্য্যন্ত বুঝতে পারবেন না। লেখকের ভাষার কিছু কিছু, যথা—"ভবিষ্যৎ সভ্যতা পরে শ্রীগৌরাঙ্গ চরিতের ব্যাপী ভক্ত-প্রেমের সহিত মানব হৃদয়কে একীভূত করিবার জন্য আমাদের জাতি বর্জ্জিত ও বুদ্ধের চেয়েও সহিষ্ণু হইতে আদেশ দিয়া গেলেন।" অবতার বাদ যে কি তা লেখক একেবারেই বোঝবার চেষ্টা করেন নি। তবে ঐকে বলে বালোতারাতে হিন্দুধর্ম্ম আর পরস্পর তর্কে কথাটা তথাৎ লেখক যে তা বোঝেননি তা তাঁর লেখাতেই বোঝা যাচ্ছে। তিনি নীচে তা থেকে বলছেন —

"ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায়
সম্ভবামি যুগে যুগে"

লেখক এর অর্থ করেছেন "অবতারের আবির্ভাবে সাধুগণ রক্ষা পাইবেন ও দুষ্কৃতগণ বিনাশ প্রাপ্ত হইবে ইহা ও ধর্ম্ম সংস্থাপনের অন্তর্ভূত কথা।" খানিকটা পরে লেখক আবার বলছেন "পাণ্ডবেরা সখা শ্রীকৃষ্ণকে অবতার বলা যাইতে পারে।" কিন্তু গীতায় পড়িয়া বৈষ্ণবকে যে অনেক কাল আগে কৃষ্ণ মানুষকে ভগবানের বরণ করিয়া লইতে হইয়াছিল সে কথাটা লেখক হয় ত পড়েননি। লেখক আবার বলছেন "পুরাণের দশ অবতারের মধ্যে মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ ইত্যাদির উল্লেখ দেখিতে পাই। ইহারা আমাদের মনে হয় সংগ্রাম করিয়া মানবকে আদিম অবস্থার উন্নতির পথে পরিচালিত করিয়া ছিলেন।" হিন্দুর আর খ্রীষ্টিয়ানের Flood bgend আমাদের মৎস্যাবতার আর খ্রীষ্টিয়ানের ch-lil, বরাহ ও নরসিংহ tolemish সম্বন্ধে লেখক কিছুই লেখেননি। তিনি আবার বলছেন "আমরা অন্যত্রকে দেখিতে পাই শ্রীরামচন্দ্র, বুদ্ধদেব প্রভৃতির মানব অবতার বিশেষ সংখ্যা বলা হইয়াছে। অঙ্ক আনেক হিসাবে ইহারা বিশ্ব খুব ছাড়িয়া চেহারন তাবে মানব মনে স্থান জুড়িয়া আছেন।" রামেন্দ্র অবতার কি উপকার করেছিলেন তা এখনো বোঝা যায়নি তবে ইতিহাসে তিনি অযোধ্যার Paroschial hero. বুদ্ধদেবের সঙ্গে অঙ্কের সম্বন্ধ-সম্বন্ধে তাঁর এক মজে আদন পাওয়া অসম্ভব। অধ্যাপকটী ইতিহাস পুরাণ প্রত্নতত্ত্ব ছাড়িয়ে যে কিছুটি চড়িয়ে গেছ তা দাঁড়ালে সাধারণ কথাগুলি তাঁর নেই এবং অজীর্ণ রোগটা আছে।

মৃত মহাত্মা কবিবীকুমার ঠাকুরের স্বর্গারোহণ উপলক্ষে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ যে কবিতাটি লিখেছেন তা পেরেলে বাহিরের হলেও মর্ম্ম তার কিন্তু ঘরের ঘরের জন্য হয়ে গেছে —

"তুমি আজি চলে গেছ যেথা।
যত যাও "জোড়াসাঁকো" যদি—
তোমা পেয়ে জননী কৃতার্থী
কুলোজ্জ্বল পবিত্র অবনী
*
তোমার অভাবে অনাথা
মাতা রাখি স্নেহ কোলে করে
যার সেবা লভি করে হাতে
শান্তি তৃপ্তি পাবে মহিমায়।"

তার পরেই ভারতীর অনেক চন্দ্রের ক্রমশঃ প্রকাশ্য উপন্যাস "বিলাসিনী।" শ্রীযুক্তেন্দ্র লাল মাতার্য্য "বিনয় রক্ষা" নাম দিয়ে যে প্রবন্ধটি লিখেছেন তাতে তাঁর অভ্যাস মত অনেক ধারে কথা বলেছেন বটে কিন্তু বর্ত্তমান সময়ের উপযোগী প্রয়োজনীয় কথা অনেক আছে। মেয়ে বাল যে ভুলে দিতে হবে আর যৌবন বিবাহ যে নিতান্ত আবশ্যক সে কথা তিনি মুক্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন। আজ একটা কথা আমাদের দেশে এখনো কেউ বলছে না, সেটা মুখোপায় প্রতিপালন, তার বিরুদ্ধে কেন কথা কেউ বললেই এক শ্রেণীর লেখক হিন্দুর পবিত্র যৌবনবিবাহে আঘাত হল বলে দেশময় তুমুলের মত তার ঘরে আর্ত্তনাদ করে থাকেন। সেটা হয়ত্বকলের কু সংস্কারের ফল, বিংশতি শতাব্দীতে এসব অসভ্যতা ভারিনের পত্নিকা দেখে অবাক হয় সাহস মাত্র।

শ্রীসৌরেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের "বারবিনী" গল্পটি ভালই, লেখক বোধ হয় আর্ট থিয়েটারের নূতন নাটক "মুক্তির ডাক" এ অনুপ্রাণিত কারণ সাহেব যে সংস্কারের ভেরে বেরাজ যৌবন উপভোগ করে ফেরে দিলে একটা লেখক অমন করে তাঁর আলোকে না এঁকে তো পলে দেখাতে পারেন।

শ্রীবিজয়রাম চট্টোপাধ্যায় "বালক ও জামরাজ" মুখপাঠ্য ভ্রমণ কাহিনী।

বাংলা সাহিত্যের প্রত্নতত্ত্বের বাগানে এক নূতন ধূমকেতুর আবির্ভাব হয়েছে। তাঁর নাম শ্রীকালীপ্রসন্ন নাথ অন্বেষণোপাধ্যায়, ধূমকেতু এবারে সোনালিয়ার পাহাড়ে "সপ্তরথীর মন্দির" নাম দিয়ে গভীর পাহাড়ের ওপরে উঠে No 1 হেকেছেন। তার কাজে ওয়েস্টেবেই ও পণ্ডিত আর সরে অর্থ বাটীকে একজন বিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিৎ। লেখক অনেক গবেষণা করে নূতন কথা আবিষ্কার করেছেন। সোনালিয়ার একটা মন্দির আছে তার নাম ভৈরবীর মন্দির বা ভেরিজ মন্দির। লেখকের মতে

তা হৈমলাঞ্ছন। হৈমের সহিত অমরা শব্দ যোগ করা যে অত্যন্ত অসীল এবং মধ্যম শ্রেণী কবিদের কাছে মুক্তকেশীর প্রতিকিটসন হতে পারে, লেখক বোধ হয় তা একবার ভাবেননি। লেখক এখনও বিদ্রূপ সহ্য ও সকলের আরত্ত হোননি, যথা :—

"দুইটি লিপি প্রাচীর গাত্রে দেখিতে পাওয়া যায়;—ইহা ১১৫০ শকাব্দের (A. D. 1093)" এ অপেক্ষা বাড়ীর প্রস্তরত্বের জ্ঞান কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য্য গৌরাঙ্গবাবু ও দিতে পারেননি। সমস্ত বাহ্য মন্দিরে একটিও জোড়া নেই অথচ লেখক দুটি জোড়া দেখতে পেয়েছেন। ভক্তের অন্ধত্বকে তোড়া করা বিলে অনেক ভক্তে জোড়া আছে।

ভারতবর্ষের আর একজন বড় প্রতিষ্ঠা লেখক দূর থেকেই মোতাদির প্রথম সিরিয়ালে, আর এই মুক্তকেশীটি মোতাদিরে থেকে বাবা আদালতের মত চোখে কাপড় বেঁধে সমস্ত গায়ের মশিরা দেখতে গিয়েছিলেন। ইহলেখক যে সমস্ত সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করে তা মুক্তকেশী বাঙালী ব্রাহ্মণ সন্তান হয়েও বুঝতে পারেন না। বেশী লম্বায় ছাড়িয়ে এই অমলের ইতিহাসী অক্ষরে সংস্কৃত 'অবসান' শব্দ দেখে বাংলার লেখবার সময় 'অবসর্ণ' লিখে ফেলেন, সুতরাং প্রবন্ধটির কথা হয়েছে এবং ভিতরে যা ও 'শ' টা বাদ পড়ে যাবে। মুক্তকেশী ১৮২০ খৃষ্টাব্দে ও রায়েন্দ্র লাল মিত্রের ১৮৬২ সালের প্রবন্ধের উল্লেখ করেছেন। এই লিপিলিপি বাবি যে ১৮৮০ সালে Indian Antighory তে ছাপা হয়েছে এবং রায়েন্দ্র লালের চরম ও গাঁজা বিবরণ মূলের মধ্যে পরমানন্দের মূর্ত্তি মিশিয়ে দিয়ে যে বিষ্ণু-মূর্ত্তির একটা আছে তা তিনি জানেন না দিলালিপিতে লেখা আছে —

প্রথম অর্দ্ধ তেন কিন্তি তিলক কুলেন ভবনং
হরেন্দ্রর্জ্জেন বিদম সমুদ্র কান্তিরে যদং।
ন্যায়ালো বৈদ্য কর্ত্তৃকিন বিদ্য পত্তনিবাসং।
সমাজ্ঞ লিখেন মুরারেন মুরারে হরসিদ্ধুরং।"

হরেন্দ্রকর মানে যে হরের মত বড়ী না সে কথা মুক্তকেশী এখনও বোঝেননি। মাঝে মাঝে আবার ভাষাতত্ত্বিক ভাব আছে যথা সেটা বিলাত rapid কথা—"বন্দিনের বন্দিন দিকে যে নির্জ্জন আলো আবার কথা আসে"। হরি বোলা এই নির্জ্জন কথার আলো আবার আলার কাজ কিছুই নয় তা কেবল লেখকের ভাষার উপর অধিকার প্রকাশ করা। আর এক জায়গায় দেখি "বিহারীর গীতা চলন পাথ-সকাশনে দর্শক অনেকারী নৃত্য। মুক্তকেশী। বিহারীর যে পা নেই। বিহারীর পা যে পাখীর মতন তাতে সেরকম নৃত্যে চিত্ত বিনোদন করা যায় না। ঠাকুরটি মাসিক পত্রে লেখা ছেড়ে কিছু দিন বেণীসংহার অনুবাদ করে সাহিত্য সেবার উপকার হবে।

'ছুঁ মেরে' গল্পটি এই মূর্খটি অধিকারীর মূর্খটি দ্বারা। এক যদি গল্প বলতে হয় তা হলে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কথামালা কি অপরাধ করলে। ছুঁ মেরে লোকটা ছিটেই কোটের মির্জা হাজার ফের হলেও মকদ্দমার খাতিরে অমিয় দিয়ে দিলে, এ কথা উকীল মোক্তার চিরি চিরকালই করে আসছে এবং করবে কিন্তু এর জন্যে গল্পটা লেখার : এবং তার ওপর যখন ভারতবর্ষে ছাপা হচ্ছে তখন আধুনিক আর্টটা কোথায়?

অধ্যাপক শ্রী সত্যব্রত সিংহ অকাল মৃত্যু ও বাল বিবাহ প্রবন্ধে একটু উলটে প্রচলন হুকিয়েছেন। তাঁর মতে ভারতবর্ষের ইতিহাসে কতকগুলো যুগ আছে, যথা বৈদিক যুগ, মহাকাব্যের প্রথম যুগ, বর্ণি প্রবন্ধের যুগ বৌদ্ধ যুগ আর শৌরাণিক যুগ। ঠিক যুগ ভাগ করে আমাদের দেশের লোকে যে কেতাব লিখতে আরম্ভ করেছি এবং এই জাতীয় যুগ বিভিন্নটা শরচন্দ্র বসুর পরে যে ভারতবর্ষের ইতিহাস থেকে মুক্ত হোক সে আমরা লেখক হবেন না। নিম্নে আমার শ্রীযুক্ত অনুরূপা দেবীর বিরুদ্ধে যে বলেছেন তা অবাক্ত সত্য এক মুদ্রণ-যাবের ভেতে হয়ে শ্রীমতী দক্ষিণা বাবুর তার সমর্থন করেছেন। আমাদের নিশ্চিন্তা মহিলারা অনেক সময় ভুলে যান যে ঈশ্বর পরব শতাব্দীতে যে শাস্ত্র রচিত হয়েছিল, বিশ শতাব্দীতে তা চলতে পারে না।

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্য 'সতী' কবিতাটি রবীন্দ্র নাথের ভাষায় ছন্দে ও ভাবে গাঁথা কিন্তু ঘোটের ওপর বেহাৎ ফল নয়। প্রবন্ধী প্রভাবতী দেবী একখানি নূতন সিরিয়াল আরম্ভ করেছেন। 'ভারতবর্ষে' মুক্তাক্ষর সম্পাদক বোধ হয় এক কালে মাস্টারী করেছেন এবং যখন চশমা পরে মুক্তাক্ষর সাজেন। তা না হলে তিন তিনটে ভাল প্রবন্ধ থাকিতে প্রথমের জন্যে বর্ষাহীন অক্ষরে ছেপে মাটি করেন না। তার মধ্যে শ্রীযুক্ত সতীশ চন্দ্র রায়ের "মহাকবি কালিদাস কি বাঙালী" নয় ছেড়ে ফেল। প্রতিবাদী শ্রীযুক্ত নাথ ভট্টাচার্য্য কবিভূষণ কাব্যতীর্থ ক্রমশঃ ক্ষেপে উঠছেন। মাঝে কেন না ক্ষেপে এবং দু হাজার বছর পূর্ব্বে সে ক্ষেপের কি অবস্থা ছিল তা না ভেবে তিনি কালিদাসকে নিয়ে পাগলের মত টানাটানি আরম্ভ করেছেন। শ্রী অমরেন্দ্র ঘোষের নিবিড় প্রণয় ছবির প্রবন্ধ, শ্রীসতীন্দ্র মোহন মুখোপাধ্যায়ের 'বেদনার সুর' কবিতাটি পড়লে যা সহৃদয়ের হৃদয়ে কেঁদে উঠতে হয়। শ্রীউপেন্দ্র নাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'অমলা' ক্রমশঃ প্রকাশ্য উপন্যাস। শ্রীসরল নাথ মুখোপাধ্যায়ের "কলিকাতারমুখ-সমস্যা" প্রবন্ধটি ছোট হলেও মন্দ নয়।

এই সংখ্যায় ভারতবর্ষে উপভোগ্য প্রবন্ধ শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার মৈত্রের একটি সমালোচনা। এই বয়সে সাহিত্য সেবী যে ভাবে শ্রীঅরবিন্দবাবুর লীলা পোষাকী পোলাও নামক কথা বাণির সমালোচনা করেছেন, তা বাংলা দেশে সমালোচনার আদর্শ হওয়া উচিত। অনেক দিন বাংলায় এমন প্রবন্ধ পড়িনি। শ্রীযোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বিদ্যুতের বিজ্ঞান' প্রবন্ধটি সুন্দর ভাব, ভাষা ও পরিবেশন তিনটিই সুন্দর, এত সুন্দর যে অসুন্দর অংশও দেখতে ইচ্ছা করে না। শ্রীযোগেশ চন্দ্র ঘোষের 'আলোক ও প্রাণ' অতীব বিজ্ঞানের প্রবন্ধ, বেশী লিখলে লেখকের প্রতিভা ছেপে উঠবে। শ্রীসরোজেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ধান' প্রবন্ধটি কবিতা। কবি-বরের শ্রীমতীন্দ্রমোহন ঘোষ কবিভূষণ 'অভিনী কুমার' নাম দিয়ে ঘোষ লাইনে বৃত্ত মহাশয়ের তর্পণ শেষ করেছেন। শ্রীসরোজ বেশ অঙ্গুলিপি প্রবন্ধে দ্বিতীয় পর্য্যায় আরম্ভ করেছেন, তের পাতার মধ্যে ৮ পাতা কেবল ছবি, শুধু তাই নয়, আদিম আর্টে বিদ্যাবাগীশ সমুখ নির্ণয় করবার চেষ্টা করে লেখক কোনরূপ চিন্তা শক্তির পরিচয় দেননি। "ভারতের বিদেশী বাণিজ্য নাম দিয়ে 'শ্রীযুক্ত সওদাগর' কাগজের হালচাল বুঝা নই করেছেন। ভারতবর্ষে এই সংখ্যায় শ্রীরবীন্দ্র লাল রায় 'ধর্ম' নাম দিয়ে যে ক্রমশঃ প্রকাশ্য উপন্যাসটি আরম্ভ করেছেন, সেটা ভারতবর্ষের প্রবীন সম্পাদকের দ্বারা একেবারেই উচিত হয়নি। এই উপন্যাসে প্রথম কিস্তিতেই লেখক ভারতের মুসলমান সম্রাটদের না ছেড়ে অতি কুৎসিত ভাবে আক্রমণ করেছেন। 'ভারতবর্ষে' সম্পাদকের উচিত এই উপন্যাস ছাপা বন্ধ করে দিয়ে মুসলমানদের নিকট apology করা। ভিন্নির মুসলমান সম্রাটদের সম্বন্ধে যাবতীয় অসত্য

পারে জলবায় যুবক একা, জলসী যুবতী ভগিনীর সঙ্গে তথা হইতে। সম্রাট মুসলমানে যখন এত বড় অনাচার ঢিলিবে এমনো হয় নি।। মোগাইয়ের মোহন্ত সম্প্রদায়ের এখন আত্মা তথা কথা কয় বটে কিন্তু সে কালে স্ত্রীতে অন্ত পুরুষ বা স্ত্রীর অন্তকাতে যুবক যুবতী ভাই বলা হলেও দেখা শোনা। এইটাই গেল বড় কথা। লেখক সম্রাট মুসলমান যুগের কারণা কানুন না দেখে ইংরিজী গ্রন্থের ভাব সাগরে মোসলমানী সমাজে ডুবাতে গিয়ে অন্যায় করে ফেলেছেন। ছোট খাট কথার মধ্যে অবরোধের গালিচা, সাড়িকার মাঝ জবেলা, সোনালী জরিদারের পরিবর্তে খুবেহারী মসলিন এবং মোটরের আবির্ভাবের পূর্বে একদিনে পাল্-বহরাবাদ দিল্লী হইতে কিলা রায় পিথোরা দিল্লী যাত্রা। লেখক বোধ হয় কোন ইংরাজ লেখকের প্রবন্ধ পড়েছেন কিন্তু বোঝেননি, সেই জন্যেই সদা চঞ্চল সদাশয় যুবক ভারতের ঐতিহাসিক সমস্যার সমাধানে ব্যবহার করেছেন, যথা—"বিয়াহ তথা খুব খুবাখুবি যত অশান্ত ভারত, কে হিন্দু মুসলমান মিলাইয়া শিবজীর মোহিলা রাজপুত যাত্রা যোগলকে এক মঙ্গল সূত্রে বাঁধিয়া এ সত ছিন্ন ভারতকে এক শান্তিময় রাজ্যাসনে বাঁধিবে", যাঁরা ইংরাজী বই পড়ে ইহার মর্ম বুঝে পারেন না তাঁরা মোসলমানী আমলের সমস্যা নিয়তে গিয়ে আমাদের আন্তর্জাতিক ঘরটা বাড়িয়ে তুলবেন কেন।

শ্রীবিবকর্ণার 'ইঙ্গিত' ক্রমশঃ অপাঠ্য হয়ে উঠেছে। ভারতবর্ষের বাকীটা সাধার পক্ষ, সুতরাং সমালোচনা চলে না। অগ্রহায়ণের তুলনায় পৌষে 'ভারতবর্ষ' একেবারেই ভাল হয়নি। কিন্তু সম্পাদক ও ব্যবস্থাপকের মতে তাদের কাগজ খুব জোর চলছে কারণ বিক্রী হয়। কি থাকে বা না থাকে তা দেখবার প্রয়োজন তাঁরা একেবারেই বোধ করেন না।

ব্যতিক্রম

(উপন্যাস)

[শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্-এ]

দ্বিতীয়-পরিচ্ছেদ

অতবড় দুর্দান্ত সদানন্দ চক্রবর্ত্তী এতবড় অপমানটা কেমন করিয়া হজম করিল, হরসুন্দর কিছুতেই তাহা বুঝিতে পারিলেন না। সদানন্দ নৃত্যকালীকে খুন করিতে আসিয়া কেন যে মাথাটি হেঁট করিয়া চলিয়া গেল তাহাও তাঁহার মস্তিষ্কে প্রবেশ করিল না। অথচ তাহারই সম্মুখে কুলগৌরবাভিমানী সদানন্দ মাথা উঁচু করিয়া গৌরমোহনের গৃহে প্রবেশ করিয়াছিল কিন্তু বাহির হইবার সময়ে মাথাটি হেঁট করিয়া চলিয়া গেল। যাইবার সময়ে নৃত্যকালী তাহাকে ডাকিয়া বলিয়া দিলেন, "মনে করিস নেড়ী আমার বাড়ী গিয়ে মরে গেছে, জলে ডুবেছে না হয় আগুনে পুড়েছে। ইচ্ছে হয় মেয়ে জামাইয়ের সন্ধান করিস, না হয় করিস নে, কিন্তু মনে রাখিস যে, ঠান্-দিদি যা করেছে তা তোদের সকলকার মঙ্গলের জন্যেই করেছে। অনেক কথাই আমাকে আজ বলেছিস সদাই, এত কথা নেত্য-বাবুনী কারো কাছেই সহ্য করে নি, কিন্তু আজ তোর মেয়ে জামাইয়ের মুখ চেয়ে সহ্য করে গেল। যে ভাবে আমাদের দিন কেটেছে নেড়ীর দিন সে ভাবে কাটবে না তোর ইচ্ছে থাকলেও আমি তাকে সে ভাবে দিন কাটাতে দেব না। সেই জন্যই তোকে না বলে গ্রামশুদ্ধ লোকের চোখে ধুলো দিয়ে এই পিকলী বাড়ী তোর মেয়ের বিয়ে দিয়ে গেলুম।"

সদানন্দ চক্রবর্ত্তী চলিয়া গেল, হরসুন্দর অন্যমনস্ক হইয়া গৌরমোহনবাবুর ঘরোয়ানের খাটিয়ার উপরে বসিয়া পড়িলেন। তখন ঠান দিদি বলিয়া উঠিলেন, "হুঁ, এইবার তোর পালা।" অত্যন্ত ভীত হইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে হরসুন্দর জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন ঠান্-দিদি, আমার কি অপরাধ?" ঠান-দিদি বলিলেন, "অপরাধ তোর অনেক। এতদিন কিছু বলিনি, এইবার বলতে হল। ছেলেটাকে কি মেরে ফেলতে চাস্ হরু?" "কেন ঠান্-দিদি? আমার অপরাধ কি? দেখ আমার একটী ছেলে, আমি খুব বড় লোক নই বটে, কিন্তু আমার সংসারে মোটা ভাত মোটা কাপড়ের অভাব নেই। অনেক করে বুঝে পেতে বড় ঘরের সুন্দরী মেয়ে এনে বৌ করেছিলুম। আমার দোষ কি?" "হুঁ দোষ তোর চোখের। আচ্ছা, বল দেখি মাকাল রাঙ্গা না সিন্দুরে আম রাঙ্গা?" "এ আবার কি হেঁয়ালি আরম্ভ করে ঠান্ দি?" "বল্ না, মাকাল বেশী রাঙ্গা ত? কিন্তু লোকে মাকাল ছেড়ে রাঙ্গা আমের সন্ধানে বেড়ায় কেন?" "আমি কিছু এখনও বুঝতে পারলাম না ঠান-দি।" "আর কিছু বুঝবেও না হরু।

ওরে বাঁদর, সব জিনিষের ভিতর বাহির একরকম নয়। বাহিরের রংটা কর্ণা হলেই মনটা দেবতুল্য হয় না।" "সে কথা কি করে জান্‌ব ঠান্‌-দিদি?" "এইটে মিথ্যে কথা হক। নাকাশীপাড়ার জমিদারীর ছ'আনা অংশের লোভে যদি পাগল না হতিস তা হলে বুঝতে পারতিস্। আমাদের দেশের পুরোণো জমিদার ঘরের মেয়েরা এখনও শ্বশুর ঘর করে না। তাদের ঘরে যারা ছেলের বিয়ে দেয় তারা ঘর-জামাই হতে দেয়, নামটা বদ্‌লে দেছে বটে; কিন্তু ব্যবহারটা ঠিকই আছে।" "অত কথা বুঝতে পারিনি ঠান্‌-দি।" "পেরেছিলি, এখনও মিথ্যে কথা বলছিস্। হক এখনও তোর মনে পাপ আছে, এত শাস্তিতেও তোর চৈতন্য হয়নি। পয়সার লোভ তোর এখনও মেটেনি,একমাত্র সন্তান রাক্ষুসীর হাতে তুলে দিয়েছিলি সে তোর বাপের পুণ্যের ফলে বেঁচে এসেছে কিন্তু তাতে এখনও তোর চোখ ফোটেনি। তোর সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে। একখানা গাড়ী ডেকে নিয়ে আয়।"

গৌরমোহন বাবুর ধরোয়ান রামধীন তেওয়ারী ছই দিনেই বৃদ্ধাকালী ঠাকুরাণীকে বিলক্ষণ চিনিয়া লইয়াছিল, সে বৃদ্ধাকালীর মুখের কথা বাহির হইবামাত্র বলিয়া উঠিল, "হম্ যাতা মাইজী।" সে একমুহূর্ত্তের মধ্যে একখানা বড় ঘোড়াওয়ালা সেকেণ্ডক্লাস গাড়ী ডাকিয়া আনিল। গাড়ী খানা দেখিয়া হরসুন্দর একটু মুখ বাঁকাইলেন, কারণ তিনি স্বভাব কৃপণ এবং থার্ডক্লাস ভিন্ন অন্য গাড়ীতে চড়িতেন না। তাঁহার মুখবিকৃতি বৃদ্ধা ঠানদিদির নজর এড়াইল না, ঠান-দিদি বলিলেন, "গাড়ীর ভাড়া আমি দেব, হরু তোকে কিছুই দিতে হবে না। নেড়ীর বিয়ের যা খরচ হয়েছে আমিই দিয়েছি আর বিন্নুর বিয়ের জন্য যা খরচ হবে তাও আমিই দেব।" থাকিতে না পারিয়া হরসুন্দর বলিয়া ফেলিলেন, "তুমি কেন দিতে যাবে ঠানদি! অপব্যয়টা একেবারেই দেখতে পারি না তাই মুখ বাঁকিয়ে ছিলুম।" "আমিই দেব। কেন দেব জানিস্ হরু, এই ক'দিন আমি পূর্ণ বয়সের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করছি। কত পাপ করে সধবা হয়েও বয়সটা বিধবার মত কাটিয়ে দিলুম, বিধবা হয়ে তারপর যে কি হল তা কিছুই বুঝতে পারলুম না। চল্ গাড়ীতে উঠি।"

গাড়ীতে উঠিয়া ঠানদিদি হরসুন্দরের হাত ধরিয়া বলিয়া উঠিলেন, "হরু, আমার একটী কথা রাখতে হবে।" হরসুন্দর বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি কথা ঠানদিদি?" "আগে বল্ রাখবি, তারপর বল্‌ব" "রাখিবার হলেই রাখব।" "প্রথমটা অন্যায় বোধ হবে, হরু, কিন্তু ভেবে দেখলে বুঝতে পারবি যে কথাটা কিছুই অন্যায় নয়।" "কি কথা বলই না" "ইন্দুর সঙ্গে বিন্নুর বিয়ে দিতে হবে।" "সর্ব্বনাশ! বল কি ঠান্‌দি!" "গৌরমোহন বাবুর মেয়ে যদি বিধবা না হত তা হলেও বরং কথা ছিল। বিধবার সঙ্গে কেমন করে বিয়ে দেব?" "বিয়ে কিন্তু দিতেই হবে, হরু। আমি গৌরমোহনের জন্য বল্‌ছি না, আমি তোর জন্যই বলছি, তোর ছেলের জন্য বল্‌ছি তোর সংসারের ভবিষ্যৎ সুখ শান্তির জন্য বল্‌ছি। যদি ভাল চাস্, তা হলে এখনো মত দে। গৌরমোহন হয় ত বিধবা মেয়ের বিয়ে দিতে চাইবে না; তোর হরিহরপুরে যেমন সমাজ আছে, কলকাতারও তেমনি পিরলীদের একটা সমাজ আছে। সেই সমাজের ভয়ে গৌরমোহন হয় ত বিধবা মেয়ের বিয়ে দিতে রাজী হবে না। কিন্তু হরু, শুনে রাখ, আমি বারবার বল্‌ছি, ওই পিরলীর বিধবা মেয়ের সঙ্গে বিয়ে না দিলে তোর ছেলে কিছুতেই সংসারী হবে না। "হুঃ তুমিও যেমন ঠানদি, কলকাতার পিরলীরা আবার হিন্দু, তাদের আবার সমাজ। তুমি পাড়াগাঁয়ে থাক, কলকাতা পিরলীদের কি খবর রাখ? মেয়েটোত এর মধ্যেই বেঁকে দাঁড়িয়েছে, দুদিন বাদে খারাপ হয়ে যাবে।" "অমন কথা বলতে নেই হরু, আমি দুদিনেই দেখছি, কলকাতার পিরলীদের ঠাকুর দেবতা সমাজ ধর্ম্ম সবগুই আছে। ওদের সম্বন্ধে আমাদের পাড়াগাঁয়ে একটা ভুল ধারনা আছে।" "যোহাই ঠান্‌-দি, দুটো দিন সবুর কর। বিন্নু আমার যেমন কালেজে পড়া ছেলে সেই রকম কালেজে পড়া ছুতো মোজা পরা এমন সুন্দরী বৌ এনে হাজির করবে যে বেটী পিরলীর মেয়ের নাম করবে না।" "তুই পারবিনে হরু।" "ঠিক পারব। তুমি দুটো দিন সবুর কর ঠান্‌-দি, তারপর যা ইচ্ছা হয় কর।"

এই সময় গাড়ী থামিল, বাড়ীর দুয়ার খোলা হইলে হরসুন্দর দেখিতে পাইলেন যে বাড়ীর দুয়ারে দাঁড়াইয়া নির্মল পাগলের মত বিনয়ের হাত ধরিয়া টানিতেছে আর বলিতেছে, "তুই আয়——শীগগির চলে আয়। আমি বল্‌ছি, সে নেই সে আবার চলে গেছে।' গাড়ী হইতে নামিয়া ঠান্ দিদি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হয়েছে বিনু?" বিনয় পিতাকে দেখিয়া মুখ নত করিয়া বলিল, "নির্মল বলছে যে ইন্দু যে বাড়ীতে চাকরী করত সে বাড়ী থেকে কোথায় চলে গেছে। সে বাড়ীর গৃহিণী তাকে অসচ্চরিত্র বলে চাকরী থেকে ছাড়িয়ে দিয়েছেন। সে কোথায় চলে গেছে বাড়ীর লোক তা জানে না।" পুত্রের কথা শুনিয়া হরসুন্দর বলিয়া উঠিলেন, "নির্মল যখন জান্‌তে এসেছে, তখন তোমার এখনি যাওয়া উচিত। তুমি গায়ের জামাটা নিয়ে এসে ইন্দুকে খুঁজতে যাও।" বৃদ্ধা-ঠাকুরাণী বিনয়ের হাত টানিয়া ধরিয়া বলিলেন, 'যাস্ অখন, একবার এক লহমার জন্ত উপরে আয়।" বৃদ্ধা-কালী তিনজন পুরুষকে টানিতে টানিতে উপরে লইয়া গেলেন।

ত্রিপঞ্চাশত্তম পরিচ্ছেদ

তুলসীর মালা তিনবার মাথায় ঠেকাইয়া এবং তাহার পরে গলায় ঝুলাইয়া দিয়া ভবসুন্দরী পরেশকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ডাক্তার কি বলে গেল, বাবা?" পরেশ আর একবার প্রণাম করিয়া বলিল, "আজ্ঞে ডাক্তার সাহেব বলে গেলেন তিনি একজন মেম-ডাক্তার দিয়ে পাঠাবেন।" "একথাটা যখন মেয়েটাকে বেঁধে গেল তখন বল্‌লেই পার্‌ত।" "একি আমাদের চুনি ডাক্তার সিরী-মা? এ সাহেব ডাক্তার, চুনি-ডাক্তারের ছুটো টাকার জায়গায় একশোটা টাকা নিলে। আমাদের মহকুমার ডাক্তার বাবুও বল্‌ছেন যে ষোল টাকার কম ছাড়বেন না।" "সে টাকার কথা পরে হবে, পরেশ, এখন মেয়েটা সারলে হয়। চল দেখি।"

ভবসুন্দরী উঠিলেন, পরেশ দাঁড়াইয়া দাঁড়াইল। ভবসুন্দরী কিন্তু পূজার বাড়ী হইতে অন্দরে না গিয়া দাঁড়াইয়া গেলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে মেম-ডাক্তার কত নেবে? কোথা থেকে আস্‌বে?" "কল্‌কাতা থেকে আস্‌বে। সদরের ডাক্তার সাহেব যখন একটুখানি আস্‌তে একশো টাকা নিলে তখন কল্‌কাতার মেম-ডাক্তার কোন্ না হাজার টাকা নেবে।" ভবসুন্দরী এইবার চলিতে আরম্ভ করিলেন, পরেশচন্দ্রও পিছন পিছন চলিল। অন্দরের দুয়ারে একগাছা নুড়ি হাতে করিয়া সারদা দাঁড়াইয়াছিল। সে মাতাকে দেখিয়াই হাসিয়া ফেলিল। ভবসুন্দরী বিপদের সময়ে সারদাকে হাসিতে দেখিয়া অত্যন্ত রাগিয়া গেলেন এবং বলিয়া উঠিলেন, "তোর কি সময় অসময় নেই বাছা? একটা লোক মচ্ছে তার জন্ত কি তোর একটু দুঃখ নেই?" সারদা খিল খিল করিয়া হাসিয়া বলিল, "মচ্ছে কে মা? আমি? সে দিব্যি আরাম করে খেয়ে দেয়ে শুয়ে আছে।" "তুই নুড়ি নিয়ে যাচ্ছিস্ কার জন্ত?" "কেন আমির জন্তে গো।" যে কথাটা নুড়ি ছিল তা দেখে বল্‌লে পিত্তি পেটের একটা কোনও অসুখ না, তুমি বামুন দিদিকে দিয়ে শীগগির আর খান কতক লুচি ভাজিয়ে নিয়ে এস।" "কিছু কখন ছেড়ে গেল?" "তুমি আর সাহেব ডাক্তার যেই ঘর থেকে বেরুলে তখনি আমি সেই ওষুধ টা দিলুম।" "ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা না করে তুই মেয়েটাকে কি ওষুধ খাওয়ালি-না পোড়ার মুখি?" সারদা আবার হাসিয়া বলিল "তোমার কিছু ভয় নেই গো, আমি আস্তেকে বিষ খাওয়াই নি। ওষুধটা কিছুই নয় কেবল একটা মন্তর। আমি জানি যে আহির কাণে এ মন্তর দেলেই তার ভূত টুত সব ছেড়ে যাবে। তুমি দেখ্‌বে এস সে খাটের বিনায়ায় গরম লুচির পথ চেয়ে শুয়ে আছে।"

ভবসুন্দরী প্রসন্ন হইয়া পরেশকে বলিলেন, "পরেশ, মেয়ে শুন্‌ছি ভাল আছে। তুমি এখন যাওয়া যাওয়া করগে। আমি তাকে খেয়ে তবে মেম-ডাক্তার আনাবার ব্যবস্থা করব।" পরেশ উত্তর না দিয়া অতি কষ্টে প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল। ভবসুন্দরী তখন সারদার সহিত উপরে চলিলেন। পথে যাইতে যাইতে সারদা বলিল, "মা তুমি ডাক্তার বদ্যি ডেকে কেঁদে কেটে খুন হচ্ছ কেন? আমার অসুখ বিসুখ কিছুই হয় নি। ও শুনেছে যে মনে বড় আঘাত লাগলে মেয়ে মানুষের হিষ্টিরিয়া হয়। তাই বাংলা বই পড়ে হিষ্টিরিয়া

কত্তে শিখেছে।" "কি যে বলিস্, শুনলে অঙ্গ জ্বলে যায়। মেয়েটা আজ সাত দিন দাঁতে কড়ি দিয়ে পড়ে আছে। সে নাকি বাংলা বই পড়ে কল্লা কত্তে শিখেছে।" "বিশ্বাস না হয় বাবুন দিদিকে ডেকে জিজ্ঞাসা কর এক দিন কি রকম বি যন্ত্রণা করচ হচ্ছে।" "তুই জান্‌লি কি করে? আর যদি জেনেছিস্ ত আমায় বলিস্ নি কেন?" "তোমায় বলব কি? আন্নির নামে কোন কথা বলতে গেলে তুমি আমাকে তেড়ে আস।" "তুই কবে জান্‌তে পারি?" "কাল সন্ধ্যে বেলায়। তুমি যখন ঠাকুরবাড়ী যাও তখন বাবুনদিদি পাইখানার দিকের বাগানে গিয়ে আন্নিকে খাইয়ে আসে। কাল ধরে ফেল্‌তেই সকল কথা প্রকাশ হয়ে গেল। তাই আজ সাহেব ডাক্তার চলে যেতেই আন্নি আমাকে ধরলে।" "তবে যে বল্‌লি কি মন্তর দিয়েছিস্?" "তাও সত্যি, মা। মন্তর দিয়েছি বলেই আন্নি আবার উঠে বসেছে।" "মন্তরটা কি বাছা?" "মন্তর আর কি মা আমার গুষ্টির পিণ্ডি, সেই পূর্ণ।"

বলিতে বলিতে মাতা-পুত্রী অন্নদার শয়ন কক্ষের দুয়ারে আসিয়া দাঁড়াইলেন। ভবসুন্দরী দেখিলেন যে অন্নদা খাটের বিনানার উপর আছে, তাহার কাছে এক খানা টুলের উপরে একখানা থালা, তাহাতে লুচি নাই কিন্তু অনেকটা বাঁধা কপির তরকারি আছে। অন্নদা লুচির অভাবে শুধু মুখে তরকারি খাইতে ছিল, সে মাতাকে দেখিয়াই বলিয়া উঠিল, "আমি এখন ভাল আছি মা।" ভবসুন্দরী দেখিলেন যে সারদার মন্ত্র ধরিয়াছে, পূর্ণ আসিবে শুনিয়াই অন্নদার মুখ চোখের আকার পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। কন্যার অবস্থা দেখিয়া তিনি মনে মনে সন্তুষ্ট হইলেন বটে কিন্তু সারদার মন্ত্রের কথা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন।

থালার সমস্ত লুচি গুলি শেষ হইলে অন্নদা হাত ধুইয়া শুইয়া পড়িল, কেন সারদা মাতার হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে অন্য ঘরে লইয়া গেল। পাচিকা মাতা পুত্রীর অন্ন লইয়া অপেক্ষা করিতেছিল, ভবসুন্দরী কিন্তু পত্রের কাছে না বলিয়া অবসন্ন দেহে শুয়ে বসিয়া পড়িয়া বলিয়া উঠিলেন, "কি কুক্ষণেই কালসাপ পুষেছিলুম মা।" সারদা মাতার হাত ধরিয়া তাঁহাকে উঠাইয়া পত্রের নিকট বসাইল এবং বলিল, "সে কথা পরে হবে মা, তুমি এখন চারটি মুখে দাও।" আহারান্তে সারদা মাতাকে বলিল, "মা রোজ রোজ তোমাকে এই কথাই বলি কিন্তু কোন দিন তুমি বিশ্বাস কর না। বরঞ্চ গালাগালি দাও। আজ বিশ্বাস হল ত?" ভবসুন্দরী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, 'বুঝতে পারিনি বাছা। এখন কি সে পূর্ণটাকে আনতে হবে নাকি?" "সে তোমার ইচ্ছে মা। ব্যাপার কিন্তু গুরুতর তুমি সকল কথা জানো না।" "তুই কি বলিস বাছা?" "বলব আর কি বল? সময় থাকতে চের বলেছি। আমার দিব্যে তুমিই আন্নির মাথা খেয়েছ। এখন তার যে রকম অবস্থা তাতে যে রকম করে হোক জামাইকে আন্‌তে হবে তা নইলে হাঁড়িয়ে যাত যাবে।" সারদার কথা শুনিয়া অত্যন্ত বিস্মিতা হইয়া ভবসুন্দরী বলিয়া উঠিলেন "বলিস্ কি? এতদূর গড়িয়েছে?" "তুমি ত এতদিন চোখ মেলে দেখ নি?" আমি দেখছি সব, শুন্‌ছি সব, তোমায় বল্‌ছিও সব, কিন্তু তুমি বিশ্বাস কর কই? এখন তোমার ইচ্ছা হয় পূর্ণকে আনাও আর না হয় তো জাত বাঁচাও।" "কালামুখো মেয়ে কি সে পথ রেখেছে মা? জামাই কি আসবে! পূর্ণর নাম আর করিস্ নে।" "যেমন করে হোক বিনুকে আন্‌তে হবে। যদি না হয় তা হলে শ্রীরুক পুরের বাস উঠিয়ে দিয়ে কাশী যেতে হবে। যেমন করে হোক জামাইকে একবার আন্‌বার চেষ্টা কর্ত্তে হবে।" "তবে একবার পরেশকে ডাকাই?" "শুধু পরেশের কাজ নয় মা। তুমি শ্রীরুকপুরে থাক, আন্নিকে নজর-বন্দী রাখ, আমি একজন দাসী নিয়ে পরেশের সঙ্গে বিনুর কাছে যাই।" "যা হয় কর বাছা।" ভবসুন্দরী উঠিয়া মাথায় ও মুখে জল দিতে আরম্ভ করিলেন। সারদা বাহিরে গিয়া পরেশকে ডাকিয়া আনিবার হুকুম দিল। যথা সময় পরেশ আসিল, আহারটা পরিমাণে অত্যন্ত গুরু হওয়ায় বৃদ্ধ পরেশচন্দ্র তখন ও হাঁপাইতেছিল। ভবসুন্দরী যখন তাহাকে বলিলেন যে তখনই তাহাকে সারদার সহিত হরিহরপুর যাইতে হইবে তখন তাহার মুখ শুখাইয়া গেল কারণ হিসাব পত্র ভবসুন্দরী অপেক্ষা সারদা অনেক বেশী বুঝিত। সেই রাত্রেই সারদা দাসদাসী লইয়া পরেশের সহিত বিনয়ের সন্ধানে বাহির হইয়া পড়িল।

(ক্রমশঃ)

ইরাণের রাণী

[শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার]

একখানি ভাল নাটক, তাহার সুসজ্জিত অভিনয় দেখিলে আনন্দ হয়। অভিনয় নাটকের উচ্চতা ও অভিনয়ের সামঞ্জস্য রক্ষিত না হইলে নাটকের উৎকর্ষতা উপলব্ধি করা যায় না। প্রথম শ্রেণীর নাটকের অতি অপকৃষ্ট অভিনয় হইলে নাটকের উপরও দর্শকের শ্রদ্ধা থাকে না, আবার উচ্চশ্রেণীর অভিনেতৃবর্গের দ্বারা অভিনীত নাটক ভাল না হইলেও দর্শক তৃপ্তি পায় না। এই দুয়ের একত্র সংমিশ্রণে যে নাটক অভিনীত হয় তাহাই দর্শনযোগ্য এবং প্রকৃত অভিনয়। ইরাণের রাণী নাটক ও তাহার অভিনয় এই কারণেই দর্শনযোগ্য হইয়াছে। ইরাণের রাণী অপরেশচন্দ্রের পরিণত বয়সের রচনা। নাটক খানিতে পাশ্চাত্যের গন্ধ থাকিলেও ইহাকে প্রবীণ গ্রন্থকার যে ভাবে গ্রথিত করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার কৃতিত্বের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। আবার সেই নাটক খানিকে সুসজ্জিত করিয়া সুন্দর অভিনয় করিতেছেন আর্ট থিয়েটার লিমিটেডের পরিচালনে ঐ থিয়েটার। নাটকের Dramatic Situation গুলি আর্ট থিয়েটার এমন ভাবে সংস্থাপিত করিয়া দর্শকের সামনে ধরিয়াছেন যে প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত দর্শক চিত্ত আকৃষ্ট ও বিমোহিত করিয়া রাখে। নাটকে ঘটনার ঘাত প্রতিঘাত এমন ভাবে নাটকে সংযোজিত হইতে বহুকাল বহু রঙ্গমঞ্চের দেখা যায় নাই।

নাটকখানিতে চরিত্র খুব বেশী নাই। যে কয়টি আছে তাহার মধ্যে রাণী, দারা, রাজা, ইহুক, নাসের ও গুলরুখ উল্লেখ যোগ্য। রাণী এক বিচিত্র সৃষ্টি। অগ্নীশ্বর তাহাকে রূপলাবণ্যময়ী করিয়া পৃথিবীতে পাঠাইয়াছিলেন; পিতা মাতা তাহাকে রাজান্তঃপুরে, রাজ-রাণী করিয়া দিয়াছিলেন, অভাগিনী রাণীর জীবনে এই দুইই ছিল বেশ। কিন্তু আর কিছুই সে পায় নাই। রমণী জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রাপ্য পতি-প্রেম রাণী পায় নাই। তাহার স্বামী ছিল এক অত্যাচারী ক্রূর, হৃদয়হীন পুরুষ, নারী ছিল তার প্রয়োজনের বস্তু, বিলাসের পদার্থ, নারীহৃদয়ের বিন্দু মূল্য তাহার কাছে ছিল না। এই পুরুষাধমের অন্তঃপুরে রাণীর বাস ছিল,রাণীর হৃদয় নিরুদ্ধ প্রেম গৃহে প্রতিদানের অভাবে প্রজাদের হিত-চিন্তায়, অত্যাচারী রাজার অত্যাচার দমনে রাজ্যের প্রজাদের দিকে প্রধাবিত ছিল। হঠাৎ একদিন পিতৃ-হত্যার প্রতিশোধ মন্ত্রে দীক্ষালাভ করিয়া দারা জোবেয়ার রাজগৃহে প্রবেশ করিল। দারার পিতাকে ঐ অত্যাচারী রাজাই হত্যা করিয়া তাহার রাজ্য অপহরণ করিয়াছিল। তাহারাই প্রতিশোধ লইতে আসিয়া দারা দেখিল, রাজা শুধু তাহারই উপর করে নাই, তাহার রাণীর প্রতিও সে যথেষ্ট অত্যাচার করিয়াছে। অভাগিনীর অঞ্চলে দারার যৌবন মুগ্ধ হৃদয় গলিয়া গেল। দারা যদি পারিত, পিতৃ-হত্যার কথা ভুলিয়া তাহার মন ভুলিয়া, রাণীর দুঃখ দূর করিতে প্রাণ দিত। রাণী দারার মুখেই একথা শুনিল। যে কথা শুনিবার জন্য সৃষ্টির যাবতেও নারী সচকিত হইয়া থাকিত, যে না-পাওয়া বস্তুর দুঃখে জীবন মরণ তাহার এক হইয়া ছিল, যখন সেই কথা শুনিল, সেই প্রিয় বস্তুর সন্ধান পাইল মরুভূমিতে বারিবিন্দুর মত নারী তাহা গ্রাস করিতে চাহিল। যে না পাওয়ার তাহার নারীত্ব সুপ্ত অচেতন ছিল, তাহারই স্পর্শে নারী বন্যার তাড়নায় জল স্রোতের মত উত্তাল হইয়া উঠিল। নারী সেই স্পর্শের মধুময় অনুভূতিতে তাহার ব্যর্থ জীবন, বিফল অতীত স্মরণে শিহরিয়া উঠিল। না পাওয়া প্রেম এতদিনে রাণীকে অধিকার করিয়া বসিল। নারী স্বামী হত্যা করিল কিন্তু জোবেয়ার তাহাকে গ্রহণ করিল না। নরহন্ত্রী বলিয়া তাহাকে ঘৃণা করিয়া দিল। প্রেমোন্মত্তা নারী তখন প্রেমাস্পদকে হত্যাদণ্ড দিল; জোবেয়ার পিতৃ-হত্যার প্রতিশোধ লইতে চাহিলেও সে ছিল মানুষ। হত্যার বিনিময়ে মানব নর হৃদয়-মনে সে ছিল প্রকৃত মানব। মৃত্যুদণ্ড সে মাথা পাতিয়া লইল মৃত্যু যখন শিয়রে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, মৃত্যুর সেই তটপ্রান্তে যখন দারা দণ্ডায়মান, রাণীর চৈতন্য ফিরিল, রাণী প্রেমাস্পদকে মুক্তি দিতে কারাগারে আসিয়া

দাঁড়াইল। জোবেদার নিদ্রিত, রাণী মৃত্যু যাত্রীর শিয়রে দাঁড়াইয়া তাহার জীবনের, তাহার প্রেমের, তাহার সহনশক্তির, তাহার উচ্চতার পরিচয় লইতে গিয়া, পারিল না, বিষ পান করিল। যারা জোবেদার তবুও মুক্তি চাহিলনা, তাহারই প্রেমে হতাশ হইয়া, তাহাকে ভালবাসিয়া না-পাইয়া রাণীর যে দশা ঘটিল, যারাও তাহাই তাহার জীবনের আবশ্যকীয় বলিয়া মনে করিল। কিন্তু যারার বাল্যকালের সখী প্রণয়িনী গুলরুখ তাহার মৃত্যু-পনের দ্বার রুদ্ধ করিয়া দাঁড়াইল। দুঃস্বপ্নের পর স্নিগ্ধোজ্জ্বল প্রভাত্ দেখিয়া লোকে যেমন স্বপ্নটাকে মুছিতে চাহে, যারার জীবনের দুঃস্বপ্নও তেমনি ভাবে সে মুছিতে চাহিল, সে কার্য্যে সহায়তা করিল, রাণীর মৃত্যুর পূর্ব্বে স্বহস্তে লিখিত পতি হত্যার স্বীকারোক্তি।

এই মূল ঘটনাটি যে ভাবে গড়িয়া উঠিয়া এত বড় নাটকখানির সৃষ্টি করিয়াছে তাহা বাস্তবিক বিস্ময় কর। অভিনয়ে সেই গঠন এত পরিস্ফুট হইয়া উঠে যে প্রতি-মুহূর্ত্তেই একটা শিহরণ দর্শকের মনে জাগে। অভিনয়ের ইহা পূর্ণ বিকাশ বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না। রাণীর হৃদয়ের সংঘাত তাহার হতাশ প্রেম, প্রেম-স্পর্শে পুলক আবার সেই প্রেমের ব্যর্থতায় নারী রাক্ষসী মূর্ত্তি—রুক্ষচামুণ্ডী যারা দেখাইতেছে তাহা বহু রঙ্গমঞ্চে এ কালে আর কোন অভিনেত্রীর দ্বারা সাধিত হইতে দেখি নাই। বিচার দৃশ্যে প্রেমাস্পদকে বলি দিতে রাণীর যে ছন্দ চলিতেছিল, ধর্ম্মচক্ষুর অন্তরালে স্বহস্তে পতিহত্যা করিয়া যারার নিকট আত্ম নিবেদনে যে উন্মত্ততা ফুটিয়া উঠিতে দেখিয়াছি তাহাকে কেবল মাত্র চমৎকার বলিলেও যেন কতকটা বাকী থাকিয়া যায়। যে হত্যা যে যারাকে পাইবার জন্যই, যারা ও রাণীর মধ্যে 'পর্ব্বত-ব্যবধান' রাজাকে অপসৃত করা যে তাহারই জন্য তাহা রাণীর মুখে 'এ ত তোমারই জন্য যারা'—এই এক কথাতে এমন অভিব্যক্তি মনে হয়, বর্ত্তমান কালে আর দেখি নাই। যারার অভিনয়ও সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর। প্রতিহিংসাদগ্ধ যুবকের আত্ম-বিস্মরণ, গুরু মন্ত্রে বশ্যতা, বন্ধুর প্রতি স্নেহ, বাল্য প্রণয়ীর প্রতি ভালবাসা, অত্যাচারিতা রাণীর দুঃখে সমবেদনা—একসূত্রে উত্থান পতনের অবিরাম বিরোধ অহীন্দ্র বাবু সুন্দর দেখাইয়াছেন। নায়ের, ইহক, রাজা, "রাজী রাখো"—কাহার কথা বলিব? মিষ্টি গাছের ফল মিষ্টই হয়। সুধাশিনী গুলরুখের অংশে দুর খানি গান করেন, সুর দিয়াছেন পিয়ারা সাহেব, তবু সুধাশিনীর তাহারও পরিচয় দিবার প্রয়োজন নাই। একটি দৃশ্যে এক নর্ত্তকীর নৃত্য আছে, নীহার বালা সেই অংশটি অভিনয় করেন। নৃত্যটিতে নূতনত্ব না থাকিলেও নর্ত্তকীর গুণে তাহা মনোজ্ঞই হয়। বিচার দৃশ্যে কাজীর প্রতি সম্রমে প্রদ্ধায় হৃদয় ভরিয়া যায়।

আর একটা নূতন জিনিষ লক্ষ্য করিলাম এই অভিনয়ে। খুব গভীর দৃশ্য গুলিতে মৃদু স্বরে বাদ্য ধ্বনি বড়ই চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল। আঙুর ক্ষেত, রাজোদ্যানে সত্যিকারের ফোটা ফুলের গেট, বিচার দৃশ্যের জনতা, সামরিক, রাজার শয়ন কক্ষের সম্মুখ—বাস্তবিক বাঙ্গালার রঙ্গমঞ্চে নূতন জীবনের আলোকে সমুজ্জ্বল। অভিনয় আর্ট-থিয়েটারের উপযুক্ত হইয়াছে। একটা ত্রুটী আমরা লক্ষ্য করিলাম। বিচার দৃশ্যে এক সেনাপতি ছাড়া যে কয়েকটি রাজ অমাত্য বা অনুচর উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদের সজীবতার প্রমাণ দেওয়া তাঁহাদের উচিৎ ছিল, যারা রাজদরবার দৃশ্যে পর্দ্দার আড়ালে থাকিয়াও প্রহরীরা দিয়াছিল, দিয়া রাজ দরবারের মান রাখিয়াছিল।

বুধবারে "ইরাণের রাণী" এক অদ্ভুত ব্যাপার করিতেছে। বুধবারে এত লোক সমাগম ইতিপূর্ব্বে আমরা দেখি নাই। অতঃপর অন্যান্য থিয়েটার গুলি পতিত বুধ-বারের সংস্কার করিলে আর্ট থিয়েটারের মত সব দিকেই সাফল্য আনয়ন করিতেই পারিবেন আশা হয়। আর্ট পথ-প্রদর্শক বলিয়া কেহ যদি বৃথা অভিমান না করিয়া সংস্কারে মন দেন—বাঙ্গলার রঙ্গালয় গুলির শ্রী-ফিরে!

Printed by Bijoy Krishna Dass at the Lakshmibilas Press,
14, Jagannath Dutta Lane, Calcutta

বিরহ

"[illegible]"

সচিত্র সাপ্তাহিক পত্রিকা

বাসন্তী

২য় বর্ষ] ২৬শে মাঘ শনিবার ১৩৩০, ইং ৯ই ফেব্রুয়ারী [২৯শ সংখ্যা

"হে ভগবান তুমি কত সুন্দর"

(একটি বিলাতী অভিনেত্রীর অভিনয় ভঙ্গী হইতে)

গানের খাতা

[শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী গঙ্গোপাধ্যায়]

(১)

ক্লাব থেকে ফিরে আস্‌তেই মা বল্লেন, "খোকা, বিয়ে ক'র্‌বি ?"

আমার বয়স ২৪ বৎসর হ'লেও মা আমাকে খোকাই ব'ল্‌তেন। কিন্তু তার দেখাদেখি ক্লাবের ছেলে গুলোও যখন আমাকে খোকা ব'ল্‌তে সুরু কোল্লে, তখন আর আমি কিছুতেই বরদাস্ত কোর্ত্তে পার্‌লুম না ; মাকে আচ্ছা ক'রে দু'কথা শুনিয়ে দিলুম। সেই থেকে ও বিষয় নিয়ে মা-র সাথে আমার অনেক বাদানুবাদ হ'য়ে গেছে, কিন্তু আমি যে আর খোকাটী নই তা মাকে কিছুতেই বোঝাতে পারিনি ; কিছু বল্‌তে গেলেই মা হেসে বলেন, "ছেলে কি আর মা-র কাছে বড় হ'য়ে পাগ্‌লা ? সে চিরদিন খোকাই থেকে যায় যে !" এমন সুন্দর মীমাংসার উপর আর তর্ক করা চলে না, কাজেই চুপ কোর্ত্তুম।

মার কথার উত্তরে আমি হেসে বোল্লুম, "হঠাৎ বিয়ের কথা কেন মা ? শুধু খোকাটিকে নিয়ে আর চ'ল্‌ছেনা নাকি তোমার ?"

মা হাস্‌লেন। একটু স্নেহের হাসি হেসে বোল্লেন "সত্যি খোকা, আর চ'ল্‌ছে না ; এই বার বিয়ে ক'রে একটী সুন্দরী বৌ আন্।"

মা-র ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমি কোন দিন মত দিই-নি, কিন্তু তবু প্রত্যেক বিষয়েই তিনি আমার মত চাইতেন। কিন্তু আজ মার কথার উত্তরে একেবারেই 'হাঁ' বল্‌তে পার্‌লুম না ; একটু ভেবে বোল্লুম, "দরকার কি মা একটা পরের মেয়ের সাথে কতকগুলো অশান্তি ডেকে এনে ? তার চেয়ে আমরা মায়ে পোয়ে দু'জনে বেশ আছিতো ?

আমার 'না' কথাটা মা কখন শোনেন-নি, তাই বুঝি মার মুখখানা একটু ভার হ'য়ে উঠ্‌লো। ধীরে ধীরে মা বোল্লেন, না বাবা, না, ও কথা বলিস্-নি। সে অশান্তি আন্‌তে যাবে কেন ? বৌ-মা আমার শান্তিই আন্‌বে দেখিস্। আর আমি তো চির কাল থাক্‌বো না খোকা। যে ক-দিন থাকি, বৌমাকে সাজিয়ে গুছিয়ে দুদিন সাধ আহ্লাদ মিটিয়ে নি।"

আমি চুপটী করে ভাব্‌তে লাগ্‌লুম। চির কাল যে তীষ্মদেব হ'য়ে থাক্‌বো, এমন প্রতিজ্ঞা আমি কখন ক'রিনি ; কিন্তু তবু একটু ভেবে দেখ্‌তে হয়, কারণ এর উপর আমার ভবিষ্যৎ ইষ্ট অনিষ্ট নির্ভর কোচ্ছে তো বটে !

খানিকক্ষণ পরে মা আবার বোল্লেন, "তা হ'লে কি বলিস্ খোকা ? বলিস্ তো আমি নিজেই দেখে শুনে একটি মনের মত ক'নে ঠিক্ করে ফেলি।"

আমি মুখ নামিয়ে বোল্লুম, "বেশ তো, কর। তোমার মতে কি আমি কখন অমত কোরেছি মা ?"

মা বৃদ্ধ হেসে স্নেহ ভরে বোল্লেন, "তা জানি বাবা, যে তুই কখন অমত ক'র্‌বিনে।"

সংসারে আমরা দুটী প্রাণী, মা আর আমি। মা ও বাবার স্থান মা আমার একাই অধিকার ক'রেছিলেন ; কাজেই মা-কে আমি বেশ জান্‌তুম। মনে মনে কোন অজ্ঞাতা কিশোরীকে বধূ পদে বরণ না ক'রেই যে মা আমার মত চাইতে এসেছিলেন এমন ভুল ধারণা আমার ছিল না। একটু হেসে বোল্লুম "কিন্তু তা-ই বল মা। তুমি যে ক'নে ঠিক্ না ক'রেই বিয়ের কথা পাড়্‌ছো, এ আমার একটু ও বিশ্বেস হয় না।"

মা হেসে বোল্লেন, "সত্যি রে ! আমার বৌ ঠিক্ হ'য়ে গেছে।"

হেসে বোল্লুম, "বটে ! কোথায় ঠিক্ হ'ল শুনি ?"

"এই পাশের গ্রামে——কুসুমপুরে। মেয়েটী যেন

সাক্ষাৎ লক্ষ্মী। কিন্তু আহা! বড় দুঃখী সে! ছেলে বেলায় বাপ মারা গেছে; মা কোন রকমে মানুষ কোরছিল, সেও আজ দু-বছর হ'ল বাপের কাছে চ'লে গেছে। এখন মেয়েটী দূর সম্পর্কীয় এক আত্মীয়ের বাড়ী থাকে, ঝির মত খাটে, দিন রাত লাথি ঝাঁটা সয়, আর চারটী খায়! তাই কি পেট ভরে? পেট ভরে দুবেলা খেতেও দেয় না তাকে।" ব'লতে ব'লতে মা'র দুচোখের কোনে দুফোঁটা জল ছল্ ছল্ করে উঠ্‌লো।

আঁচল দিয়ে চোখ মুছ্‌তে মুছ্‌তে মা বোল্লেন, "মেয়েটীকে একবার দেখ্‌বি বাবা?"

আমি বোল্লুম, "না, থাক্ মা, তুমি দেখলেই হবে।"

"তা হোক্ বাবা, তুইও একটী বার দেখ্; আমি ডেকে আন্‌ছি এখানে।"

সবিস্ময়ে আমি বোল্লুম, "সে কি? তুমি তাকে বাড়ী নিয়ে এসেছো নাকি?"

মা ছল্ ছল্ চোখে বোল্লেন, "হ্যাঁ বাবা, আমি তার দুঃখু সইতে পার্‌লুম না যে!"

একটু পরেই মা তাকে হাত ধ'রে নিয়ে এলেন। ধীরে ধীরে সঙ্কোচে আমার পায়ের কাছে প্রণাম ক'রে উঠ্‌তেই আমি তার পানে চেয়ে দেখলুম, সত্যি শান্ত, স্নিগ্ধ লালিমা ভরা মুখখানি তার যেন ঠিক্ সেই লক্ষ্মী প্রতিমার ছবিটীরই মত। কিন্তু সেই ডাগর ডাগর চোখ দুটীর কোলে যেন একটা বিষাদ মাখা করুণ চাহনি উঁকি ঝুঁকি দিচ্ছিল।..... ..

• • •

যথা সময়ে এক দিন সন্ধ্যার উৎফুল্ল জ্যোৎস্নার ভিতর মা আমাদের দুজনকে বরণ ক'রে ঘরে তুল্‌লেন। সে দিন মা-র কি আনন্দ! মা-র আনন্দ দেখে আমারও প্রাণটা একটা 'নূতন পাওয়ার' ভরে উঠ্‌লো।... ..

(৩২)

শান্তি মেয়েটী সত্যি বড় শান্ত স্বভাবা। নীরবে ধীর ভাবে সে ঘর কন্নার কাজ গুলো একে একে ক'রে যেতো, কাউকে কিছু ব'লতে হ'ত না। তা ছাড়া মা-র বা আমার একটা সামান্য কথারও অবাধ্য হ'তে দেখিনি তাকে। কিছু বোল্লে তখনি সে তা পালন কোত্তে, কিছু চাইলে তখনি সে তা হাতের কাছে এগিয়ে দিত কিন্তু তার এক বিষম দোষ ছিল, সেটা আত্ম-বঞ্চনা। সে আমাদের সংসারে থাকতো যেন একটী সুন্দর কলের পুতুল, যার নিজের সত্তা বা স্বাতন্ত্র্য ব'লে কিছুই নেই, শুধু নীরবে পরের কাজ ক'রে যেবার জন্যই জন্মেছে। কোন দিন, নিজে থেকে চেয়ে একটা কিছু ভাল খেতে, ভাল প'রতে বা কখন ব'লতে দেখিনি তাকে। স্বতঃ প্রবৃত্ত হ'য়ে কোন কিছু দিতে গেলেও সে তা নিতান্ত নির্লিপ্তের মতই গ্রহণ কোরে', কোন কিছু ব'লতে গেলে একটা নিতান্ত 'হুঁ—না' গোছের উত্তর দিত মাত্র; যেন জীবনে তার কোন আশা, কোন সাধ আহ্লাদ, কিছুই নেই; জীবনটা যেন তার কাছে সৃষ্টি হ'য়েছে শুধু বাঁচবার জন্যই।.....'

প্রথম যে দিন তার জন্য সহর থেকে চুপি চুপি এক খানা মাদ্রাজী শাড়ী নিয়ে আসি, তখন সে আমার শোবার ঘরে ব'সে ব'সে পান সাজ্‌ছিল। শাড়ীটা কাপড়ের নীচে লুকিয়ে নিয়ে তার কাছে গিয়ে ডাক্‌লুম, "শান্তি!"

শান্তি মুখ তুলে আমার পানে চাইলো।

আমি মৃদু হেসে বোল্লুম, "তোমার জন্যে একটা জিনিস এনেছি।"

শান্তি কথা কইলো না।

আমি হাস্‌তে হাস্‌তে শাড়ীটা বের্ ক'রে বোল্লুম, "এই নাও, একখানা ভাল কাপড়।"

শাড়ীটার পানে একবার চেয়ে শান্তি বোল্লে, "রেখে দাও।"

আমার মনে একটু অভিমান হ'ল। খানিকক্ষণ চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থেকে আমি কাপড়টা তার বাক্সের উপর রেখে দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এলুম; ভাবলুম, রাত্তিরে সে নিশ্চয়ই সেটা প'রে হাসি মুখে আমার কাছে আস্‌বে। কিন্তু কই? শাড়ীটা বাক্সের উপর তেম্‌নি প'ড়ে র'ইলো, সে একবার ছুঁলেও না!.....

কিন্তু তাকে আমি ভাল বাস্‌তুম না বোল্লে মিথ্যে বলা হবে। তাকে বাস্‌তুম ——সত্যি ভাল বাস্‌তুম, তা ছাড়া তার চোখের সেই করুণ দৃষ্টিটা আমার ভালবাসা দিন দিন আরো বাড়িয়ে দিচ্ছিল।

ভালবাস্‌তো বটে কিন্তু তার ব্যবহারে মাঝে মাঝে আমার মনে একটা সন্দেহ জেগে উঠ্‌তো। তবে কি সে আমার সাথে বিয়ে হ'য়ে সুখী হয় নি? তবে কি আর কাউকে ভালবাস্‌তো সে?

এক দিন মনের কথাটা তার কাছে খুলে বলে ফেল্‌লুম, "শান্তি! তুমি কি আমাকে বিয়ে ক'রে সুখী হওনি? তুমি কি বিয়ের আগে আর কাউকে ভালবাস্‌তে?"

শান্তি তাড়াতাড়ি আমার গায়ে গড় ক'রে বোল্লে, "ছিঃ! ও কথা ব'লোনা——ওতে পাপ হয়; তুমি আমার দেবতা।"

"তবে তুমি দিন রাত মুখ ভার করে থাকো কেন?"

শান্তি করুণ নয়নে আমার পানে চাইলো, কিন্তু উত্তর দিলে না। আমার সন্দেহটাও একেবারে দূর হ'লো না।.....

তারপর এক দিন সেই অভিশপ্ত রাত্রিটা ঘনিয়ে এলো, যে দিন আমার মানসিক কষ্টের প্রথম সূচনা, যার অন্ধকারময় বুকের ভিতর আমার এই জীবন ব্যাপী দুঃখের অঙ্কুরটা চুপটী ক'রে লুকিয়ে ছিল। কিন্তু তখন তা একটুও বুঝ্‌তে পারিনি,——বুঝ্‌তে পাচ্ছি এখন; শুধু বুঝ্‌তে পাচ্ছি নয়, পদে পদে, মর্ম্মে মর্ম্মে, রক্তের কণায় কণায় অনুভব কোর্‌ছি।

আমি রোজ একই সময়ে ঘুম থেকে উঠ্‌তুম। আমার ঘুম ভাঙবার আগেই শান্তি রোজ উঠে যেতো, তাকে এক দিনও বিছানায় দেখতে পেতুম না। কিন্তু সে দিন কি জানি কেন আমার একটু রাত থাক্‌তেই ঘুম ভেঙে গেছ্‌লো। চোখ চেয়ে দেখলুম, পাশে শান্তি নেই। প্রথমে ভাব্‌লুম, ভোর হ'য়ে গেছে বুঝি। কিন্তু দেয়ালে খাঁটা ঘড়িটা যখন চং চং ক'রে চারবার বেজে উঠ্‌লো, তখন একটু আশ্চর্য্য হ'লুম। ভাল করে চেয়ে দেখলুম, ঘরে আলো জ্বল্‌ছে, আর মেঝের উপর উপুর হ'য়ে বসে বসে শান্তি চোখের জলে ভাস্‌ছে। তার সাম্‌নে খোলা র'য়েছে চাইকা ফুল দিয়ে সাজান এক খানা খাতা!

আমার মনের ভিতরে সেই সন্দেহ আবার মাথা নাড়া দিয়ে উঠ্‌লো, আস্তে আস্তে উঠে বসে ডাকলুম, "শান্তি।"

ব্যাধ ভীতা হরিণীর মত সে চম্‌কে উঠ্‌লো। তাড়াতাড়ি খাতা খানা লুকিয়ে ফেলে আমার পানে চাইলো, যেন কত বড় একটা অপরাধ আজ তার ধরা প'ড়ে গেছে!

আমি বোল্লুম, "কিসের খাতা ও?"

শান্তি কথা কইল না।

আমি আবার বোল্লুম, "দাওতো খাতা খানা, একবার দেখি।"

শান্তি আর একবার করুণ নয়নে আমার পানে চাইলো, কিন্তু খাতাটী দিলে না! এই প্রথম তার অবাধ্যতা। আমার মনের সন্দেহটা আরও দৃঢ় ক'রে বেড়ে উঠ্‌লো, নিশ্চয়ই——নিশ্চয়ই ওতে তার পূর্ব্ব প্রণয়ীর ভালবাসার কোন নিদর্শন আছে, তাই ওর অত আদর! আর তাই আমার হাতে দিতে এত আপত্তি!

আমি রেগে বোল্লুম, "দেবে না?"

শান্তি তবু কথা কইলেনা বা নড়লেনা। শুধু নিতান্ত অসহায়া অবলার মত খাতাটীকে আরও জোরে বুকের ভিতর চেপে ধ'র্‌লো।

আমি রুক্ষস্বরে বোল্লুম, "তোমাকে বিয়ে করাই আমার ভুল হয়েছে শান্তি! তখন বুঝ্‌তে পারিনি, যে মেয়ে বছরে মেয়ে কখন আপনার হয় না।"

গভীর মর্ম্মস্পর্শী দৃষ্টিতে সে আমার পানে চাইলো, তার দুচোখের কোন থেকে দুটো জলের স্রোত গাল বেয়ে নীচে নেমে এলো, তার বুক থেকে খাতা খানা ধপ্‌ ক'রে খ'সে পড়্‌লো। কিন্তু নির্ব্বোধ আমি তার সে কাতর চাহনির অর্থ বুঝ্‌লুম না, রাগ ক'রে পাশ ফিরে শুয়ে প'ড়্‌লুম।.....

(৩)

তিন দিন তার সাথে কথা কইলুম না। রোজই ভাব্‌তুম, সে নিশ্চয়ই আজ তার কৃত অপরাধের জন্য ক্ষমা চাইবে। কিন্তু সে কোন দিনই আমার সাথে সেধে কথা কয়নি, এ কয় দিনও নিতান্ত অপরিচিতার মত নির্ব্বাক হ'য়ে কাটিয়ে দিলে। এতে আমার রাগ দিন দিন বাড়লো বই একটু ক'মলো না।.....

বাড়ীতে এই অশান্তির কেতর থেকে আর একটুও ভাল লাগ্‌ছিল না, ভাব্‌লুম বেড়াতে যাই।

তখন বড় দিন, কোলকাতায় একজিবিসনের খুব সমারোহ হ'চ্ছিল। মা-কে এক দিন বোল্লুম, "মা! একজিবিসনটা একবার দেখে আসিগে; কি বল?"

মা সোৎসাহে বোল্লেন, "বেশ তো। বা—না বৌমা, দেখে আয়গে। বৌমাকে নিয়ে যাবি?"

মনে মনে ভাব্‌লুম, 'হায়রে কপাল! তেমন বৌ যদি হ'ত আমার!' প্রকাশ্যে বোল্লুম, "না মা, আমি একাই যাবো, বৌ তোমার কাছে থাক্।"

কোলকাতা যাবো, জিনিষ পত্র সব গুছিয়ে নিচ্ছি। দিদের রুমালটা কিছুতেই পাওয়া যাচ্ছিল না; সেটাকে খুঁজ্‌তে খুঁজ্‌তে ড্রয়ারের ভিতর শান্তির সেই খাতা খানা পেলুম। গাড়ীতে বসে প'ড়্‌বো ভেবে সেখানাকে 'সুটকেসে' বন্ধ কোল্লুম।—

ট্রেনে উঠে 'সুটকেস্' খুলে খাতাটা বের্ ক'রে ব'স্‌লুম। মনে অবশ্য কৌতূহল হ'ল, এবার নিশ্চয়ই শান্তির গোপন প্রেমের কাহিনীটা সমস্ত ভাল ক'রে জান্‌তে পার্‌বো; নিশ্চয়ই এতে এমন কিছু পাবো যাতে ক'রে তার অসুখী হবার কারণটা সুন্দর ভাবে মীমাংসা হ'য়ে যাবে। কিন্তু তা পেলুম না; খুলে দেখলুম, সেটা গানের খাতা। প্রায়ই কীর্ত্তন আর পদাবলীর গান, দুটো চারটে প্রেমের গানও আছে। খাতার প্রায় সবটাই পুরুষের লেখা, শেষে কতকগুলো মেয়ে হাতের লেখাও আছে; কিন্তু কোথাও কারো নাম খুঁজে পেলুম না। যাহোক্, আমার স্থির বিশ্বাস হ'ল, শান্তি এটা নিশ্চয়ই তার পূর্ব্বপ্রণয়ীর কাছ থেকে উপহার পেয়েছে, আর শেষের গানগুলো লিখেছে সে নিজেই।.....

একজিবিসনে লক্ষ্যহীন হ'য়ে ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ বন্ধু শিশিরের সাথে দেখা। শিশির তার স্ত্রীকে নিয়ে বহুদিনের ছুটীটা উপভোগ কোচ্ছিল। আমাকে দেখে শিশির বোল্লে, "হালো! (Hallo!) তারপর? কবে এলি।

আমি বোল্লুম, "এইতো কাল্‌কে।"

"ভাল আছিস্ তো? বৌ কোথায়?"

"আছি ভাই এক রকম। বৌ বাড়ীতে।"

"সে কিরে! আননিনি? ছেলে আছিস্ বুঝি?"

আমি বোল্লুম, "হুঁ।" মনে মনে ভাবলুম, 'সত্যি, কি দুর্ভাগ্য আমি! যদি শিশিরের স্ত্রীর মত এম্‌নি আমুদে, এম্‌নি হাস্যময়ী হত আমার শান্তি!'

বন্ধু পত্নীর দিকে একবার চেয়ে, একটু হেসে আমি বোল্লুম, "তারপর? তুই তো বেশ ভালই আছিস্ দেখ্‌ছি!"

শিশির হাস্‌লো! হাস্‌তে হাস্‌তে বোল্লে, "কিন্তু এই গরীবের বাড়ী তোকে আজ খেতে হ'চ্ছে ভাই!"

শিশিরের অনুরোধে আমি স্বীকার হ'লুম না; কারণ মনটা আমার একটুও ভাল ছিলনা। এমন অশান্তি ভরা মন নিয়ে কি আমোদ আহ্লাদ ভাল লাগে? কিন্তু শিশিরের স্ত্রী যখন বার বার ব'ল্‌তে লাগ্‌লো। "চলুন না ঠাকুরপো! শুধু আজকের দিনটী বৈত নয়! চলুন।" তখন আর আ মি না ব'ল্‌তে পার্‌লুম না।

রাত্তিরে বন্ধুবর আমায় কিছুতেই ছেড়ে দিলে না, পরদিন ঘুম থেকে উঠ্‌তেও অনেকটা বেলা হ'য়ে গেল; বেলে এসে যখন পৌঁছলুম তখন প্রায় ৯টা বাজে। ঘরে ঢুকতেই 'ফ্রন্ট্-বয়' বোল্লে, "আপনার একটা টেলিগ্রাফ (wire) আছে মশায়! কাল বিকেলবেলা পিয়ন দিয়ে গেছে।"

'টেলিগ্রাফ!' শুন্‌তেই প্রাণটা কেঁপে উঠলো। তাড়াতাড়ি তার হাত থেকে খামটা নিয়ে খুলে প'ড়লুম; মা তার লিখেছেন :—

'বৌমার খুব অসুখ, শীগ্‌গীর চ'লে এসো।'

শান্তির—আমার শান্তির অসুখ! আমার বুকের ভেতর দুর্ দুর্ কোত্তে লাগ্‌লো. দুটী সুন্দর চোখের অশ্রু মাখা করুণ চাহনি আমার জ্বর-মুহূর্তে জেগে উঠ্‌লো। সত্যি কি আমি অন্যায় কোরেছি? সত্যি কি আমি তার উপর অবথা নিষ্ঠুর হ'য়েছি? সত্যি কি শান্তি আমার তার সেই ছোটো ছোটো অক্ষর গুলি বড্ড পবিত্র ভাবনা?

তাড়াতাড়ি জিনিষ পত্র গুছিয়ে নিয়ে সেই দিনই ট্রেনে রওনা হলুম।.....

(৪)

বাড়ী ঢুকতেই আমায় দেখে মা ডুক্‌রে কেঁদে উঠ্‌লেন। কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে বোল্লেন, "আর একটা দিন

আগে আসতে পারিনি খোকা? বৌমাকে যে আমার শ্মশানে রেখে দিয়ে এলুম রে! শুধু তোকে দেখবে ব'লেই যে সে আজও বেঁচে ছিল বাবা। সকালে এলেও বোধ হয় মা আমার বাঁচতো; আমার ঘরের লক্ষ্মী যে শুধু অভিমান ক'রেই চলে গেছেরে খোকা!"

স্তম্ভিত হ'য়ে খ'মকে দাঁড়ালুম! দুচোখ দিয়ে ঝর্ ঝর্ ক'রে জল গড়িয়ে প'ড়তে লাগ্‌লো; ইচ্ছা হ'ল মা-র মত আমিও প্রাণ ভ'রে চেঁচিয়ে কাঁদি। হায়রে অভাগিনী! শিশুকালে বাপ হারালি; বাপ কি জিনিষ তা ভাল ক'রে বুঝ্‌তেও পারি নি, জ্ঞান হবার সাথে সাথে চোখের সাম্‌নে দেখ্‌লি এক স্নেহময়ী মা। বুকের রক্ত দিয়ে তিনি তোকে মানুষ ক'রে তুল্‌লেন, কিন্তু তাও বুঝি বিধাতার চক্ষে সইল না! তিনিও কালের কোলে চলে পড়্‌লেন। তারপর তোর বুভুক্ষু তৃষিত হৃদয় নিয়ে এসেছিলি এক নিষ্ঠুর বর্ব্বরের কাছে! এসেছিলি এক মুষ্টি অন্নের জন্যে, এক বিন্দু জলের জন্যে, এক কণা ভালবাসার জন্যে! কিন্তু তাও—তাও বুঝি, তোকে আকৃষ্টিত চিত্তে দিতে পারিনি আমি! তাই বুঝি তুই শুধু প্রাণ ভরা অতৃপ্তির হাহাকার নিয়ে———হতাশার আগুন নিয়ে, জীবনের খেলা ধূলো শেষ ক'রে দিয়ে, যেখান থেকে এসেছিলি আবার সেই খানে চলে গেলি। হায় রে!

মাথে পোয়ে অনেকক্ষণ কাঁদলুম। কেঁদে কেঁদে প্রাণটা একটু হাল্‌কা হ'লে আমি চোখের জল মুছ্‌তে মুছ্‌তে মা-কে বোল্লুম, "কি হ'য়েছিল মা?"

মা বিবাদ মাখা মুখে বোল্লেন, "জ্বর হ'য়েছিল বাবা। হায়রে খোকা। তুই কি তার 'গানের খাতা' খানা নিয়ে গেছ্‌লি বাবা?"

খাতা! মা সে কথা জান্‌লে কি ক'রে! তাড়াতাড়ি পকেট থেকে খাতা খানা বের্ ক'রে বোল্লুম, "নিয়েছিলুম; কেন? কি হয়েছে মা?"

মা বোল্লেন, "সারা দিনরাত বিকারের ঘোরে সে 'খাতা খাতা' ক'রে চেঁচিয়েছে। ঐ খাতার জন্যই তো বৌ-মা আমার———" মা আবার চেঁচিয়ে উঠ্‌লেন। কাঁদতে কাঁদতে বোল্লেন, "যদি আর একটা দিনও আগে আস্‌তিস বাবা!"

আমি বজ্রাহত হ'য়ে দাঁড়িয়ে উঠ্‌লুম। কম্পিত উত্তেজিত স্বরে বোল্লুম, "কেন মা! খাতায় কি হ'য়েছে? কার খাতা ও?"

মা কাঁদতে কাঁদতে বোল্লেন, "খাতা খানা বৌমার বাবার। তিনি মর্‌বার সময় ওখানা ওর মাকে দিয়ে গেছ্‌লেন; মা মর্‌বার সময় ওখানা আবার ওকে দিয়ে গেছেন। ওখানা ছাড়া বাপ মার স্মরণ চিহ্ন বৌমার কাছে আর কিছুই ছিল নারে! তাই সে খাতাখানা খুব ভালবাস্‌তো, ভক্তিকোর্‌তো, রোজ যখন তখন ফুল দিয়ে পূজো কোর্‌তো। কত দিন ওখানা বুকে ক'রে আমি তাকে চোখের জলে ভাস্‌তে দেখেছি বাবা! তুই যে ওখানা নিয়ে গেছিস্, তা সে জান্‌তো না খোকা; জান্‌লে বোধ হয় বৌমা আমার এমন ক'রে চ'লে যেতোনা। খাতা খানা অনেকক্ষণ খুঁজে খুঁজে না পেয়ে সে যেন কেমন মুষ্‌ড়ে প'ড়লো! তার চোখ মুখ যেন কেমন ভর হ'য়ে গেল। আর সেই দিন দুপুরেই মা-র আমার গা একেবারে আগুন হ'য়ে উঠ্‌লো! মা আমার খাতা আন্‌তে কোথায় ছুটে গেলরে বাবা!" মা আবার কেঁদে উঠ্‌লেন।

আমার পা থেকে মাথা অবধি থর্ থর্ ক'রে কাঁপ্‌তে লাগ্‌লো। আমার জন্যই——আমার জন্যই আজি আমার মা ফাঁকি দিয়ে চ'লে গেছে? আমিই মেরে ফেলেছি তাকে?——ওঃ! আমার বুকের ভিতর যেন কেমন করে উঠ্‌লো! 'শাস্তি! শাস্তি!' ব'লে উন্মাদের মত চেঁচিয়ে উঠে আমি অজ্ঞান হ'য়ে প'ড়ে গেলুম।.....

* * * * *

তারপর?——তারপর দিন রাত্রির সারা-জীবন ধ'রে কত কেঁদেছি; সেই 'গানের খাতা' খানার প্রত্যেকটী অক্ষর চোখের জলে ধুয়ে ধুয়ে অস্পষ্ট ঝাপ্‌সা ক'রে ফেলেছি। তবুকি এতেও আমার সেই ভীষণ পাপের প্রায়শ্চিত্ত হ'লো না? হা ভগবান্!

সিলভার ক্লাউড ভার্জিনিয়া সিগারেটের

ধূম পান করুন।

নারীর সৌন্দর্য্য

[শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার গুপ্ত]

নারীর সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি পায় কিসে, এ নিয়ে আলোচনা বোধ হয় সৃষ্টির আদি থেকেই চলে আসছে এবং বোধ করি সৃষ্টির অন্ত পর্য্যন্ত তা চলবে। অবশ্য সভ্য-জগতের পুরুষদের কথা আমি বলতে চাই না কারণ তাঁরা নারীর শুধু সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি নয়, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য (সন্তান-সন্ততির সংখ্যাও) বৃদ্ধির যথেষ্ট চেষ্টা কোরছেন, এর পরও যদি নারীরা সৌন্দর্য্যহারা হয়ে পড়েন সে দোষ কি তবে পুরুষদের? তবে এস্থলে কয়েকটী কথা আমি বলবো যার দ্বারা নারী নিজের সৌন্দর্য্য উৎকর্ষ সাধনের চেষ্টা নিজেরাই কোরতে পারবেন।

নারীর প্রধান সৌন্দর্য্য-স্থল—চুল। তা সে খেঁদাই হউন বা কালাই হউন, চুল যদি তাঁর ঘন আর বেশী থাকে তবু তাঁকে সুন্দরী বলতে হবে। মেয়েরা সাধারণতঃ চুলকে বেশ তরঙ্গায়িত এবং চাকচিক্যময় কোরতে ভালবাসেন। তার সর্ব্বপ্রধান উপায় ষ্টালাক্স (Stallax) বলে এক রকম গুঁড়ো জিনিষ চুলে মাখা। একটুখানি গরম জলে, এক চামচ 'ষ্টালাক্স' মিশিয়ে প্রায় আধ ঘণ্টা ধরে তা চুলে ঘষতে হয়। চুলের সৌন্দর্য্য তাতে বাড়ে ঢের বেশী! রাসায়নিকদের কাছেই এ জিনিষটা পাওয়া যাবে।

দ্বিতীয়তঃ দেখা যায় মেয়েদের ঠিক কপালের ওপরে এক রকমের চুল গাছা করে চুল ওঠে যা কেবলই কপাল থেকে সরিয়ে দিতে হয়। অনেকে এর ধ্বংস সাধন কোরতেও কুণ্ঠিত নন। কিন্তু ধ্বংস সাধন করাটা অত সহজ নয় যতক্ষণ না পর্য্যন্ত 'কেমিনোল' চূর্ণ সেই চুল গুলির গোড়ায় লাগান হয়। এক আউন্স 'কেমিনোল'ই যথেষ্ট। কলেজের ল্যাবরেটারী বা রসায়নবিদদের, কাছেই ওষুধটা পাওয়া যায়।

মেয়েদের চোখের পাতার কুঞ্চিত কেশর রাশির সৌন্দর্য্যও অনেক সময়ে জগতে মানুষকে বিভ্রম করে তোলে। পূর্ব্বকালে চোখেরপাতার চুল গুলিকে সুন্দর করার জন্যে অনেক রকম চেষ্টা করা হোত, এখনে তা প্রায় উঠেই গেছে। আজ কাল যদি কেউ তা করবার ইচ্ছুক হয়ে থাকেন ত রাসায়নিকদের কাছ থেকে কিছু Menaline সংগ্রহ করা তাঁর উচিত। প্রত্যহ শোবার সময়ে তা আঙ্গুলের ডগা দিয়ে অঞ্জনের মত চোখের পাতায় লাগাতে হয়। সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির উপায়টা জেনে রাখা ভাল নয় কি?

কি পুরুষ কি নারী—কুঞ্চিত-নাসা এবং মুখে ব্রণের মত দাগ গুলি ভাল বাসেন না কেউই। সে গুলিকে পরিষ্কার করে, বেশ উপায়ে চাকচিক্যময় মুখ পেতে হলে প্রত্যেকেরই Cieminlte ব্যবহার করা উচিৎ। এই 'লোসন'টী মুখে মাখাবার একটু পরেই মুখশ্রী বেশ স্পষ্ট ফুটে ওঠে। এবং শ্রীটীও অনেকক্ষণ ধরে থাকে। পাউডার মাখবার কোন দরকার হয় না।

বুকের ছাতি-বাড়ানো শুধু পুরুষের নয় স্ত্রীলোকেরও দরকার। তবে মুগুর বা ডম্বল নিয়ে exercise করবার কোন দরকার নাই তাঁদের। রোজ সকালে শুধু পাঁচ মিনিটের জন্যে একটা খোলা জায়গায় দাঁড়িয়ে তাঁরা যদি খুব জোরে নিশ্বাস নিয়ে, আট দশ সেকেণ্ড পরে তা ধীরে ধীরে ছেড়ে দেন, তা হলেও তাঁদের Chest-exercise এর কাজ খুব জোরে এতে শুধু Exerciseই হয় না, মুখ ও শরীরের সৌন্দর্য্য বাড়ে ঢের বেশী। সৌন্দর্য্য-বৃদ্ধির আরও ঢের উপায় এর পর বলা যাবে।

ইণ্ডিয়ান সোপ কোম্পানীর
মেসিনে প্রস্তুত
চন্দন, রয়েলবকুল, মাস্ক ও ভেলভেট সাবান
ব্যবহার করুন।
টেলিফোন

সূতিকা গৃহ।

[শ্রীশশধর রায়]

সূতিকা গৃহ এক্ষণে অস্পৃশ্য; স্পর্শ করিলে স্নান করিতে হয়। সুতরাং গৃহিণীগণ তাহাতে প্রবেশ করেন না; অন্ততঃ স্নানের পরে কখনই প্রবেশ করেন না। পূর্ব্ব অন্যান্য জাতীয় হৃদয় হীন ব্যবসায়ী স্ত্রীলোকদিগের হস্তে সদ্যোজাত শিশুকে ছাড়িয়া দিয়া তাহার মাতামহী, পিতামহী প্রভৃতি নিকটাত্মীয়াগণ নিশ্চিন্তে নিদ্রা যান। ফলে এই হইয়াছে যে পৃথিবীর কোথাও যে পরিমাণ শিশুর মরণ নাই এতদ্দেশীয় হিন্দু—সমাজে তাহাই দেখা যাইতেছে। জাতক সংখ্যার এক তৃতীয়াংশ সূতিকা গৃহেই মরে অথবা জাতকের এক বৎসর বয়স হইবার পূর্ব্বেই মায়ের কোল খালি করিয়া চলিয়া যায়। হিন্দু বলে "উপায় নাই, যে মরিয়া গেল তাহার পরমায়ু ফুরাইয়াছিল।" আমার জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হয় যে পৃথিবীর সকল মানুষের অপেক্ষা আমাদিগের শিশুগণের এত অধিক সংখ্যায় এবং এত শীঘ্র পরমায়ু ফুরায় কেন? উত্তরে শুনিতে পাই "পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্ম ফল।" আমার জিজ্ঞাসা করি, সকল মানুষ অপেক্ষা আমাদিগের শিশুগণ এত অধিক সংখ্যায় এমন কর্ম্ম পূর্ব্ব জন্মে কেন করিয়াছিল যাহাতে বর্ত্তমান জন্মে এত অল্প বয়সেই পালে পালে যমালয় দর্শন করিতে হইতেছে। বোধ হয় ইহার উত্তরে "পূর্ব্ব জন্মের পূর্ব্বজন্ম" বলিতে হইবে; অর্থাৎ পূর্ব্ব জন্মের আগেকার জন্মের কর্ম্মফল বলিতে হইবে। তাহাতেও আমার জিজ্ঞাসা ঐ এক কথাই। তদুত্তর পূর্ব্ববৎ হইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু এরূপ প্রশ্ন এবং হওয়া দূষনীয়। পুনঃ পুনঃ একই উত্তর দিতে হইলে তাহাকে অনবস্থা দোষ বলে। কারণ এরূপ স্থলে একই প্রশ্ন এবং একই উত্তর পুনঃ-পুনঃ হওয়ায় ঐ প্রশ্নের মিমাংসা হইল না। বৃথা বাক্য ব্যয় হইল মাত্র।

এ জন্মের ঘটনার কারণ অন্বেষণ করিতে গিয়া পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্ম ফলের আশ্র. লইতে হইলে দুর্দ্দশা এইরূপই হয়। ইহার অন্য প্রকার সন্তোষজনক উত্তর হইতে পারে। আমার মনে হয় তাহা জীব বিজ্ঞানের অন্তর্গত। সে কথার এক্ষণে প্রয়োজন নাই। যাহা বলিতেছিলাম তাহা এই যে—এতদ্দেশে শিশুমরণ অত্যন্ত অধিক এবং সূতিকা গৃহ অস্পৃশ্য। এতদুভয়ে কি কোন সম্বন্ধ নাই? আমি বলি যনিষ্ট সম্বন্ধ আছে। এ মত আমার বহু দর্শন হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

আমার পিতামহী ঠাকুরাণীর কাছে শুনিয়াছি যে তিনি তাঁহার পিতার ভবন গৃহে আমার পিতাকে প্রসব করিয়াছিলেন। সেই আজি ১০০ শত বৎসরের কথা হইবে সেকালে প্রসব গৃহ অস্পৃশ্য ছিল না। কিন্তু ৭০ বৎসর পূর্ব্বে আমার মাতৃদেবীর প্রথম বয়সে সূতিকা গৃহ অস্পৃশ্য হইয়া উঠিয়াছিল। এরূপ হইল কেন? মাত্র ৩০ বৎসরের মধ্যে এই সাংঘাতিক পরিবর্ত্তন হইবার কারণ কি? ইহার প্রতীকার করিতে না পারিলে এত দেশের জন-হীনতা নিবারণ করা যায় না—। জনহীনতার যত কারণই থাকুক, সূতিকা গৃহের অস্পৃশ্যতা সে সকলের মধ্যে একটী গুরুতর কারণ। সুধীগণ এই পত্রিকায় এ বিষয়ে আলোচনা আরম্ভ করুন ইহাই আমার অনুরোধ।

মধুসূদন স্মরণে

[কবিগুণাকর—শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায় বি-এ]

(মৃত স্মৃতি সভার উদ্দেশ্যে লিখিত)

দেশ দেশান্তর হতে করি আহরণ
প্রবাল মুকুতা কত নীলকান্ত মণি—
গাঁথি বৈজয়ন্তী মালা সুষমার খনি—
দেশ মাতৃকায় করে করেছ অর্পণ।
এ যে অন্ন জন্মান্তের তপস্যার ফল,
দেবের প্রেরিত তুমি হে মধুসূদন।
নীলকণ্ঠ সম তুমি পিয়ে হলাহল
দেবের উদ্দেশ্য তুমি করিলে সাধন।
বঙ্গের কবিতা হায় দিবস যামিনী
বেড়াতেছ নটী সম—মন্ত্রীর চরণে—
তুমি তা' খুলিয়া নিয়া—অপূর্ব্ব বরণে
সাজাইলে তারে করি চির গৌরবিনী!
—সে যে আজ ত্রিলোকের, প্রবীণা সুন্দরী
দীন বঙ্গবাণী যদি আছে আলো করি।

জানা দরকার

[শ্রীমতী শোভা রুদ্র]

ফ্লানেল বা পশমী জামা কাপড় কাচিতে হইলে জলের সহিত কিছু এমোনিয়া মিশাইতে হইবে। ইহাতে জামা গুলি বেশ নরম এবং তুল্-তুলে হয়, রংও নষ্ট হইতে পায় না।

• • • •

অধিক মূল্যের ছুরী কাঁচি পরিষ্কার করিতে হইলে কাঠ-কয়লার গুঁড়া ব্যবহার করিতে হইবে, ইহাতে নষ্ট হইবার ভয় আদৌ থাকে না।

• • • •

এনামেলের কড়ার তলা পুড়িয়া গেলে তাহা ফেলিয়া দিও না। এক প্যাকেট 'ক্লোরাইড অব্ লাইম' প্রায় এক পাইন্ট জলে ফেলিয়া তাহা কড়ায় রাখিয়া দিতে হইবে। পরে দুই তিন দিন বাদে উত্তমরূপে ঘষিলে পোড়ার দাগ গুলি সহজেই উঠিয়া যাইবে।

• • • •

ফ্লানেল হইতে ঘামের দাগ উঠাইতে হইলে প্রথমে গ্লিসারিনের সহিত ডিমের সাদা অংশটী সমান ভাগে মিশাইতে হইবে। ভাল রূপে মিশ্রিত হইলে ঘণ্টা দুই তিন বার সেই গ্লিসারিন দিয়া ফ্লানেলটা ভিজাইতে হইবে। পরে সাধারণ ভাবে কাচিলে ঘামের দাগ আর থাকে না।

• • •

বালিশে তুলা পুরিবার সময় তুলার সহিত কিছু কর্পূর মিশাইয়া রাখিলে বালিশ বেশ নরম এবং আরাম দায়ক হয়।

• • • •

জামা ঝাড়িবার বা পরিষ্কার করিবার বুরুশ পরিষ্কার করিতে হইলে গরম জলের সহিত এমোনিয়া মিশাইতে হইবে। ইহাতে দুর্গন্ধও অনেক দূর হইয়া যায়।

• • • •

কেশের শোভা বৃদ্ধি করিতে কেশ রক্ষ মরামাস প্রভৃতি দূর করিতে ইহা অদ্বিতীয়। ইহার মনোহর গন্ধে মন প্রাণ আমোদিত করিবে। বাজার প্রচলিত তৈলের ন্যায় ইহাতে অনিষ্টকর বাজে তৈল নাই। সম্পূর্ণ দেশী উপাদানে দেশীয় গাছ গাছড়ায় প্রস্তুত অতুলনীয় কেশ তৈল।

মূল্য প্রতি ৪ আউন্স শিশি ৸০ বার আনা

৮ আউন্স শিশি ১৲ এক টাকা

ডাঃ মাঃ ও পাইকারদিগের জন্য স্বতন্ত্র।

এজেণ্ট—মল্লিক ব্রাদার্স

৪৩।১ ষ্ট্রাণ্ড রোড, (হাবড়া পুলের নিকট)

কলিকাতা

পুলিশ ও গুণ্ডা

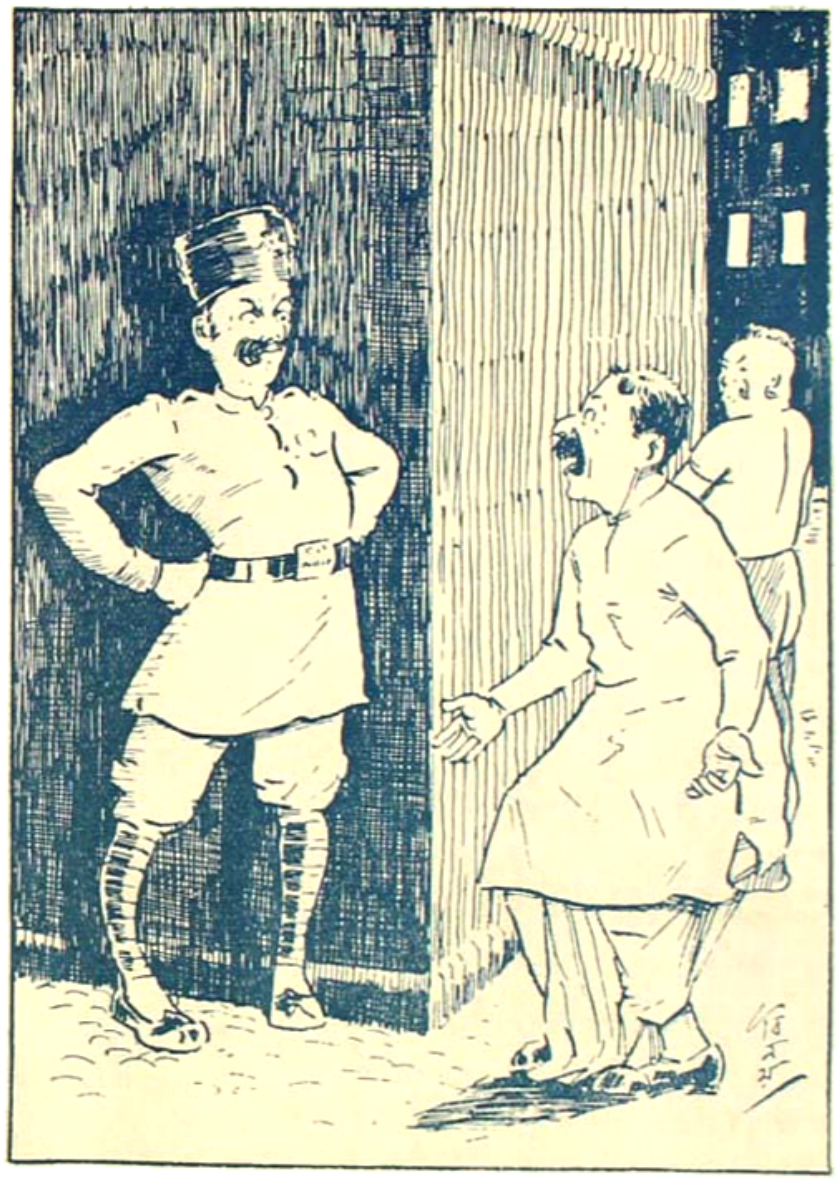

গুণ্ডা—(সর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইয়া) যা বেটা খুব বেঁচে গেলি—তোর যার টাকা তের আনার ওপর দিয়েই গেল—

(পথিক কিছুদূর অগ্রসর হইতেই পাহারাওয়ালা ধরিল)

পাহারা—এই শালা—এতনা রাত্‌মে কেয়া কর্‌তে হো—চলো থানেমে, নেহি ত কুছ্‌ পান খানেকো দেনাও—

পথিক—আর তো কিছু নেই বাবা—যা ছিল সব—গুণ্ডায় কেড়ে নিয়েছে—

পাহারা—তব্‌ যাও শালা—লে যব্‌ লিয়া তব্‌ যব্‌রা তো আল্‌বৎ মিলেগা—

পথিক—জয় চৌদ্দাট বাহাদুরের জয় ! !

ষ্টার থিয়েটারে অভিনীত

ইরানের জাতীয় সমালোচনা আমরা ২৮ সংখ্যায় করিয়াছি, তাহার কয়েকখানি চিত্র দেওয়া হইল।

দারার ভূমিকায়
শ্রীঅহীন্দ্রনাথ চৌধুরী

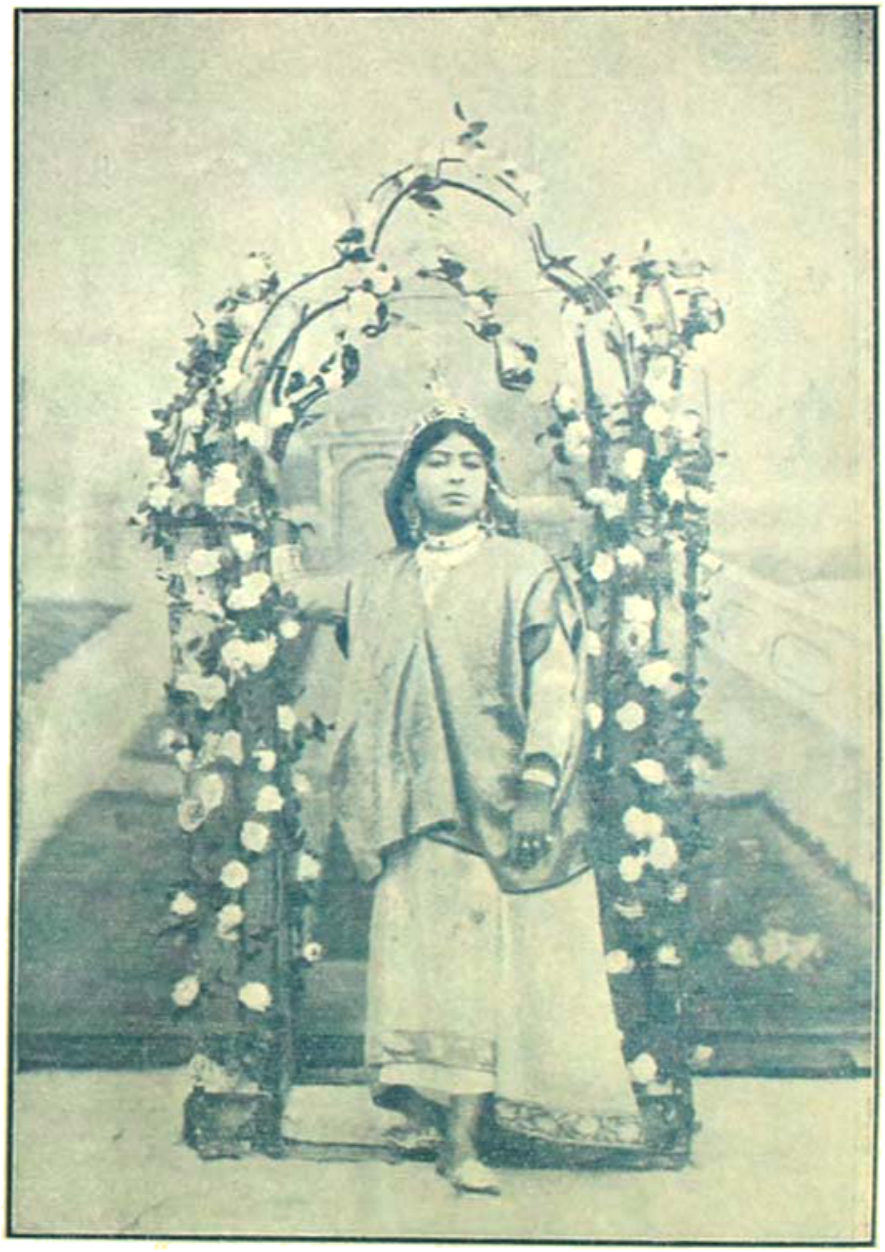

রাণীর ভূমিকায়
শ্রীমতী কৃষ্ণভামিনী

নর্ত্তকীর ভূমিকায়
শ্রীমতী নীহারবালা

চিঠির তাগিদ

[শ্রীনির্ম্মলকুমার রায়]

বি, এ, পাশ করিয়াও যখন ২৫৲ টাকা বেতনে পোষ্টমাষ্টার হইলাম তখন স্বপ্নেও ভাবি নাই-যে আমাকেও ভুল-ঠিকানা-লেখা পত্রের মত পোষ্টাফিস্ হইতে পোষ্টাফিসে ঘুরিতে হইবে। বিংশ শতাব্দীতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, এ পাশ করিলে নাকি অন্ত বিশেষের জন্ত ঘাস কাটিতে হয় কিন্তু সৌভাগ্য ক্রমে আমায় সে কাজ এপর্য্যন্ত করিতে হয় নাই।

খবর আসিল 'হরিপুর' আফিসে বদলি হইয়াছি। মাত্র একটি বাস যাবৎ এ পোষ্টাফিসে আসিয়াছি এরই মধ্যে বদলি—ধরখাস্ত দিলাম। লোকে কথায় বলে 'হাকিম নড়ে তো হুকুম নড়ে না—অতএব পোটলাপুটলি বাঁধিয়া বৃহস্পতিবার দিবস রওনা হইলাম।

ঠিক মেলিতে পারি বিদ্যুৎবারের বার বলাতে রওনা হই নাই কিন্তু ট্রেনে উঠিতেই যা বৃষ্টি এবং ঝড় আরম্ভ হইল তাহাতে বুঝিলাম নিশ্চয়ই পঞ্জিকাকারেরা ভুল গণিয়াছে—কিন্তু তাদেরইবা কি দোষ এ যে ঘোর কলিকাল, 'হরিপুর ত্রিপুরা ষ্টেট জেলার সীমার মাঝখানে একটি গণ্ডগ্রাম। ক্রোশ খানেক দূরে অবস্থিত 'হরিপুরের' ষ্টেশনে নামিয়া পদব্রজে যাইতে হয়। ট্রেন কত শত পল্লীর মাঝখান দিয়া ছুটিয়াছে, সব গ্রাম সুপ্ত—সব দ্বার রুদ্ধ, একটি ক্ষীণ দীপ শিখাও চোখে পড়ে না। দুই দিকে অনন্ত প্রসারিত গ্রামরেখা আর মাঝখান দিয়া পূর্ণ গতিতে চলিয়াছে বিরাট লৌহ শকট, বিরাম নেই বিশ্রাম নেই যেন চিরকালের যাত্রী। বৃষ্টিরও বিরাম নেই—ঝম্ ঝম্ পড়িতেছিল। জ্যোৎস্নাপক্ষ ছিল, ভাবিয়াছিলাম কোনরূপে ষ্টেশন হইতে কুলি লইয়া যাইতে পারিব—দুই মাইল রাস্তা মোটে।

রাত্রি ৯টার সময় হরিপুরের ষ্টেশনে গাড়ী থামিল। ছোট্ট একটি ঘরে ষ্টেশন। একটী রেলের সেই লাল আলো—বৃষ্টিতে ঝিমিয়া ঠিক উন্মত্ত মাতালের নেশাখোর চোখের মত দেখাইতেছে। কতকাল ধরিয়া যেন এ রক্ত-চক্ষু কঠোরে চাহিয়া আছে। হাঁকাহাঁকি করিয়া একটি কুলি পাইলাম। অনেক ধর কষাকষির পরে এক টাকা চুক্তিতে সে জিনিষ পত্র লইয়া যাইতে স্বীকৃত হইল। আর জিনিষইবা কি—পত্রই বা কি। একটি বিছানা আর একটি বাক্স।

পল্লীগ্রামের পথ—বৃষ্টিতে ভিজিয়া পিছল হইয়াছিল, বহুবার হুচট খাইলাম, কতবার ভুল পথে গেলাম, অবশেষে বৃষ্টি থামিয়া একটু একটু জ্যোৎস্না দেখা দিল। বহুক্ষণ পরে এক নদীতীরে উপস্থিত হইলাম, কুলিকে জিজ্ঞাসা করাতে সে নাম বলিল 'ত্রিতাগ।' বহু ডাকাডাকি করিয়াও খেয়ামাঝির সন্ধান পাওয়া গেল না। যে এ দুর্দ্দিনেও খেয়াঘাটে বসিয়া থাকিতে পারে তার বাকিশিরি না করিয়া 'পম্পে' নগরীতে দ্বাররক্ষী হওয়া উচিত। অবশেষে নিজেই নৌকা বাহিয়া পরপারে উপস্থিত হইলাম।

দুই ঘণ্টাতে দুই মাইল পথ অতিক্রম করিয়া ১১টার সময় আফিস ঘরে উপস্থিত হইলাম। একটি বৃদ্ধ পিয়ন তখনও জাগিয়াছিল।

একটা কেরোসিনের বাতি মিটি মিটি জ্বলিতেছে। আর এই অস্ফুট আলোকের মধ্যে বসিয়া খেতশ্মশ্রু বৃদ্ধ পিয়ন। বার্দ্ধক্য তাহাকে বহুপূর্ব্বেই জ্ঞানের শুভ্রমুকুট পরাইয়া দিয়াছিল, চক্ষু দুটি মিটমিট করিতেছে—কিন্তু তবু যেন তা'রা চিরকাল জাগ্রৎ। সেই বৃদ্ধ পিয়নটাকে ঘেরিয়া যেন অতীতের সহস্র স্মৃতি নাগপাশের মত জড়াইয়া রহিয়াছে। চারি দিকে সব সুপ্ত—শুধু সে জাগিয়া। যেন সেই দীপে সুবর্ণ আপেলের পাহাড়ায় চির জাগ্রৎ অজাগর বসিয়া আছে।

ঘরে ঢুকিতেই পিয়নটি নিতান্ত পরিচিতের মত জিজ্ঞাসা করিল—কি বাবু আসতে বেশী কষ্ট হয় নাই তো? আর কেই বা জানে যে এমন দিনে এমন দুর্যোগ হবে। খাবার ভারী কষ্ট হইবে আজি আপনার। এই অচেনা জায়গায় বিশেষতঃ রাত্রি কালে এমন একটি

বহু পাইয়া বিশেষ আশ্বস্ত হইলাম। কিন্তু জল খাইয়া পিয়নটির নিষেধ সত্ত্বেও একটু বাহিরে আসিলাম।

সম্মুখে অনন্ত প্রসারিত মাঠ—যতদূর দৃষ্টি যায় কেবল শূন্য আর শূন্য। অদূরে গ্রাম রেখা ধূ ধূ করিতেছে। উত্তরে ও পশ্চিমে যাইল খানেক দূরে শ্রীহট্টের পাহাড়। তখন জ্যোৎস্না উঠিয়াছে—জ্যোৎস্নাতে পাহাড় বেশ দেখা যায়। দক্ষিণে মন্থর গমনে চলিয়াছে ক্ষীণ কায়া তিতাস। অগভীর—স্রোতহীন কিন্তু জলটুকু তার পাতলা টল্‌টলে। ধীরে ধীরে বাতাস বহিতেছে—ছোট ছোট ঢেউ উঠিয়াছে। জ্যোৎস্না আর বাতাসে তিতাসের বুকে স্বপ্ন বুনিতেছিল। হরিপুর গ্রামটি অদূরে ঘরটির পশ্চিমে। দেখিলেই মনে হয় গ্রামটি শ্রীহীন। যেন এককালে সমৃদ্ধ ছিল—আজ দীন দরিদ্র। নীরবভাবে দাঁড়াইয়া আছে—নির্ব্বাপিত বহ্নির ভস্ম-মুষ্টি লইয়া—বিগত যৌবনের সুরভি রোমন্থনে চোখ বুজিয়া!

সমস্ত রাত্রি ভ্রমণের পর সহজেই নিদ্রা আসিল। ঘরে যাইয়া শয্যা গ্রহণ করিলাম।

ভোরের আলোর অঙ্গস্পর্শে চোখ মেলিতেই চমকিয়া গেলাম। এ আমি কোথায় কি করিয়া এখানে আসিলাম? একটা জরাজীর্ণ কোঠা—চূণ বালি খসিয়া পড়িয়াছে—কোণে কোণে রাশি রাশি আবর্জ্জনা স্তূপে অসংখ্য চামচিকা আর মাকড়সার জাল। আলো যেন অতি সন্তর্পণে চোরের মত সে প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিতেছে কাছে দাঁড়াইয়া সে বৃদ্ধ পিয়নটি মুখে একটা তীব্র বেদনার ভাব—চোখ দুটি ছল ছল। সে মিনতির সুরে বলিল—বাবু বাহিরে চলুন।

আমি যেন কি মোহমায়াবশে মুগ্ধ হইয়াছিলাম যন্ত্র চালিতের মত বাহিরে আসিলাম। দেখি একটা প্রকাণ্ড দোতলা বাড়ী। কালের প্রতাপে দেয়াল খসিয়া গিয়াছে। সিংহদ্বারে সিংহের নাম গন্ধ নাই—কতক গুলি শৃগাল ঘুরিতেছিল। ফুলের বাগানে কেবল কাঁটা গাছ। প্রকাণ্ড দালানের উপর একটা বৃহৎ অশ্বত্থ গাছ উঠিয়াছে—ভূমিকম্পে অর্দ্ধেক পড়িয়া গিয়াছে—সারা গায়ে শেওলা। আমি অবাক হইয়া বলিলাম—পিয়ন একোন জায়গা, কেমন করিয়া এখানে আসিলাম?

পিয়নের চোখ দুটি বর্ষার আকাশের মত জলে আরো ছল ছল করিয়া উঠিল। চাপিয়া সে বলিতে লাগিল "বাবু, সব বলিব। সেই যৌবন কাল হইতে এই কাহিনী বলিতে বলিতে বুড়া হইয়া গিয়াছি। কতবার কত জনের কাছে এ কাহিনী বলিয়াছি—কেহ বিশ্বাস করে কেহ করে না। আজও আবার বলিব——আপনাকে আমার কথা বিশ্বাস করিতেই হইবে। চলুন সেই কোঠার ভিতর।"

ভয়ে ভয়ে আবার সেই অন্ধকার কোঠাতে প্রবেশ করিলাম। কেমন একটা বিশ্রী গন্ধ নাকে ঢুকিল—ছুছুক করিয়া একটা চামচিকা উড়িল। পিয়ন বলিতে লাগিল,——

সে আজ অনেক দিনের কথা। তখন হরিপুর গ্রামের এ অবস্থা ছিল না। গ্রামে তখন ভাত ছিল—লোক তখন হা-অন্ন হা-অন্ন করিয়া ঘুরিত না। সেই সুদিনে এই যে বাড়ীটা দেখিতেছেন এখানে একঘর ধনী সাহা পরিবার বাস করিত। এ বাড়ীর তখন এ অবস্থা ছিল না। আজ যেখানে শেওলা উঠেছে সেখানে ছিল কত কারু কার্য্যের বাহার। এই যে সব রুদ্ধ বাতায়ন এর প্রতিটিতে তখন অনেক রূপসী অপলকনেত্রে চাহিয়া থাকিত। আজ যে স্থান নীরব নিথর আগে সে স্থল কত সুন্দরীর মিষ্টি হাসে মুখরিত হইত—যেখানে তখন সিঁদুর পড়িলে কুড়ান যাইত আজ সেখানে ধূলার রাশি। আশ্চর্য্য হইবার কিছু নাই বাবু এতো জগতের নিয়ম। জানি এখন আপনার একথা বিশ্বাস করা কঠিন হইবে। ভূধর যুগের অস্তিকায় হস্তীর কঙ্কাল দেখিয়া কে তার অস্তিত্বের কথা ভাবিতে পারে—আমাকে দেখিয়া কে ভাবিতে পারে যে আমিও এক দিন যুবক ছিলাম।

একবার আমাদের গ্রামে ঢুকিল মারী। সে কি ভীষণ দুর্দ্দিন। দলে দলে লোক অনশনে অর্দ্ধাশনে কত অজ্ঞাত ক্ষণে প্রাণ ত্যাগ করিতে লাগিল। ঘরে ঘরে আর্ত্তের হাহাকার, মুমূর্ষুর ক্রন্দন ধ্বনি সৃষ্টিছাড়া বুক ফাটা অনুনয়। দেশের নর-নারীরা যেন ভূতের মত পথে পথে ঘুরিতে লাগিল—কিন্তু যাইবে কোথায়? দুর্দ্দিকে যে ধনী দরিদ্র সমান। দেশে তখনও রেলপথের

বিস্তার যে নাই তাই সাহাদের ও মরণাপন্ন অবস্থা হইল কারণ টাকা তো আর খাওয়া চলে না। দুর্ভিক্ষের পরে আসিল তার নিত্য সহচর ব্যারাম। ব্যারাম সে কি একেবারে মহামারী। দিন দিন হরিপুর উজার হইতে চলিল। কলেরা—বসন্ত আরো কত কি। প্রকাণ্ড সাহা পরিবারের মধ্যে রোগের প্রাকোপটা হইল বেশী। সব শয্যাগত—এমন একটি লোক নাই যে মুখে জল দিবে। আমি তখনও ছিলাম পিয়ন। যথা সাধ্য সাহায্য করিলাম—কিন্তু একা আমার সাহায্যে কি হইবে!

দুর্ভিক্ষের প্রকোপ কমিয়া গেল—ঘরে ঘরে রোগ শান্তি হইল। কিন্তু সাহা পরিবারের মধ্যে রহিল এক অশীতিপর বৃদ্ধা আর তাহার এক যুবক নাতি। দুর্ভিক্ষ তো শেষ হইল কিন্তু অবস্থা আর ফিরিল না। টাকা পয়সা লুট পাট হইয়া গিয়াছে, জায়গা জমি বিশেষ ছিল না—যাহাও ছিল তাও সব এত দিনে পরহস্তে গিয়াছে।

যুবক মহা মুস্কিলে পড়িল। চাকুরির উদ্দেশ্যে তাহাকে বাহির হইতে হইল। চাকুরি মিলিল কিন্তু এ দেশে নয় সেই সুদূর আফ্রিকায়। যুবক আসিয়া বলিল—দিদিমা আমাকে চাকুরি করিতে যাইতে হইবে।

দিদিমা কাঁদিয়া আকুল। সমস্ত গিয়া তাহার এক মাত্র পৌত্র আজ জীবিত। এই যে তার বংশের শেষ প্রদীপ এর শিখা যদি নিবে তবে বংশ শেষ হইবে। এ ও আজ বিদেশে যাইতেছে। আবার কোন সে সুদূর আফ্রিকায়। সেখান কার লোকেরা নাকি মানুষ খায়। দিদি-মা বলিলেন—দাদা এক দিনে তুই ও আমাদের ছাড়িয়া চলিলি। অনাহারে যদি তাও ভাল, তোকে ছাড়িব না।

"সে কি হয় দিদি-মা আমাকে যাইতেই হইবে"। অনেক কান্নাকাটির পর সে বিদেশে চলিয়া গেল। প্রায়ই চিঠি দিবে। এই যে তরুণ যুবক কঠিন জীবন সমস্যার বোঝা মাথে লইয়া কোন সুদূরের আশায় ঝাঁপ দিল এখান হইতে একটা প্রকাণ্ড বিয়োগান্ত নাটকের সুরু হইল, আগে তার যবনিকা পড়ে নাই—কি জানি কত দিন এ অভিনয় চলিবে।

যাহোক পৌত্র তাহার বিদেশে যাইবার পরদিনই দেখি সেই বৃদ্ধা একটি লাঠিতে ভর করিয়া পোষ্টাফিসে আসিয়া উপস্থিত হইল। চিঠি পত্র গুছাইতেছি এমন সময়ে ক্ষীণ কণ্ঠে বলিল—ডাক-বাবু চিঠি আছে আমার। আমি বলিলাম—এত শীঘ্র কি চিঠি আসে? আরো এক মাস পরে আসিও, 'আরো এ—ক—মা—স' বলিয়া বৃদ্ধা চলিয়া গেল।

ঠিক এক মাস পরে আবার সে উপস্থিত—ডাক-বাবু চিঠি আছে আমার—? মাষ্টার বাবু উত্তর দিলেন না। এক দিন দুই দিন করিয়া বহু দিন গেল কিন্তু যে গিয়াছে সে আর আসিল না। ধীরে ধীরে বাড়ীর এ অবস্থা হইল—বৃদ্ধা প্রবল ব্যায়রামে শুইয়া পড়িল—কিন্তু তাহার নাতির কোন খবর নাই। সে হয়ত তখন ভেসেসি তীরে 'সীতার' বৃক্ষ তলে কোন প্রণয়িনীর সাথে আলাপ করিতেছে। কত দিন গেল কত মাস গেল কিন্তু তাহার চিঠি আর আসে না। প্রতিদিন দ্বিপ্রহরে সেই নিয়মিত জিজ্ঞাসা—সেই স্নেহপ্রবণ হৃদয়ের প্রবল আকাঙ্ক্ষা—ডাক বাবু চিঠি আছে আমার আর চির দিন সেই অতি নির্মম নিষ্ঠুর উত্তর নেই। দিনের পর দিন এ অভিনয় চলিল। বৃদ্ধার জীবন ফুরাইয়া আসিল—কিন্তু তবু চিঠি নেই। অবশেষে এক দিন সে আর আসিল না। বার্দ্ধক্যের প্রকোপে সে শয্যা গ্রহণ করিল—ধীরে ধীরে জীবনের আশা কমিল কিন্তু তবু চিঠি আসে না। হায়রে কোথায় সেই দূর আফ্রিকা আর কোথায় এই বাংলার নির্জ্জন পল্লীর ক্ষুদ্র কুটীর।

এক দিন সত্য সত্যই বৃদ্ধার নামে এক চিঠি আসিল—সেই সুদূর আফ্রিকা হইতে। কিন্তু বৃদ্ধা সে দিন কোথায়! মাতৃ-পিতৃহীন যুবকের হয় ত মৃত্যু শয্যায় পড়িয়া! বাংলার পোড়ো বাড়ীস্থিত এই অতি বৃদ্ধা পিতামহীর কথা মনে পড়িয়াছিল—তাই মৃত্যুর দুয়ারে বসিয়া এ লিপি সে আজ পাঠাইয়াছে। হায়রে মমতা? দৌড়াইয়া এখানে আসিলাম -ঠিক এই কোঠাতে আসিয়া দেখিলাম—কি ভীষণ দুর্গন্ধ যুক্ত একটা গলিত শব। চামড়া কাটিয়া গিয়াছে। শৃগাল বল কতক বা খাইয়াছে কতক ছিড়িয়াছে কি বীভৎস দৃশ্য। পাগলের মত দৌড়াইয়া বাহির হইলাম। ভয়ে বিস্ময়ে শোকে

ভক্তিত হইয়া উঠিয়া বসিলাম। যার চিঠি আসিয়াছে সে তো আর ইহ জগতে নাই—সে যে চিতির বাহিরে—তার দিয়া ও তার কাছে কোন খবর পৌঁছায় না। পত্র ফেরৎ দিলাম। আবার দিন দশেক পরে এখানে আসিলাম—দেখি একটা কঙ্কাল পড়িয়া রহিয়াছে—নাক চোখের জায়গায় কেমন ভীষণ গর্ত্ত—দাঁতগুলি বাহির হইয়া রহিয়াছে - চারিদিকে কেমন আধ আলো আধ আঁধার! চমকিয়া গেলাম। কে যেন বলিল ভয় পাইও না ঐ দেখ কোনে আসেও তেমনি ভাবে শুইয়া আছে সেই কঙ্কাল—ঐ দেখ সেই কঙ্কাল—বৃদ্ধারপঞ্জর—অতীতের বিকট সাক্ষী—স্নেহের সমাপ্তি।

সংগ্রহ

[শ্রীশশধর বন্দ্যোপাধ্যায়]

কলির ভগবান্ঃ—নিজের শরীরকে ইচ্ছা মত কমাতে বা বাড়াতে যদি কারও শক্তি থাকে, তা সে এক ভগবানেরই আছে। মানুষের সে শক্তি আজও দেখা যায় নি। তবে আমেরিকায় এক প্রবল-মহিলাকে পাওয়া গেছে, যিনি মানুষের শক্তি অতিক্রম কোরে ভগবানের ক্ষমতা লাভ কোরেছেন এই মহিলাটীর নাম মিস্ চরজিয়া! এর স্বাভাবিক ওজন এক শত পাউণ্ড বা একমণ দশ সের। আমেরিকার Weight-lifterরা এই মহিলাটির কোমর ধরে সহজেই একে শূন্যে তুলতে পারে, কিন্তু শ্রীমতী যে মুহূর্ত্তে দো'ক ইচ্ছে কোরলেই তাঁর ওজন চার শত পাউণ্ড বা পাঁচমণ কোরতে পারেন, এপর্য্যন্ত এই অবস্থায় কোন Weight lifter রাই তাঁকে তুলতে পারে নাই। চেহারাটা কিন্তু তাঁর ভারী পাতলা আর ছিপ্ ছিপে, এই অদ্ভুত ব্যাপারের কারণ এখনও অনেক বৈজ্ঞানিকরা সন্ধান কোরছেন।

• • •

প্রকাণ্ড ইঞ্জিনঃ—বিলাতের গ্রেট ওয়েষ্টার্ণ রেলের মেকানিক্যাল ইঞ্জিনীয়ার মিঃ জি জে চার্চওয়ার্ড একটা প্রকাণ্ড ইঞ্জিন তৈরী কোরেছেন। এর মত বড় ইঞ্জিন পৃথিবীতে আর তৈরী হয় নি, অনেকের ভয়। ঐ ইঞ্জিন খানি চলতে আরম্ভ কোরলে রেল-লাইনের পাশের বাড়ী ঘর ছোট ছোট ষ্টেশন গুলা চূর্ণ হয়ে যাবার সম্ভাবনা যথেষ্ট।

টেক ঘড়িঃ—Lincoln নিবাসী একটী ঘড়ী নির্ম্মাতা সম্প্রতি একটী বৃহদাকার টেক ঘড়ি (ক্লক) তৈরী কোরেছেন, এত বড় ঘড়ি জগতে আর নেই, দেখতে এটী সাধারণ টেক-ঘড়ির মত; কেবল আকারেই বা বড়। এর পরিধি ৪০ ইঞ্চি ওজনে ৪৬ সের। এটী তৈরী কোরতে খরচ হয়েছে প্রায় দু'হাজার পাউণ্ড।

পকেট বেতার টেলি-ফো—আমেরিকার সিকাগো সহরের পুলিশের বড় কর্ত্তা সেখানকার প্রত্যেক কনেষ্টবলের হাতে একটি করে বেতার টেলি-ফো দিয়েছেন। এটা অনায়াসে পকেটে রাখা চলে, এর সাহায্যে চোর বদমায়েসের খবর মুহূর্ত্ত মধ্যে সহরের সমস্ত জায়গায় পুলিশের কাছে পাঠান যায়।

• • • •

অদ্ভুত পুরস্কারঃ—বিলাতে একটী সুন্দরী মেয়ে সংবাদ পত্রে প্রচার কোরেছেন যে যিনি তাঁকে দু'দিনের মধ্যেই খুব কুৎসিৎ আর বৃদ্ধা কোরে দিতে পারবেন, তিনি নগদ তিরিশ হাজার পাউণ্ড পুরস্কার পাবেন। এ বৈরাগ্য কেন? এ পর্য্যন্ত কোন উমেদার তিনি পান নি, এ রকম খাম-খেয়ালী মেয়ে আমাদের দেশে কেউ আছেন কি?

গিনি স্বর্ণের ঘোষ ব্রাদার্স। অলঙ্কার নির্ম্মাতা
১১৪ নং কলেজ ষ্ট্রীট (বহুবাজারের মোড়) কলিকাতা।
যদি নিরবিচ্ছি সময়ে বিবাহের গহনা পাইতে চান, তবে একবার আমাদের দোকানে জিজ্ঞাসা করিয়া পরে অন্যস্থানে যাইবেন। স্বর্ণের সকল রকম গহনা, অর্ডোরা গহনা, আংটী, চেন প্রভৃতি সর্ব্বদা বিক্রয়ার্থে প্রস্তুত থাকে। অর্ডার দিলে ঠিক সময়ে খাঁটী জিনিস পাইবেন। কোনরূপ প্রবঞ্চনা প্রতারণা নাই সকল জিনিসেরই গারাণ্টি দিয়া থাকি। একবার পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

আধুনিক বঙ্গ-সাহিত্য

(শ্রীদুর্গাচরণ মৈত্রেয়)

একদিন Kipling বড় গর্ব্বভরেই প্রাচ্যকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন "The East is East and the West is West, The twain Shall never meet." প্রাচ্যের প্রতি প্রতীচ্যের এই শ্লেষ ও এই প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গ যে কতদূর অসত্য তাহা প্রাচ্য আজ প্রতীচ্যকে বুঝাইয়া দিতে সমর্থ হইয়াছে। প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে ইতালীতে অবস্থান কালে মাইকেল মধুসূদন মহাকবি দান্তের উদ্দেশে একটি ক্ষুদ্র কবিতা রচনা করিয়া ইতালীয়ান ভিক্টর ইমানিউএলকে উপহার দিয়াছিলেন, তাহাতে ইমানিউএল বলিয়াছিলেন "It will be a ring which will connect the Orient with the Occident." তিনি বুঝিয়াছিলেন যে অন্ততঃ সাহিত্যের ভিতর দিয়া যে প্রতীচ্যের সহিত প্রাচ্যের মিলন গীত বাজিয়া উঠিবে তাহা সুনিশ্চয়। তাঁহার অনুমান সত্য হইয়াছে। প্রাচ্যের রবীন্দ্রনাথ আজ বিশ্বভারতীতে স্থান পাইয়াছেন, বঙ্গ সাহিত্য সুদূর য়ুরোপেও সম্মান লাভ করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার পাওয়ায় শুধু বাঙ্গালীর বা ভারতবর্ষের সম্মান বাড়িয়াছে এমন নহে, সমগ্র এসিয়াখণ্ডের গৌরব বর্দ্ধিত হইয়াছে। একশত বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গলা বলিয়া ভাষা থাকিলেও তখন ইহাতে সাহিত্য বলিয়া কোন জিনিষ ছিল না। 'উনবিংশ শতাব্দীর আরম্ভ পর্য্যন্ত বাঙ্গলা সাহিত্যের কাজ ছিল রাজ সভায় স্তুতিগান ও গৃহস্থের ঘরের কথা বলা।' শুধু রাজ সভায় স্তুতিগানে পূর্ণ দুই একটা কবিতা বা আদি রসাত্মক দুই একখানি খণ্ডকাব্য লইয়া একটি সাহিত্য রচিত হইতে পারে না। 'বাঙ্গলা সাহিত্যের গতি' নামক প্রবন্ধে পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে দর্শন, বিজ্ঞান, সমাজতত্ত্ব, শিক্ষা নীতি প্রভৃতি নানা বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গে দেশ বিদেশের চিন্তার সহিত পরিচিত হইয়া সভ্যতা, জ্ঞান ও ধর্ম্মের উন্নতি সাধনের পক্ষে সহায়তা করিতে পারিলেই সাহিত্য যথার্থ সাহিত্য বলিয়া গণ্য হইতে পারে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভকাল পর্য্যন্ত বাঙ্গলা ভাষায় এরূপ সাহিত্যের সৃষ্টি হয় নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এমন কি বঙ্কিমচন্দ্রের অনতি পূর্ব্বে ও সব সাময়িককালেও ইংরাজী শিক্ষিতদলের অনেকের ধারণা ছিল যে সাহিত্যসৃষ্টির পক্ষে বাঙ্গলা ভাষা মোটেই উপযোগী নহে। তখন পর্য্যন্তও অনেকে বাঙ্গলা পুথি পড়া ঘুরে থাকুক তাহার—নাম শুনিলেই নাসিকা কুঞ্চিত করিতেন ও দুই চারিজন নব্য শিক্ষিত ব্যক্তি একত্র হইলেই ইংরাজীতে কথোপকথন করা ভিন্ন বাঙ্গলায় বাক্যালাপ করা লজ্জাজনক মনে করিতেন। যাহা হউক আমাদের আর আজ সে ভাব নাই। বাঙ্গলা ভাষার সেই দুর্দ্দিনে বঙ্কিম, রমেশ, হেম, নবীন প্রভৃতি শক্তিশালী লেখকগণ আবির্ভূত হইয়া ক্রমে ক্রমে নব ভাষাকে পরিমার্জ্জিত ও শ্রীসম্পন্ন করিয়া তুলিয়াছিলেন। "বঙ্কিমের চেষ্টায় সাহিত্যের যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সার্থকতা তাহাই ঘটিয়াছিল, সাহিত্য যেমন একধারে জাতির জীবনাদর্শে গঠিত হইতেছিল তেমনি জীবনও সাহিত্যের নূতন নূতন আদর্শে সঞ্জীবিত ও অনুপ্রাণিত হইয়া উঠিতেছিল।" ('বঙ্কিম-চন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য, প্রবাসী পৌষ ১৩৩০) এবিষয়ে শ্রীযুক্ত গোপালবাবু সাহিত্যের সম্বন্ধে কিছু অতিরঞ্জিত করিয়া বলিলেও বাঙ্গলা ভাষাতেও যে সাহিত্য রচিত হইতে পারে তাহা বঙ্কিমের সময় হইতেই প্রথম বুঝিতে পারা যায়। বর্ত্তমানকালে বাঙ্গলা ভাষার আর সে দৈন্য, সে অভাব ও সে সঙ্কীর্ণতা নাই ; একটি অসংস্কৃত অপরিমার্জ্জিত ও অপরিপুষ্ট ভাষা কেমন করিয়া এত শীঘ্র পূর্ণতা লাভে সমর্থ হয় তাহা বাঙ্গলা ভাষার ক্রম-বিকাশ দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়।

তবে এক কথা আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে বঙ্গসাহিত্য এখন আমরা যতই পরিপুষ্ট হইয়াছে বলিয়া মনে করিনা কেন, আমাদিগকে তাই বলিয়া অধীর হইলে চলিবে না। আমাদিগের সাহিত্যে এখনও অনেক ত্রুটী ও অনেক অভাব রহিয়াছে—সেগুলি দূর করিবার চেষ্টা প্রত্যেক সাহিত্যসেবীরই করিতে হইবে। গোপালবাবু এ বিষয়ে সত্যই বলিয়াছেন "যদিও বঙ্গসাহিত্য বাঙ্গালার বাহিরে সম্মানিত হইয়াছে তথাপি বাঙ্গালার নিজের

দেশে বঙ্গসাহিত্যের স্থান বড় উচ্চে নহে। সাহিত্যকে এখনও আমরা জাতীয় গৌরবের ভূষণ বলিয়া মনে করিতে শিখি নাই।" দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্প সঙ্গীত ইতিহাস প্রভৃতি নানা বিষয়ের প্রচার দ্বারা সাহিত্যের বলবৃদ্ধি পুষ্ট করিতে হইবে। দেশ বিদেশের সাহিত্য ভাণ্ডার হইতে উত্তম উত্তম গ্রন্থ সকল অনুবাদ করিয়া নিজেদের সাহিত্যের সমৃদ্ধি করিতে হইবে, নতুবা সাহিত্য কখনও সম্পূর্ণতা লাভ করিতে পারিবে না। আমাদের বর্ত্তমান বঙ্গসাহিত্য যতই উন্নত বলিয়া মনে করি না কেন য়ুরোপীয় সভ্যজাতিদের সাহিত্যের সহিত তুলনা করিতে গেলে আমাদের অনেক অভাব চোখে পড়ে। বৈদেশিক ভাষার কোন সারবান গ্রন্থের নাম জানিলেই ইংরাজ ফ্রান্স ও জার্ম্মান সাহিত্যিকগণ তাহা অনুবাদ করিয়া নিজেদের সাহিত্য ভাণ্ডারে তুলিয়া রেখেন, ইহাতে জাতীয় জীবনের চিন্তাস্রোতের সহিত অপরের চিন্তাস্রোত মিলিত হওয়ায় সাহিত্য রাজ্যেও তথাকথিত জাতীয় জীবন উন্নতিরই যথেষ্ট উপকার সাধিত হয়। য়ুরোপীয় সাহিত্য কিরূপ প্রসারতা লাভ করিয়াছে তাহা অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার শ্রীযুক্ত ফেলিক্স ব্যাঙ্কোর লেখা হইতে উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন "১৯১১ সালে জার্ম্মেনীতে কেতাব প্রকাশিত হইয়াছিল ৩১ হাজার, সেই বৎসর ফ্রান্সে হইয়াছিল ১১ হাজার আর বিলাতে দশ হাজার, বিলাত ফ্রান্স ও জার্ম্মেনীর তুলনা করিলে আজও ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের অনুপাতই প্রায় রহিয়া গিয়াছে।" (বসুমতী পৌষ ১৩৫০) তৎপর তিনি জার্ম্মান সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত এডিনিয়ারিং পরিষৎ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন "জার্ম্মেনদিগের এডিনিয়ারিং পরিষৎ এক বিপুল বৈজ্ঞানিক সঙ্ঘ, সভ্য সংখ্যা ২৭ হাজার, এই পরিষৎ ৭ খানি সাপ্তাহিক, পাক্ষিক ও মাসিক এডিনিয়ারিং পত্রিকা চালাইয়া থাকেন। কোন কোন পত্রিকার কাটতি ৩৫ হাজার।" ইতালী সাহিত্যেও য়ুরোপীয় সাহিত্যরাজ্যে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। আমাদের সাহিত্যে এরূপ বিপুল প্রচারকার্য্য একরূপ নাই বলিলেও চলে। ইহাতে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে আমাদের বঙ্গসাহিত্য এখনও সম্পূর্ণভাবে জাতীয় আদর্শে অনুপ্রাণীত হইয়া উঠে নাই, আমরা এখনও জাতীয় জীবন ও জাতীয় সাহিত্যে পৃথক পৃথক সত্তার দেখি। তবে আশার বাণী শুনা যাইতেছে আমাদের সাহিত্যেও চিন্তাশীল ও শক্তিশালী লেখকের আবির্ভাব হইতেছে, তাঁহাদের চেষ্টা ও যত্নে বঙ্গসাহিত্য দিন দিন পরিমার্জ্জিত পরিপুষ্ট ও শ্রীসম্পন্ন হইয়া উঠিতেছে এবং দেশ বিদেশে সাহিত্য হিসাবে সম্মান লাভ করিতেছে।

"জীবনে আমি গাইয়াছি যদি অনেক গান
পেয়েছি অনেক ফল ;
সে আমি সবারে বিশ্বজনারে করেছি দান
ভরেছে ধরণীতল।"

কথায় কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ Kipcingএর গর্ব্বোক্তি চূর্ণ করিয়া দিয়াছেন, বঙ্গসাহিত্য আজ বিশ্বভারতীতে স্থান পাইবার উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে।

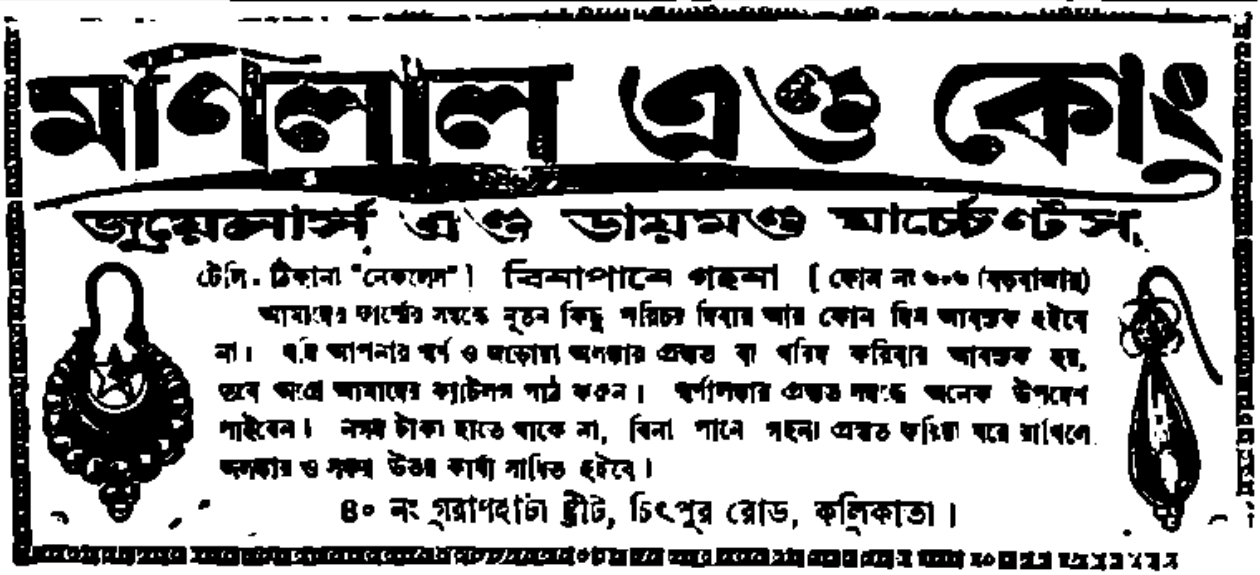

চিঠির জবাব।

[শ্রীযতীশ মিত্র]

(২৭শ সংখ্যায় প্রকাশিত 'স্ত্রীর পত্রের' উত্তরে)

তোমার বিদায় পত্রের মর্ম্মান্তিক নিঃশ্বাস ভরা,—আগুন দিয়ে লেখা পত্র;—হাতটা কাঁপছে,—ওঃ লেখা গুলো জলন্ত আগুনের হুল্‌কি গায় মেখে সত্যি কিন্তু উন্মাদনার চোখের সামনে নেচে বেড়াচ্ছে।

আজ অসীম দূরত্বের ওপারে দাঁড়িয়ে তুমি—আর তোমায় বর্জ্জে পার্ব্বো না! তোমার এ ব্যথা দেবার একটুকু শাস্তিও দিতে পার্লেম না! খুব হাস্‌ছো? ওঃ—তোমার ও মর্ম্ম ভেদা হাসির অট্টরোলে—আমার কাণ বন্ধ হয়ে গেল যে

আমি পুরুষ হয়ে সৃষ্ট হয়েছি;—তুমি এসেছিলে—নিঃস্বার মত সকল অধিকার—বিচ্ছাতী—রিক্তা নারীর সাজে। তোমায় আমি সহধর্ম্মিণী বলে বরণ করেছিলাম কই,—আমার পাশে ত তোমায় আমি সে দিন দেখিনাই! প্রভেদ,—তোমায় আমায় কত প্রভেদ!

তুমি আমার দিকে চেয়েছো—আমি আমার চোখ ফিরিয়ে নিয়েছি। তুমি অমৃতের অক্ষয়ভ পাত্র হাতে নিয়ে আমার সাম্‌নে দাঁড়িয়েছ,—আমি কুলিশ হাতে তোমার পিঠ ক্ষত-বিক্ষত করে' দিয়েছি। তুমি আমার জন্য—প্রাণপণে শান্তির কমনীয় নিবিড় কুঞ্জ গড়তে গিয়েছ—আমি আপ্রাণ চেষ্টায় তাকে পায়ে দলে ধুলো ধুলো করে দিয়েছি। আমার দেওয়া অপার বেদনা—বুক পেতে নিয়ে আমারি পিশাচ বুকে সুধার সন্ধানে—দুই হাত মেলে আমায় আকড়ে ধরেছ,—আর আমি,—ওঃ!

আজও সেই পার্থক্য। তার চেয়েও বেশী। তোমার মুখে আজ কথা ফুটেছে,—আমি আজ মূকবাক্! পূর্ণ যৌবনের মহিমা সম্পদে বিভূষিত তুমি—আমি অনুতাপ জর্জ্জরিত অভিশপ্ত নারকী! তুমি বিজয়উল্লাসে কিপ্রপদে ছুটে চলেছ;—আমার বাধা দেবার সামর্থ নেই,—চির উদ্যত নিষ্ঠুর হাতও আজ পক্ষাঘাত গ্রস্ত। আমরা এক আত্মা—এক প্রাণ, এক ধর্ম্মি এই কি তার অভিব্যক্ত স্বরূপ! ভগবান কি এমনি করেই দুজনের পার্থক্য শিকলে আমাদের মহামিলনে এটে দিয়েছিলেন—? না, না হায়, আজও আত্ম প্রবঞ্চনা? ব্যবধানের এ বিরাট প্রসারি মহাসাগর—এ তো আমারই হৃদয়হীনতার আপন হাতে রচিত!

কোন্ দিন ভুল খেয়েছিলে—অমৃত পুরীর তোরণ-দ্বারের সন্ধানে। স্বর্গের রুদ্ধকবাট সেদিন অর্গল মুক্ত করেন নি বিধাতা, তোমাকে স্বার্থপর খেয়ালী পুরুষের সাম্‌নে চরমমূল্য বিনিময়ে—নারীর অধিকার সপ্রমান কর্ত্তে হবে বলে।

তোমার বর্ণিত আগাগোড়া জীবনের প্রত্যেকটী কথা আমার পাষান বুকের প্রত্যেক কক্ষে ঢুকে এমন অস্থির করে তুলছে। দেবী তুমি—অব্যাহত তোমার গতি। প্রেমিকা তুমি অমোঘ তোমার সাধনা। তোমার ওই অমূল্য মর্ম্মান্তিক অবদান—আমাকে চরম মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত বইতেই হবে।

দাঁড়াও ঐ অন্তরীক্ষ হতেই শুনে যাও এই হতভাগ্যের অধম পশ্চাতের দুইটী কথা। প্রাণ খুলে বলবে। তুমি যে আমার; আমার প্রাণের অধিক; আমার সর্ব্বস্ব! আমার যত তৃপ্তি কামনা—তা তো তোমারই উন্মুখি কি—শুন্‌বে না? হাস্‌ছো।—আমার উপেক্ষা! ওর ওষুধ আমি জানি; রোসো'—'এই খা' নাখি—! একি আমি কি পাগল!

আমি কেমন ছিলেম—তা মনে নাই। লেখা পড়া আমার শেখা হয় নাই। বই পড়া বিদ্যা যা একটু পেয়েছিলেম, তাতে ভিতরের পশু—অন্ধকার, স্বার্থপরতা অবিবেচকতা—আরো স্পষ্ট রূপেই আমায় পেয়ে বসেছিল। আমার পরিচালক ছিল—মদ, আবিলতা, আর চরিত্রের সব চেয়ে নীচ আদর্শ। বাবার অর্থ ছিল—আমার প্রতি তাঁর কর্ত্তব্য বোধ বিন্দুমাত্রও ছিল না। দু'খানা বই তাও ভাল করে না পড়িয়েই ভেবে নিয়েছিলেন—পাঁচ হাজার টাকার অস্থাবর সম্পত্তি তৈরী হলো তাঁর।

বাংলা দেশে লক্ষ ছেলের মধ্যে আমিই তোমার বাবার দৃষ্টি কেড়ে নিলেম। দক্ষিনা স্বরূপ বাবা শ্বশুরের

শেষ কপর্দ্দক হাত পেতে নিয়েও আশা মেটাতে পার্লেনা। বাবা-মা তোমাকে চান নি ত তাঁরা চেয়েছিলেন তোমার বাবার বুকের রক্ত। তাইত তোমার দিকে তাঁরা ফিরেও তাকান নি। আর আমি? আমি যে পংক্তরাম্বেরও উপর; তাঁর মত শুধু পিতৃপরাধন নই। বাবা মা উভয়ের প্রতিই যে আমার অপরাধ অনুরক্তি। তোমায় আমি ভালোবাস্‌বো কেন?

সেবার বাড়ীতে পুলিশ এসেছিল;—তুমিই আমায় বাঁচিয়েছিলে। আমার দোষ অস্বীকার করে'—আমার জন্য মিথ্যা কথা বলেও। এবারও ত' ওই পুলিশ এলো বলে'। এবার কে রক্ষা কর্ব্বে? এবার যে তোমারই প্রতিশোধ পরায়ণ ক্ষুব্ধ আত্মা পুলিশের কাণে কাণে আমার সমস্ত গুপ্ত প্রকাশ করে' দেবে! বাঁচবার এক পথ—দেবি ক্ষমা প্রার্থনা—; একি ক্ষমা চাওয়ার কথা মনে হতেই—শরীরটা এমন করে কেঁপে উঠে যে। আমার অপরাধ—ক্ষমা লাভের অনেক—বাইরে! তাই হোক; —অত বড় দারুণ পাপের প্রায়শ্চিত্ত না হলে' পৃথিবী উল্টে যাবে! হোক প্রায়শ্চিত্ত;—আমি বাঁচতে চাই না।

কিন্তু অত গুরু অপরাধ মানুষের আইন তার পরিমাপ কর্ত্তে পার্ব্বে ত'? মানুষের ক্ষুদ্র কঠোরতা আমার অপরাধের যোগ্য শাস্তি কল্পনা কর্ত্তে পার্ব্বে ত'?

আবার আমার বিয়ে! বিচার গৃহের কোনায় অপরাধীর কাঠগড়া ঘিরে বিবাহ সভা সজ্জিত হয়েছে; কারাগারের রুদ্ধ অন্ধকারে ঐ উপযুক্ত মুলনজ্জা রচিত।

তোমায় সৎকার কর্ব্বো। তুমি প্রাণের ধন—তাই প্রাণের মধ্যেই যত্নে তোমার জন্য চিতা জেলে দিয়েছি। জ্বলুক ধিকি ধিকি। আকাশের কোলে তোমাদের 'যুগ যুগান্তরের সঞ্চিত জমাট বাঁধা ব্যথা ভগ্নশ্বাস—যতদিন না—আমার মাথার ভেঙ্গে পড়ে'—এমনি জ্বালাময় এমনি ভয়ঙ্কর জ্বলুক এ চিতা।

ডিঃ গুপ্ত এণ্ড কোম্পানীর

(১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত)

যকৃত সংশোধক মিশ্র

পরিপাক যন্ত্র সমূহের মধ্যে যকৃত যে সর্ব্বপ্রধান এবং যকৃতের ক্রিয়া স্বাভাবিক থাকিলে কোন রোগই যে আক্রমণ করিতে পারে না এ কথা সবাই জানেন। নানা কারণে এই যকৃতের ক্রিয়াবিকৃতি ঘটে। হাত পা চোখ জ্বালা, মুখমণ্ডল, অগ্নিমান্দ্য, কোষ্ঠবদ্ধতা, অজীর্ণ, রক্তবমন প্রভৃতি, এই সব উপসর্গ ঘটিলেই আমাদের যকৃতের ক্রিয়া শোধক মহৌষধ "যকৃত সংশোধক মিশ্র" ব্যবহার করুন। ফল অদ্ভুত। ছোট শিশি আট আনা। মাঝারি এক টাকা। বড় দেড় টাকা। ডাকব্যয় স্বতন্ত্র।

ডিঃ গুপ্ত এণ্ড কোম্পানী

৩৮৯ নং অপার চিৎপুর রোড, (জোড়াসাঁকো) অথবা ১৩ নং এসপ্লানেড্ (ধর্ম্মতলার মোড়) কলিকাতা।

ইলেক্ট্রো আয়ুর্ব্বেদিক গার্হস্থ্য ঔষধাবলী

পকেট বক্স মাত্র ৭টী ঔষধ মূল্য

ইহা দ্বারা সকল রোগ আরোগ্য করা যায়। বিনামূল্যে চিকিৎসা প্রণালী পুস্তকের জন্য পত্র লিখুন। ইলেক্ট্রো আয়ুর্ব্বেদিক ফার্ম্মেসী, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা।

সুলেখিকা শ্রীসরসীবালা বসু

প্রণীত—

নূতন উপন্যাস বাহির হইয়াছে

রেখা ১৷৷০ শুকতারা ১৷৷০ প্রেয়সী ১৷৷০

প্রায়শ্চিত্ত ৸০ বাঙ্গালী পল্টন ৷৷০

চক্রকার উৎসব ১৲ প্রতিষ্ঠা ১৲

প্রাপ্তিস্থান—

প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে ও

বাণীকুটীর, শিয়ালদহ।

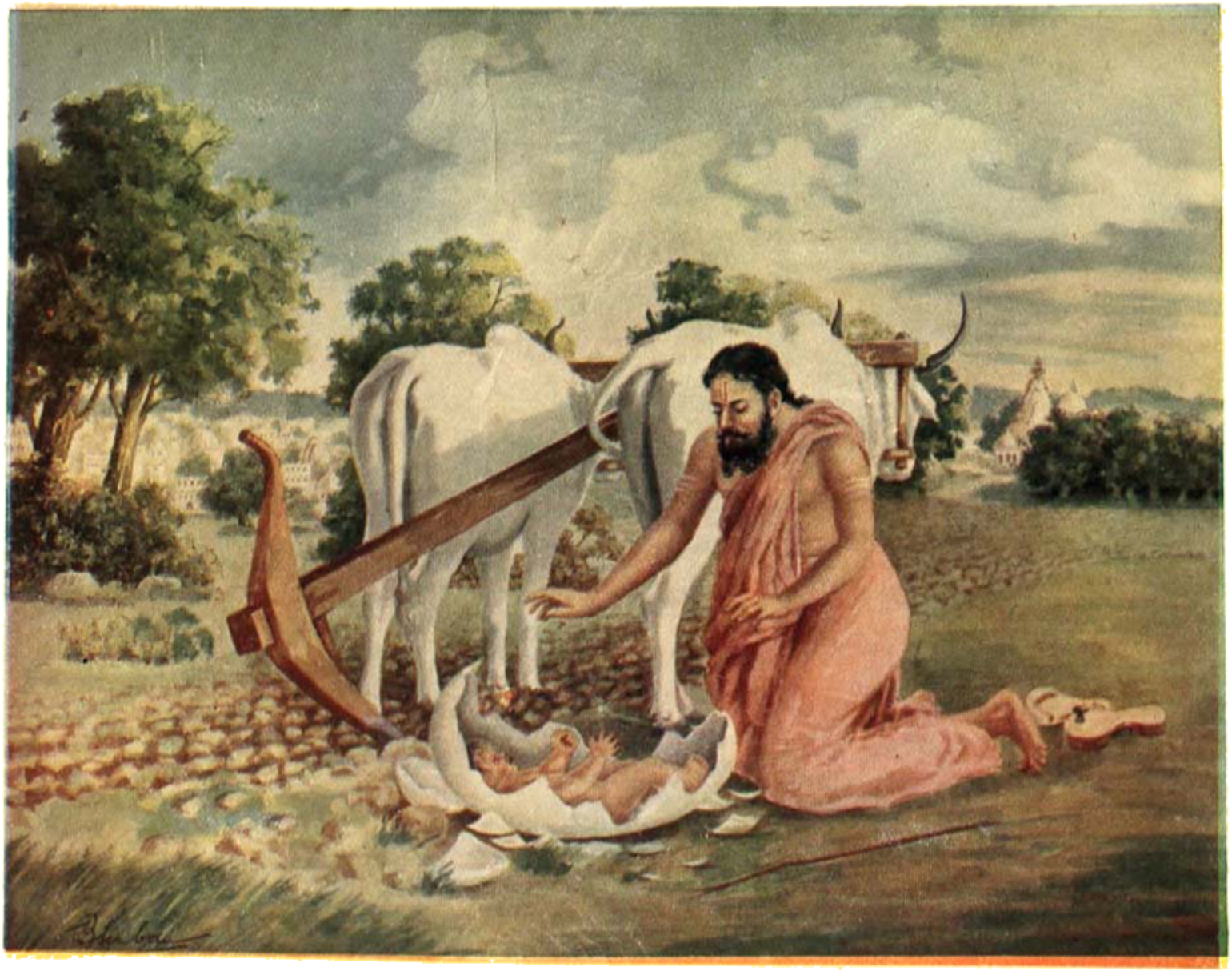

সীতার জন্ম

সচিত্র সাপ্তাহিক পত্রিকা

বাসন্তী

২য় বর্ষ] ৪র্থী ফাল্গুন শনিবার ১৩৩০, ইং ১৬ই ফেব্রুয়ারী [৩০শ সংখ্যা

অফিসের কেরাণী

অফিসের Late কাটিবার ভয়ে তাড়াতাড়ি নাকেমুখে গুঁজে ভুলে জামাটা পড়েছেন উল্টা, চাকরির বদলে বাটাই লইয়া চলিয়াছে তাহাতেও লক্ষ্য নাই হন্ হন্ করে চলেছে ১০টার মধ্যে অফিসে পৌছান চাই তা না হলে Late fine হবে—

মাধুরী

[শ্রীযুতী সুধা দেবী]

শ্রাবণ সন্ধ্যা। আকাশে ঘন কাল মেঘ ধম্ ধম্ করে ঠিক যেন প্রিয়ার অভিমানভরা মুখখানির মত ধরণীর পানে আনত নয়নে চেয়ে আছে আর তারই সেই ক্ষুব্ধিত নয়ন থেকে ঝরে পড়ছিল, শ্রাবণের অবিশ্রান্ত ধারা—ঝুপ্ ঝুপ্ করে। সামনের বাগান থেকে মাঝে মাঝে একটী দমকা আলো হাওয়া ঘরের মধ্যে ঢুকে যেন হা হা করে কেঁদে কেঁদে ফিরে যাচ্ছে। এ যেন কোন বিরহিনীর কত শত দুঃখের বুক ভরা জমাট ব্যথা আজ অশ্রু হয়ে ঝরে প'ড়ছে। এ ব্যথার কাঁদন তবুও থামেনি—ফুলের সাথে মনে দমকা হাওয়ার সাথে ভেসেও। সে দিনটা আমার বন্ধু মহলের প্রায় সকলেই এসে জুটেছে। আমাদের বাড়ীতে ঘরে মত একটী আড্ডা জমে উঠেছিল। কেউ বা তাসের আসর জমিয়ে তুলেছিল কেউ বা আবার রেডিওর আওয়াজে ঘরটা ভরিয়ে তুলেছিল। মুকুরের কিন্তু এ আসরে মন ঠিক জমে উঠেনি তাই সে খোলা জানলার দিকে চেয়ে চেয়ে সুর ধরেছিল—"কেমন করে কাটবে আমার এমন বাদল বেলা।" সমীর মুকুরের সুর শুনে খেলা ফেলে উঠে এসে বল্লে—এই, সব খেলা বন্ধ কর আর নয় হয়েই হয়েছে বলেই মুকুরকে বল্লে আজ তোকে কিন্তু এই রকম দিনটা জমিয়ে তুলতে হবে তোর সত্যিকার ব্যথার সুরে। মুকুর ছিল আমাদের বন্ধু মহলে একজন সাহিত্যিক। কবীন্দ্র রবীন্দ্রের একনিষ্ঠ ভক্ত। সমীরের কথায় সকলেই বলে উঠলো তাই বেশ হবে। মুকুর খোলা জানালার দিকে তখনও চেয়েছিল। আমাদের কথা শুনে সে হেসে বলে উঠলো সত্যি তা বলে আমার জীবনের ওপর দিয়ে এমন কিছু বয়ে যায় নি যা তোরা মন দিয়ে শুনবি। জীবনে যা কিছু সুন্দর আমার পেয়েছি তা কল্পনায় কিন্তু তোরা তাও পারবি না। মুকুরের কথা শুনে সমীর বল্লে এই মুকুর, অত ভাল ছেলে হ'লে চলবে না আজ কিন্তু তোকে সেই কথাটা বলতে হবে, মনে হয় এক দিন সেই যে তুই বলেছিলিস তুই যে বিয়ে করিসনি তার একটী কারণ আছে। আজ কিন্তু তোকে সেই কারণটী বলতে হবে। সমীরের কথা শুনে আমরা সবাই তাকে ঘিরে বসলুম। তখন সে বল্লে —আচ্ছা তবে শুন বলি—বলেই ভাল হয়ে বসে বলতে সুরু করে দিল।

সে আজ অনেক দিনের কথা। প্রায় ছ'বছর হতে চল্লো। আমি তখন সবে মাত্র আই-এস-সি পাশ করে mechanical পড়তে সুরু করেছি। তখন জীবনটাকে বেঁধে ফেলেছিলুম ঠিক ঘড়ির কাঁটার সাথে। একটুও এ দিক ওদিক হবার যো ছিলনা। রোজই সকালে সাতটায় আমার ক্লাস attend করতে হত। জীবনটা প্রথমে বড় খারাপ গেলেছিল। ভেবেছিলুম এত আমার দ্বারা পোষাবে না। ভাগ্য হঠাৎ আমার বদলে গেল, works manager এর নজরে পড়ে গেলুম। সাতটায় হাজরী আমার তুলে দিয়ে ন-টার মধ্যে হয়ে গেল। কিছু দিন এমনি করে যাবার পর হঠাৎ এক তরুণীর সঙ্গে দেখা Tram এ। বয়স যে তার কত ঠিক তা অনুমান করে বলা চলে না; তবে এপর্য্যন্ত পারি যে সে যৌবনের প্রথম ধাপে সবে মাত্র পা দিয়েছে। তার সারা দেহে যৌবন তরঙ্গ উছলে উঠেছে। মুখে তার কোমলতা মাখান। চোখে মাদকতা ভরা প্রথম দিন তাকে দেখে ভাবলুম এই বুঝি ভাবুকের কল্পনা সুন্দরী এই বোধ হয় ভগবানের শ্রেষ্ঠ দান। সেই দিনই ইচ্ছে হ'ল তার সঙ্গে কথা বলি কিন্তু বলা হল না।

এমনি করে রোজই দেখা হ'ত কিন্তু কথা বলা আর হতো না। প্রায় মাস খানেক কেটে গেল, তবু তার সঙ্গে কথা বলা হয় নি, বলতে গিয়ে ফিরে এসেছি।

অনেক দিনের আমার পথ চাওয়া প্রতীক্ষা হঠাৎ একদিন সফল হল। আর এক মাস ধরে যার সাথে দুটো কথা বল্‌বার জন্যে প্রাণ ব্যাকুল হয়েছিল আজ তা সার্থক হ'ল।

সে দিনও এমনি ধারা বৃষ্টি পড়ছিল। তাই গাড়ী থেকে বেরুবার সময় বরসাতীটা নিয়ে বেরতে ভুলিনি। পথে আসার সময় ভেবেছিলুম হয় ত তার সঙ্গে দেখা হবে না। হয় ত বৃষ্টির জন্যে সে বেরুবে না। tramএর সময়ও জানা ছিল। সে যেখান থেকে রোজ উঠতো সেখানে গাড়ী থামতেই হঠাৎ বাতাসে কেঁপে ওঠা গাছের পাতার মত আমার প্রাণও দুলে উঠলো। ইচ্ছে হ'ল কিল্‌খিলি নাড়িয়ে দেখি সে আসছে কি না। তারপর কিলখিলি নাড়িয়ে দেখতেই দেখি সে গাড়ীতে উঠবার জন্যে এগিয়ে আসছে। বল্‌তে কি প্রাণটা স্থির হ'ল। তাকে সুস্থ হ'তে দেখেই আমার তৃপ্তি!

কিছু দূর যেতেই বৃষ্টি একটু জোরে পড়তে সুরু হ'ল। সে কিন্তু ছাতা আনে নি, কি করে গাড়ী Change করবে তাই আমি ভাবছিলুম। মনে হ'ল আজ বুঝি বা ভগবান আমার প্রতি সদয়। ভাবলুম তাকে আমার বরসাতীটা দেব। কিন্তু এই দেব কথাটি ভাবতেই প্রাণটা আমার কেঁপে উঠলো। যেই গাড়ী এসে থামলো, সেও নামবার জন্য উঠে দাড়ালো। তখন বৃষ্টি বেশ জোরে পড়ছে আমি তার পাশে গিয়ে বল্লুম—ও আপনি এই জলে কি করে নামবেন গাড়ী থেকে। এই নিন আমার এইটে গায়ে দিন্ অবশ্য যদি আপনার আপত্তি না থাকে—বলেই তার দিকে সেইটে এগিয়ে দিলুম। আমার কথা শুনে তার সেই সুশ্রী-সুন্দর মুখখানি আবার লজ্জায় লাল হয়ে উঠলো। সে আমার কথার বাধা দিয়ে বল্লে না না আমার দরকার নেই—আর———সে আরও কি বলতে যাচ্ছিল কিন্তু আমি তাকে কথা বলবার অবসর আর না দিয়ে নেমে পড়লুম। সেও তখন ধীরে ধীরে আমার বরসাতীটা গায়ে ফেলে নেমে এলো।

গাড়ীতে যখন উঠে বসলুম তখন সে বরসাতীটা মুড়ে আমার কাছে রেখে বল্লে—দেখুন দেখি, আপনার সমস্ত ভিজে গেছে। এ-পারাদিন ঐ ভিজে সার্ট পরে কি করে থাকবেন বলুন তো—কেন আপনি আমার জন্যে এত কষ্ট ভোগ করতে গেলেন। তার কথা শুনে আমি বল্লুম—আর আপনি বুঝি ভিজে কাপড়ে সমস্ত দিন থাকবেন। এতেই বুঝি আমার খুব সৌরুখ হবে।

আমার কথা শুনে সে আর কিছু বল্লে না শুধু তার সেই সুন্দর মুখখানি বর্ষা ভেজা যুঁই ফুলের মত কি জানি কেন হঠাৎ নত হয়ে পড়লো। মনে হল হয় ত তার কচি বুকে কৃতজ্ঞতার ধারা কন্যার মত বয়ে গিয়েছিল।

এমনি করে আমার সঙ্গে কথা বলতে বলতে সে কিছুদূর এল। সেই দিন তার মুখে শুনলুম সে ডাক্তারী পড়ছে। এইবার আই-এস-সি পাস করেছে। তারপর তাকে আর বেশী কিছু জিজ্ঞাসা করিনি; কেবল Tram থেকে নামবার সময় একটী নমস্কার করে নেমেছিলুম। আর সেও তার প্রাণের সমস্ত লজ্জা দিয়ে একটী ছোট্ট প্রতি নমস্কার করেছিল। এমনি করে হঠাৎ আলাপ হতে আমার প্রাণে একটী পুলক শিহরণ জেগে উঠলো। সে দিন সমস্ত ক্ষণ আমার কিছু ভাল লাগে নি কেবলই তার সুন্দর মুখ খানি একটু বেশী করে ব্যক্ত করে তুলেছিল। আমি কেবলই অন্যমনস্ক হয়ে বসেছিলুম, সে দিন অনেকে আমার অনেক কথা বলেছিল।

বাড়ী এসে স্নানাহ্নিক কত কি তৈরী করেছিলুম আজ ও তা মনে হলে প্রাণ কেঁদে ওঠে কিন্তু তখন কি জানতুম এ শুধু কবির কল্পনা। সুদূর মেঘের ঘর মেঘে মিলিয়ে যাবে হঠাৎ বাতাসে আর আমি শুধু নির্নিমেষ নয়নে মুগাহত সৈনিকের মত, ঘুরে ঘুরে ছড়িয়ে-পড়া মেঘের দিকে চেয়ে থাকবো?

সেই দিন থেকে তার সঙ্গে আমার পরিচয়ের ধারা ক্ষুদ্র-নদীর মত আমাদের দুজনের প্রাণে বয়ে যেতেছিল। আমাদের অজ্ঞাতে রোজই আমাদের দেখা হ'ত, দুজনে কত কথা হত শুধু আধ ঘণ্টার জন্যে। তারপর সমস্ত ক্ষণ বিচ্ছেদ? কেউ কারো দেখা পেতেম না।

এমনি করে কিছু দিন যাবার পর একদিন Tramএ উঠবার সময় হঠাৎ তার হাত খানি ধরে তাকে তুলে নিয়ে ছিলুম। সে কিন্তু আপন হতেই আমার দিকে হাতটী বাড়িয়ে দিয়েছিল। গাড়ীতে লোক ছিল জন্য;

তারা বন্ধুকের মত আমাদের দিকে চেয়েছিল বিশেষ করে আমার বন্ধুটীর দিকে। তাদের চাউনীতে বন্ধুর আমার আকর্ষণীয়া হয়ে উঠলো, সে মুখ খানি কল ভাবে ঝুলে পড়া গাছের মত নত করে রেখেছিল। সে দিন আর কোন কথা হয়নি আমাদের। আমি লজ্জায় চুপটী করে বসেছিলুম মনে মনে ভাবলুম এ বোধ হয়ই অন্যায় করেছি পাড়ী থেকে তাড়াতাড়ি নেমে পড়েছিলুম। Work shop এ এসে নানান কথা মাথার ভেতর ঘুরে উঠেছিল এমন সময় আমাদেরই ঘরের একটী ছেলে হেসে হেসে আমায় বল্লে—কি 'দাদা কেমন চলছে? খুব যা হ'ক Romance গড়ে তুলেছ। কোথা থেকে পাকড়ালে দাদা? তার কথা শুনে আমার সমস্ত মুখ লাল হয়ে উঠলো লজ্জায় শরীর শিথিল হয়ে গেল। আমি তখন হেসে বল্লুম—কি যে পাগল হলে নাকি। কি পাগলের মত বক্‌বক্ করছে। সে তখন হেসে বল্লে আর দাদা লুকোও কেন চোখে দেখেছি এত দিন আমি বিশ্বাস করি নি কাকা আওয়াজ বলে উড়িয়ে দিয়েছি আজ আর পালাতে পারবে না।—বলেই সে খুব হাসতে লাগলো! তার কথা শুনে আমি বন্ধুর কি বলছিল তাত আমি একটুও বুঝতে পারলুম না। তোর হেয়ালী বোঝা দায় যা বলবি তা একটু স্পষ্ট করে বল। আর দাদা—তাক কেন তোমরা কবি মানুষ তাই এ আট পৌরে কথায় কোন কথা বল্লে তোমরা বুঝতে পার না আমরা ত আর তোমার মত কবি নই দাদা। তা বলি ও কাণাখাঁ তরুণীটি তোমার কে দাদা, যার কোমল স্পর্শনতা ঘরে গাড়ীতে উঠলে? বলি এবারই কি আসর জমাবে নাকি? আমরা কি ওর রসালাপে বঞ্চিত হব। মাঝে মাঝে একটু আধটু ভাগ দিও আমাদের!

বলেই সে আমার দিকে চেয়ে বিদ্রূপের হাসি হাসতে লাগলো। তার কথা শুনে আমার সারা গা ঘৃণায় শিউরে উঠলো আমি তাকে বল্লুম—দেখ সুধীর আজ যা বলি বলি আর কখনও বলিসনে। ইয়ারকির একটা সীমা আছে, আমি ও রকম অশ্লীল ইয়ারকি তোর সঙ্গে করতে চাইনে। ফের যদি কখনো শুনি ত ঘুষিয়ে মাথার খুলি উড়িয়ে দেব তোর। বলেই আমি তার কাছ থেকে উঠে চলে গেলুম। সেই দিন থেকে সুধীর আমার শত্রু হয়ে দাড়ালো। সেই দিনই সে Work shop এ সমস্ত ঘটনা সকলের কাছে বেশ রং চং করে দিল। তা হলেও সে আমার বেশী কিছু করতে পারেনি, তার সমস্ত অভিযোগ বাতাসে ভেসে যাওয়া ঝড়ের মতই ভেসে গিয়েছিল।

তারপর আমাদের দিন যতই যেতে লাগলো আমাদের মনের টান ততই নিবিড় ভাবে বেড়ে যেতে লাগলো। স্কুলের কেরত প্রায়ই তাদের বাড়ীতে যেতুম। কত দিন Work shop এ attend না করে তার সঙ্গে কত উদ্যান ভ্রমণে যে বেরুতুম তার ঠিক ছিল না কিন্তু তবুও আমরা দুজনে মনের কথা কেউ কাউকে জানাইনি। আমি যে তাকে ভাল বাসি অবশ্য বন্ধু হিসেবে তা আমিই জানতুম কিন্তু সে যে আমাকে ভালবাসে কিম্বা আমায় ভাল বাসতে পারে এ কথা আমি একদিনও ভাবিনি।

সে দিন ছিল শনিবার। আষাঢ়—সন্ধ্যা সবে মাত্র ঘনিয়ে এসেছে। ঝুপ ঝুপ করে বৃষ্টি পড়ছে, জিমে মাটীর গন্ধে বাতাস ভরে উঠেছে। তার পড়বার ঘরে বসে ছিলুম আমার দু'জনে পাশা পাশি। দু'জনে গল্প করছি এমন সময় তার ছোট বোন লীলা এসে বল্লে মুকুর বাবু শুনেছেন আমরা শীঘ্রী Change এ যাচ্ছি। এবার কিন্তু আপনার সঙ্গে আমার অনেক দিন দেখা হবে না। শুধু দিদিই যাবেন। মা কত বল্লেন দিদি তবুও যাবে না। কি যে দিদির পড়াশুনা এখন বেশী তা ত বুঝি না। আচ্ছা মুকুর বাবু আপনার নূতন যে সব কবিতা গল্প লেখা হবে তা ত আর এখন পড়া হবে না। শুধু এখন দিদিই ত পড়বে। আপনাকে কিন্তু পাঠিয়ে দিতে হবে আমার কাছে—বলেই কিজানি কিসের জন্যে ঘর থেকে চলে গেল। মাধুরী এতক্ষণ কোন কথা বলে নি। চুপটী করে বসেছিল। তারপর হঠাৎ আমার দিকে চেয়ে বল্লে—আচ্ছা মুকুর বাবু আপনি কি জন্যে আমার কাছে রোজ আসেন বলুন ত? তার মুখে এই কথা শুনে আমি অতি মাত্রায় বিস্মিত হয়েছিলুম, কারণ এটা আমার খুব বিশ্বাস ছিল যে তাদের বাড়ীতে আমার এই আসা যাওয়ায় সকলেই সুখী বই অসুখী নয় আর সে ত নয়ই। আর এটাও যেন লক্ষ্য করে ছিলাম যে

আমায় দেখলে তার সারা দেহে আনন্দের ঢেউ খেলে যায়। তার সুন্দর মুখখানি আনন্দে উজ্জ্বল হ'য়ে ওঠে যেন সারাটী ক্ষণ আমারই প্রতীক্ষায় বসে আছে। কোন কারণে যদি দু'চার দিন তাদের বাড়ী না গিয়েছি তবে কত অনুযোগ দিয়েছে সে। কিন্তু আজ তার মুখে এ কী নিষ্ঠুর পরিহাস না কঠোর সত্য। একে আমি কি বলবো কি ভাববো কিছুই বুঝে উঠতে পারলুম না। এক ঝলক রক্ত যেন এসে আমার সারা মুখে ছড়িয়ে পড়লো। কি যে উত্তর দেবো তা ঠিক ভেবে উঠতে পারলুম না। কোন কথাই মুখে এলো না। মনে হল হয়ত মাধুরী ভাবে যে আমি তাকে পাবার জন্যে ব্যস্ত হয়েছি তাই তার এ বিদ্রূপ। অপরাধীর মত ব্যথিত ক্ষুব্ধ চিত্তে, আমি বল্লুম "আপনি ত আমাকে আসতে বলেন তাই আসি—উপযাচক হয়ে ত কোন দিনই আসি নি আর এখানে আসা যাওয়ায় যে আপনি বিরক্ত হবেন তা যদি জানা থাকতো তা হলে বোধ করি আসতুম না। আর যদি দোষই করে থাকি তাহলে বন্ধু বলে কি ক্ষমা করতে পারেন না। আজকের মত ক্ষমা করুন কাল থেকে আর আসবো না! বলেই আমি যেমন উঠতে যাবো অমনি সে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে আমার যাবার পথে দাঁড়িয়ে বল্লে আমায় তুমিই ক্ষমা কর। তুমি যে এতটা মনে করবে তা আমি ভাবিনি। আর কিছু সে বলতে পারলে না, চোখ তার জলে ভরে উঠলো, কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে গেল। আমার হাত দুটী নিজের হাতের মধ্যে চেপে ধরে মাথা নত করে শিশুর মত কেঁদে উঠলো।

সেই দিন প্রথম তার মুখে তুমি সম্বোধন শুনে প্রথমটায় বিস্ময়ে হত বুদ্ধি হয়েছিলুম কেননা এতটা ত আমি আশা করিনি। আমার মত সেও যে প্রাণের মধ্যে ভালবাসার পবিত্র নির্ঝরটী গোপনে লুকিয়ে রেখেছিল তা ত আমি জানতুম না। সে যে আমাকে ভালবাসতে পারে তেমন আশা আমি কখনও করিনি। ধীরে ধীরে আমার পরিত্যক্ত চেয়ারখানাতে বসে পড়ে তাকে পাশে বসালুম। তারপর তার আরক্তিম মুখখানি তুলে ধরতে সে বলে বল ক্ষমা করেছ আমায়। আমি তার মুখখানি বুকের মধ্যে চেপে ধরে বল্লুম—না আমি তোমায় ক্ষমা করিনি তার এই শাস্তি।"——। নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে সে হেসে বলে "যাও তুমি ভারি দুষ্টু!

মানুষের যতক্ষণ নেশার ঘোর থাকে ততক্ষণ সে বেশ সুখেই থাকে তারপর যেই নেশা কেটে যায় অমনি যে কে সেই। আমারও ঠিক সেই রকম হ'ল। মাধুরীকে পাওয়া যে আমার দিক থেকে কত বড় শক্ত তা আমার জানা ছিল না, কিন্তু যেমন তার সমস্ত বুকের কথা লুকিয়ে রাখে নিজের কাছে ওধরা দেয় না আমারও ঠিক তেমনি হ'ল। মাধুরীকে যে আমি একান্ত আপনার করে পেতে চাই, একথা আমি এত দিন বুঝতে পারিনি। সেই দিন থেকে আমি বুঝলুম মাধুরীর মূর্ত্তি আমার হিয়ার পরতে পরতে বুকের মাঝে ফুটে উঠেছে। আমি যেন তার মুখ থেকে এই কথাটী শুনবার জন্যে অপেক্ষা করছিলুম কিছু দিন থেকে যে সে আমায় চায়।

এরপর কিছু দিন যায়। তারপর যখন বুঝলুম যে আমার বাপ মা এ বিয়েতে মত দেবেন না তখন বিয়ের আয়োজন গোপনেই ঠিক করেছিলুম।

এমন সময় সুধীর এসে বাবার কাছে সমস্ত কথা বলে দিলে। বাবা রাগে আগুন হয়ে উঠলেন, মা চোখের জলে মাথা ভিজিয়ে দিয়ে বল্লেন—লক্ষী বাবা মাতটী তুই দিস্‌নে। ঘরে টেঁকা দায় হলো। কিন্তু তবুও আমি অচল অটল রইলুম।

বিয়ের দু'দিন আগে মাধুরীর কাছে গিয়েছি। আমার কাছে এসে সে দাঁড়ালো। মুখ তার ম্লান, চোখ দু'টী লাল যেন অনেকক্ষণ কেঁদেছে। তার চেহারা দেখে আমি চমকে উঠলুম। তার হাত ধরে বল্লুম মাধুরী তোমার কি শরীরটা আজ ভাল নেই। তার চোক সজল হয়ে উঠলো। নিজেকে তাড়াতাড়ি সামলে নিয়ে একটু বল্লে—কই না ত। তবে তোমায় এমন দেখাচ্ছে কেন। ও কিছুই না বলেই সে চুপ করে আমার হাতের আঙুল নিয়ে খেলা করতে লাগলো। তার মুখের চেহারা তখনও যেন জানিয়ে দিচ্ছিল যেন ভিতরে কিছু দমন করবার জন্যে প্রাণপণে চেষ্টা করছে।

কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ বল্লে—দেখ আজ আমি পশ্চিমে যাচ্ছি আমার এক বন্ধুর খুবই অসুখ। যত শীঘ্রী পারি

ফিরে যাবো। আমি বন্ধুর সে কি পরও যে বিয়ের দিন ঠিক হয়েছে। সে বিষাদ মুখে বলে কি করি বল না গেলে নয়। আচ্ছা তাই যদি বলে তাকে একবার বুকের মধ্যে চেপে ধরলুম। আবার তার দুচোখ দিয়ে জল পড়ে আমার বুক ভাসিয়ে দিল। আমি ভাবলুম এই পশ্চিমে যাওয়া ও বন্ধুর অসুখের জন্যে তার মন তাই এত ভারাক্রান্ত।

হাওড়া ষ্টেশনে মাধুরীকে এনেছিলুম তুলে দিতে। গাড়ী ছাড়তে তখনও দেরী ছিল। আমি তার পাশে বসে ছিলুম আসন্ন বিচ্ছেদাশঙ্কায় মন দু'জনেরই ভারাক্রান্ত।

হঠাৎ কি জানি কেন সে বল্লে "আচ্ছা তুমি কি আমায় ভুলতে পার, যদি আর না আসা হয় যদি সেখানেই মরি। আমি তার কথা বারণ দিয়ে বল্লুম যাও কি যে বল তার ঠিক নেই।

বাঁশী বেজে উঠলো। সে একবার উঠে আমার পায়ের কাছে তার মাথাটী রেখে দিল। তাড়াতাড়ি তুলে তার অধরে আমার স্নেহাশীষ রেখা ওষ্ঠে এঁকে দিলুম।

* * * * *

পরের ডাকে একটা চিঠি পেলুম মাধুরী লিখেছে। পড়ে দেখি সর্ব্বনাশ——

বন্ধু বিদায় চির জনমের মত বিদায়। আমাকে ভুলে যাও। মা বাপকে হারিয়ে আমাকে পেয়ে সুখী হবে না তাদের নিরাশে আমাদের সমস্ত সুখ ভেসে যাবে। তখনই মা-বাপকে ফেলে তুমি আমায় পেতে চাও। কিন্তু তাতে সুখী হতে পারবো না আমরা। আমি তোমারই চিরদিনই থাকবো—আমায় ভালবাসা দও।

তোমারই—মাধুরী।

এখানেই মুকুর চুপ করলো। সমীর বল্লে তার কোন খবর পাওনি আর। মুকুর বল্লে না তবে হয় ত এক দিন পাব যে দিন সমাজ তার ও আমাদের মেলাতে পারবে না

পরাধীন পুরুষ

[শ্রীব্রজেন্দ্র নাথ ভদ্র]

সকল দেশেই পুরুষ জাত স্বাধীন। কিন্তু অধীন পুরুষদের কথা শুনিয়াছেন কি? আফ্রিকাদেশে যাহারা মরুভূমির প্রান্তে একঘরীয় লোক বাস করে তাহাদের পুরুষেরা আমাদের দেশের মেয়েদের মতই পরাধীন। তাহারা একগা গহনা পরে মাথায় ঘোমটা দিয়া চলা ফেরা করে। মেয়েদের কাছে তাহারা নিতান্ত নিরীহ। এমন কি বিবাহের প্রস্তাবটী পর্য্যন্ত তাহারা লজ্জায় করিতে পারে না বা অনেক সময় প্রস্তাব করিতে সাহস পায় না। মেয়েরা এদিকে ঘোড়ায় চড়িয়া যেখানে ইচ্ছা গতায়াত করে, এক রকম তাহারাই পুরুষ জাতির অভিভাবক।

অনেক সময় দেখা যায় এক দল কুমারী স্বামী সন্ধানে বাহির হইয়াছে। প্রত্যহ তাহারা নূতন গ্রামে গিয়া নূতন নূতন পুরুষ বাছাই করে। ছেলের সাজ দিয়া সাজাইয়া ভলোয়ার খেলে বর্শা ছোড়ে বা ঘোড়া ছুটাইয়া আসে, মেয়েরা তাহাদের মধ্যে যাহাকে পছন্দ হয় আপন করিয়া লয়।

তাহার পর সংসার ধর্ম্মে অবশ্য পুরুষই স্ত্রীকে সাহায্য করে কিন্তু সে প্রণয়িনীর মনস্তুষ্টির জন্য। তাহারা গ্রামের পথিকদিগকে হত্যা করিতেও কুণ্ঠিত হয় না এই রূপে যাহা পায় স্ত্রীর পদতলে তাহা রাখিয়া দিয়া নিজেকে ধন্য মনে করে।

যুদ্ধে যাইবার সময় পুরুষেরা প্রণয়িনীর নিকট হইতে একটী বালা বা অন্য কিছু স্বরূপ কিছু লইয়া তবে যুদ্ধে যায়। ইহা তাহাদের মঙ্গল চিহ্ন।

বংশানুক্রমে মেয়েরাই বিষয় তোগদখল করিয়া থাকে। দেশের রাজা বা সর্দ্দার মারা গেলে তাহারা সর্দ্দারের ভগ্নীর পুত্র বা তাহার কন্যার পুত্রকেই সর্দ্দার বলিয়া মানিয়া লয়। ছেলেদের দাবী দাওয়া সে দেশে নাই।

নর ও নারী

[শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী]

নারীকে মঙ্গলময়ী সেবা শ্রীরূপিনী সঙ্গিনী ভাবে পাইবার কল্পনায় যে সুখ সে সুখ পাইবার জন্য পুরুষ নামে পরিচিত যাহারা তাহারা সকলেই অল্পাধিক উৎসুক। সহধর্ম্মিনী, সঙ্গিনী, স্ত্রী, অর্দ্ধাঙ্গিনী এই প্রিয় শব্দগুলিকে প্রেমলিপির শিরোভূষণ করিয়া না রাখিয়া সত্য জীবনেও অনেকেই ভোগ করিতে সমুৎসুক। স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ের দিক হইতেই উভয়কে পূর্ণ ভাবে পাইবার, ভোগ করিবার যে বিচিত্র বিলাস উন্মাদনা তাহাতে নর-নারীর দৈহিক ও আত্মিক সম্বন্ধকে আরও ঘনিষ্ঠ করিবার প্রয়াসই দৃষ্ট হয়। যুগে যুগে কল্পনাপ্রিয় শ্রেষ্ঠ মানব সমাজের মধ্যে এই প্রয়াস চলিতেছে।

নর ও নারী উভয়ের শারীরিক ও মানসিক গঠন বিভিন্ন বৈষম্য হইতেই উভয়ে উভয়ের প্রতি আকৃষ্ট হয়। নর-নারীর এই আকর্ষণ হইতেই সৃষ্টির উদ্ভব,বিকাশ। যুগে যুগে নর নারীর অখণ্ড মিলন প্রয়াসের মধ্য দিয়া সৃষ্টির বিচিত্র রহস্য আরও গভীর হইয়া বিশ্বকে রহস্যাচ্ছন্ন করিতেছে। রহস্যের মধ্য দিয়া জীবন চালাইয়া লওয়াতেই জীবনের অনুভূতি—আনন্দ। রহস্য যেখানে ক্ষীণ মৃদু—সেখানে রহস্য প্রিয় মানবের চিত্ত সুস্থ থাকিতে পারে না। বিশ্বের রহস্য—সৃষ্টির রহস্য ভেদ করিবার জন্য কতকাল হইতে ঋষি, কবি, বৈজ্ঞানিক কত প্রচেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু এ চেষ্টা তাহাদের আরও গভীর হইতে গভীরতর রহস্যের মধ্যেই লইয়া যাইতেছে। অল্প রহস্য বা জানিত রহস্যে যাহারা তৃপ্ত হইতে পারে না তাহারাই অজানিতের দিকে জানিবার অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা লইয়া ছুটিয়া যায়।

নর-নারীর দেহগত, ভাবগত সৌন্দর্য্যের রূপ দিবার প্রয়াস সকল দেশের সকল চিন্তাশীল নর-নারীই করিয়াছেন। তাহাদের সেই চিন্তার ফল কাব্যে, চিত্রে, গানে, সঙ্গীতে, কলায় বিচিত্র ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু এই রূপ দিবার প্রয়াস কিছু মাত্রও সফল হইয়াছে কি? যাহা ফুটাইবেন ভাবিয়া ইহারা তুলিকা ধরিয়াছিলেন তাহার অর্দ্ধেকের অর্দ্ধেকও ফুটাইতে পারিয়াছেন কি? মনোভাবকে রূপ দিবার প্রয়াস মনের মধ্যেই গুমরিয়া গুমরিয়া ব্যাকুল হইয়া যুগে যুগে কাঁদিয়া মরিতেছে—এ দু'য়ের মিলনের অখণ্ড সৌন্দর্য্যের সন্ধান তো কাহারও তুলিকা দিতে পারে নাই!

এই না-দিতে পারার মধ্যেই বিশ্বের অনন্ত সৌন্দর্য্য, অনুভব রহস্যের বীজ নিহিত রহিয়াছে। ধরি ধরি করিয়াও এই যে ধরিতে পারিতেছি না, বাহু বন্ধনে প্রাণের মধ্যে নিবিড় ভাবে জড়াইয়া ধরিয়াও যে মনে হইতেছে—কই প্রাণের মধ্যে তো এতটুকুও পাই নাই—কত কত—আরো কতদূর, কত ব্যবধান——এইখানেই এ রহস্যের দ্বার।

এই রহস্যের দ্বার উদ্ঘাটন করিতে, সমগ্র ভাবে নর নারীকে ও নারী নরকে পাইতে চাহিতেছে। কিন্তু মানুষের এই পাওয়া হইয়া গেলে বিশ্বের এই রহস্য—সৃষ্টির এই বৈচিত্র্য আর থাকিবে কি? এক মুহূর্ত্তে ইহা শুষ্ক হইয়া যাইবে না তো?

তবু নর নারীকে যথা সম্ভব আপন করিয়া পাইতে চাহে। দুইটি বিপরীত রস ও ভাবকে এক ভাবে পরিণত করার মধ্যে যে আনন্দ সে আনন্দ পাইবার জন্য উভয়েই উভয়ের স্বাতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্যকে তলাতলি দিয়াই সুখ অনুভব করে। নরনারীর প্রকৃতিগত বৈষম্যের মধ্যে দিয়াও এই যে আপন করিবার, এক হইবার চেষ্টা ইহার নিরোধ প্রকৃতিই কোন দিন হইতে দিবে না! আপন আপন বৈশিষ্ট্যের পূর্ণ মাত্রায় উঠিয়াও উভয়ের জন্য উভয়কে লালায়িত হইতেই হইবে, এ উহাকে পাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া কাঁদিতেই হইবে। এই ব্যাকুলতাই বিশ্বের আনন্দ কলরব, সৃষ্টির মহোৎসব।

নর-নারীর প্রকৃতিগত বিশিষ্টতা বিহীন যে আত্মদান সে আত্মদানের মধ্যে অনেক বড়তা থাকিলেও তাহাতে শ্রেষ্ঠ মানব সমাজের চিত্ত সুখের উপলব্ধি করিতে পারে না। দুয়েরই বুদ্ধি বৃত্তি, জ্ঞান ও ক্ষমতার বিকাশের সঙ্গে

সঙ্গে এ উহার জ্ঞান ও ক্ষমতার আশ্রয় লইবার একান্ত নির্ভর করিবার যে একটা ভাব সেই ভাব হইতেই যথা সম্ভব পূর্ণতা ও সুখ শান্তি মানব সমাজের আবির্ভাব হইতে পারে। এক ক্ষমতাবান্ অপরে অজ্ঞান অসুস্থ এমন দুয়ের মিলনে সুফলের সম্ভাবনা নাই।

পরিপূর্ণতার দিকে মানব সমাজ অগ্রসর হইতে চাহিতেছে। ইহা মানবের ধর্ম, বিশ্বের ধর্ম, সৃষ্টির রহস্য। এই রহস্যের দিকে অগ্রসর হইয়া গিয়া পরিপূর্ণ রহস্য মূর্তিবর্ত্তের মধ্যে পড়াতেই মানুষের আনন্দ। এই আনন্দের দিকে যাইতে নর-নারী দুয়েরই জ্ঞানে ও সহানুভূতিতে দুয়েকে আঁকড়িয়া ধরিতে হইবে। একে অপরের কণ্ঠলগ্ন হইতে হইবে। তবে নর-নারীর চিত্ত-সুধার উপশম—ও সুস্থ সবল ভবিষ্যদ্বংশীয়ের আবির্ভাব হইবে।

নূতন খবর

[শ্রীসতীন্দ্র মোহন চট্টোপাধ্যায়]

ভারতবর্ষের বিভিন্ন খনিতে ৫০,০০০ জন স্ত্রীলোক কাজ করে।

• • • •

আমেরিকা আবিষ্কারে ব্যয় হইয়াছিল মোট ৭৪০ ডলার। আবিষ্কারক কলম্বস সাহেবকে মাত্র ৩২০ ডলার দেওয়া হইয়াছিল। জাহাজ ইত্যাদি সাজ সজ্জার জন্য বেশীর ভাগ দিয়াছিলেন পুই স্তাণ্টান জেন নামক এক জন স্ত্রীলোক—রাণী ইজাবেল নহেন।

•

নকুলের ঘ্রাণ-শক্তি এত প্রবল যে ৪০ মাইল দূর হইতে তাহারা খাবারের গন্ধ পায়।

• • •

সাহারা মরুভূমির ভিতর একজাত লোক আছে, তাদের মেয়েরা সর্ব্বত্র যথেচ্ছা গমনাগমন করে, যুদ্ধ বিগ্রহাদি করে, আর পুরুষেরা মুখ ঢাকিয়া বসিয়া থাকে। মুখের ঢাকনীর মাঝে চোখের কাছে দুইটী ছিদ্র আছে মাত্র। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দের আগে এ জাতের খোঁজ কেহই পায় নাই।

• • • •

আমেরিকার এক এডিসন সাহেবের আবিষ্কারের জন্যই লক্ষাধিক লোকের জীবিকার উপায় হইয়াছে। ইলেক্ট্রীক লাইটের বাল্‌ব (bulb) আর ফনোগ্রাফ তৈরী প্রভৃতিতে যে কত লোক খাটে তাহার ইয়ত্তাই নাই। আমাদের দেশে তো নিত্য বেকার সমস্যা! এ দেশের দৈন্য সব দিকেই।

• • • •

যে ফুল যত বেশী জমকালো তাহার গন্ধ ততই কম, এই সাধারণ নিয়ম।

• • • •

উপর আফ্রিকার এক রাজ্যে এখনও অনেক আজব কাণ্ড হয়। সেখানে পাকের ভার পুরুষদের উপর আর মেয়েরা শিকার প্রভৃতি করে। এক সঙ্গে তিনটী সন্তান হইলে, দু'টীকে তৎক্ষণাৎ মারিয়া ফেলা হয় অন্যটীর ভালোর জন্য।

• • • •

চলন্ত গাড়ীতে কথা শোনা এক দুরূহ ব্যাপার। তবে যিনি শোনেন তিনি যদি কাণে আঙুলের অগ্র চাপ দিয়া রাখেন তবে সাধারণ সুরের কথা অনায়াসেই শুনিতে পারিবেন।

• • • •

রাশিয়াতে ইঁদুরের সংখ্যা এমন বাড়িয়া গিয়াছে যে তরে দশ-সহস্র বিড়ালের অর্ডার দেওয়া হইয়াছে।

• • • •

আমাদের 'কাঠ-পেন্সিলের' উপাদান 'গ্রেফাইট'। এ মিনিষটা ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে সাইবারিয়াতে আবিষ্কৃত হইয়াছিল।

নাসিকের কয়েকটী চিত্র

('কলিকাতা রিভিউ'এর সৌজন্যে)

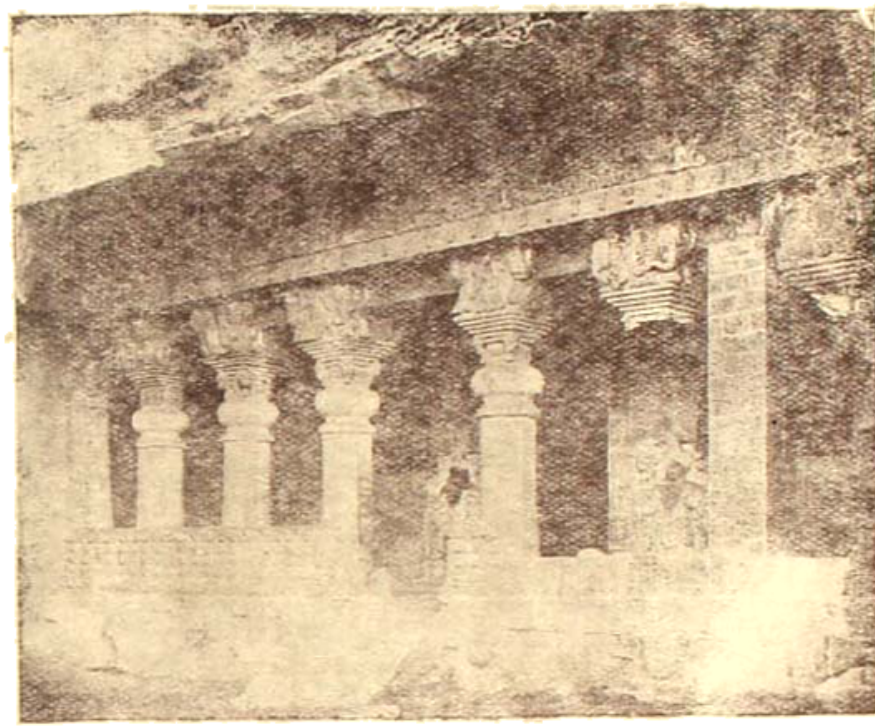

গৌতমীপুত্র গুহা

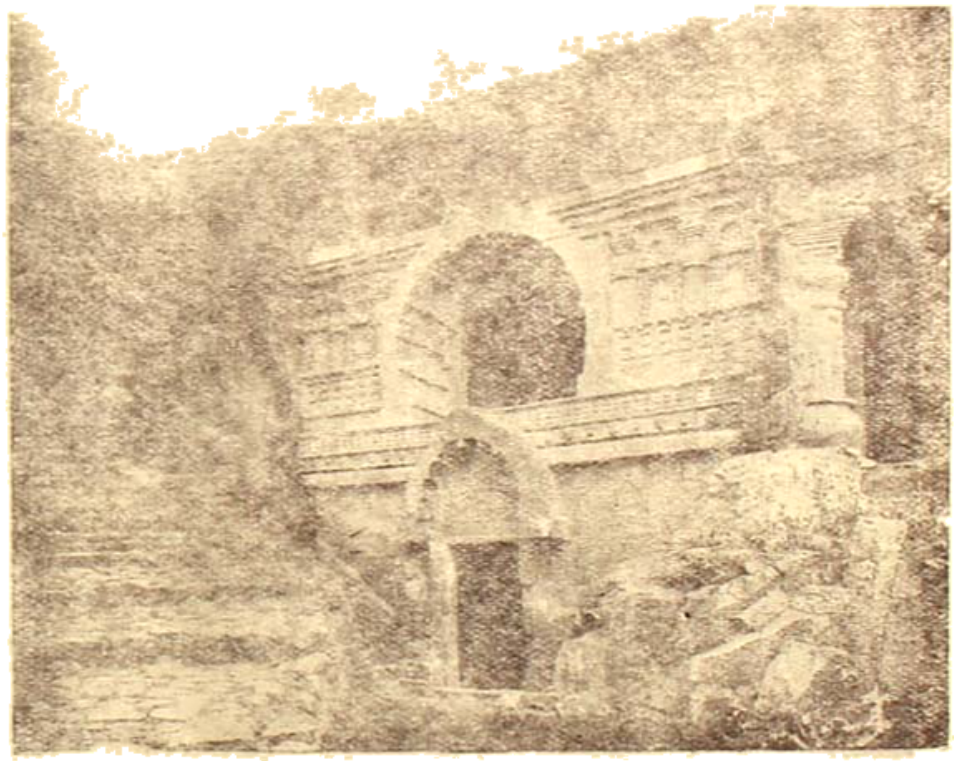

চৈত্য-গুহা (সম্মুখ ভাগ)

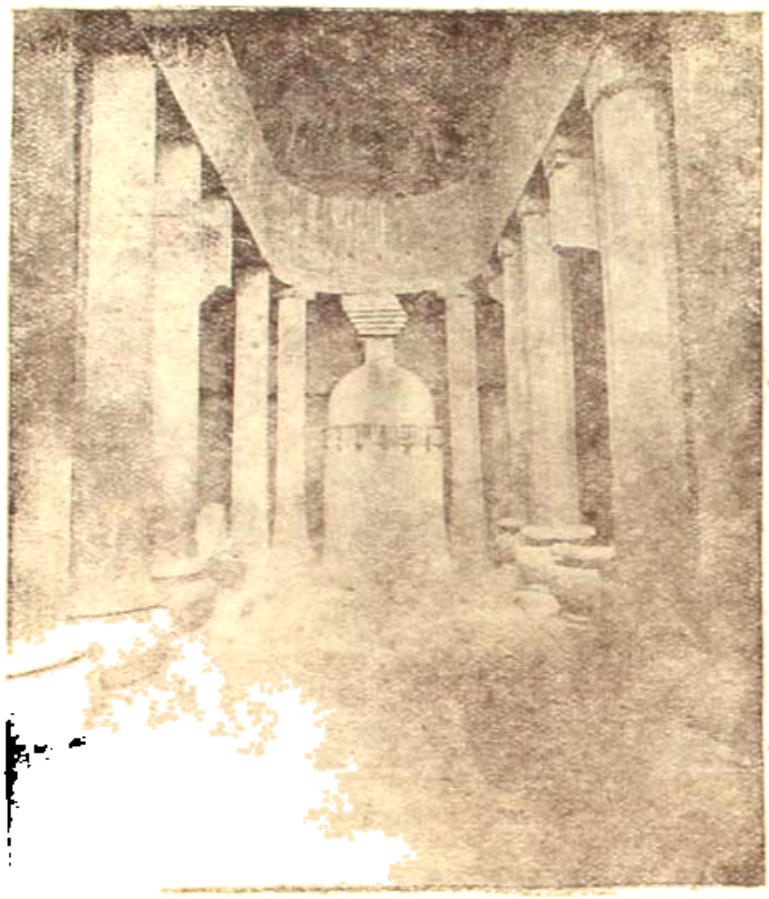

৺৫৯।-গুহা (ভিতরের দৃশ্য)

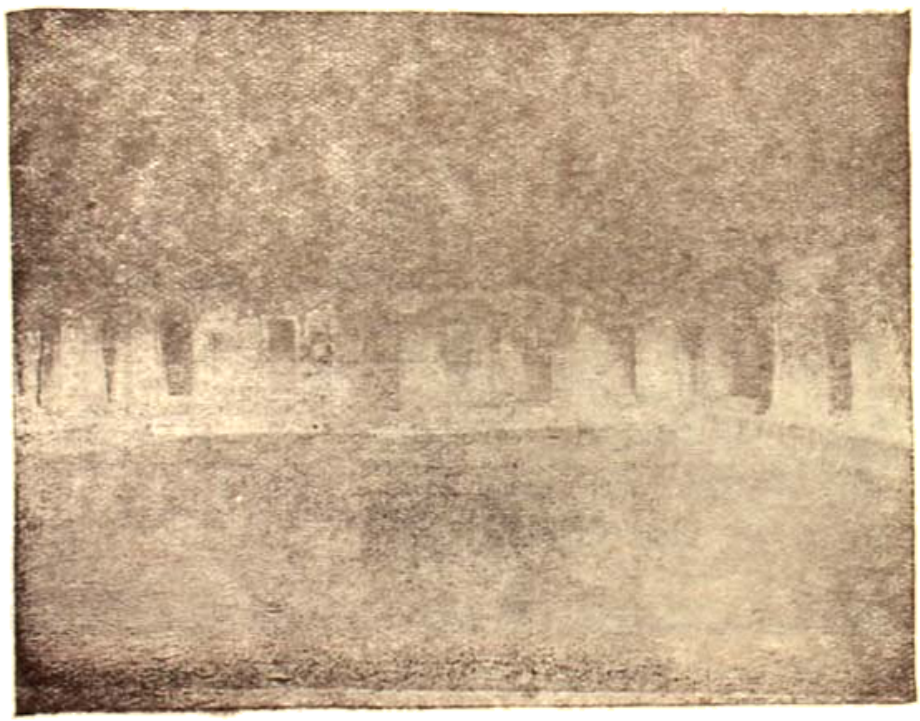

শ্রী যন্ত্রবিহার (ভিতরকার দৃশ্য)

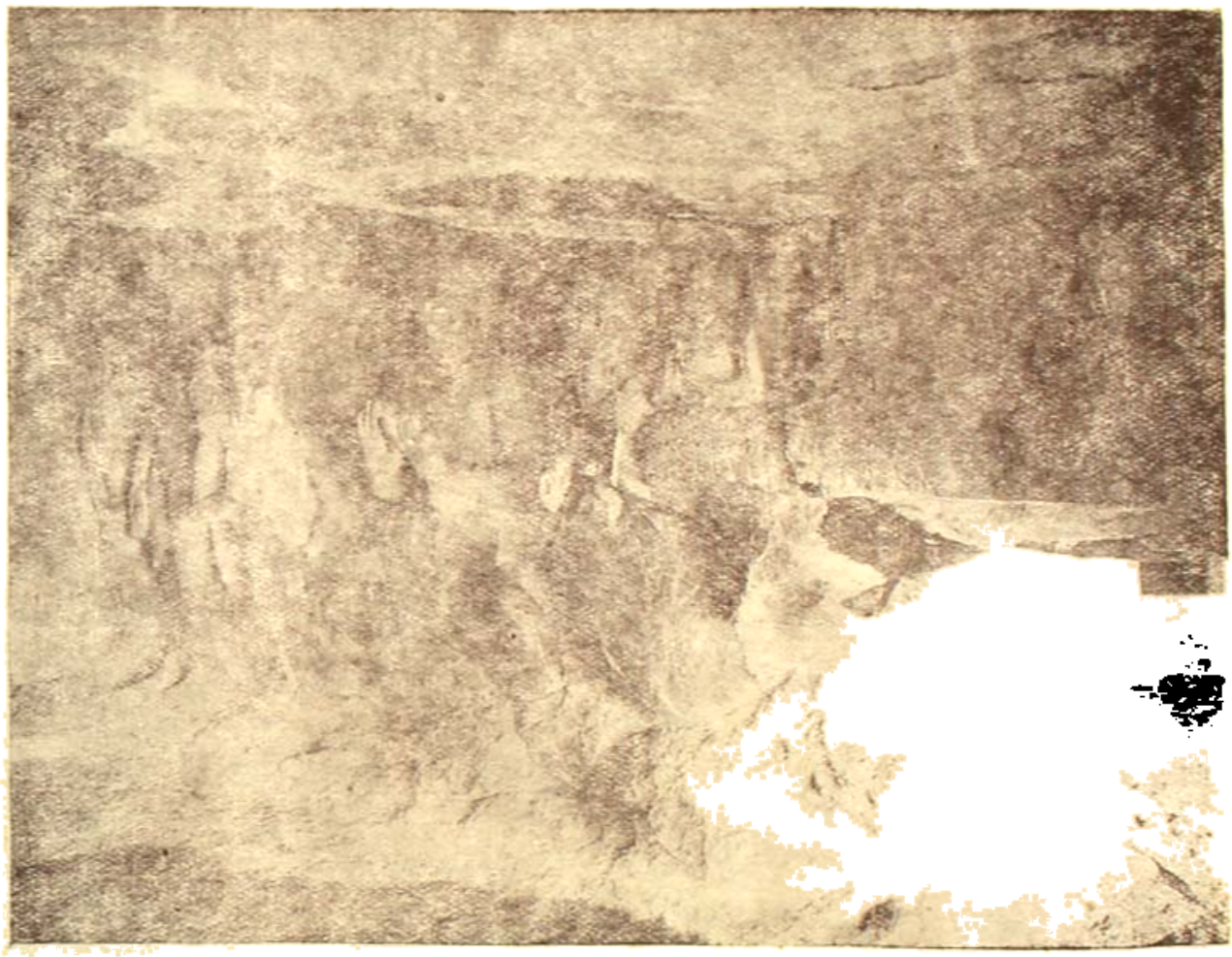

গুহা ভিতরের দৃশ্য

বুদ্ধ ও তাঁহার অনুচরগণ (গুহা মধ্যে)

বঙ্গের আর্থিক সমস্যা

(শ্রীমনোরঞ্জন মুখোপাধ্যায়)

বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গের আর্থিক সমস্যা যে ভয়ানক গুরুতর ভাব ধারণ করিয়াছে—তাহা বোধ হয় কাহাকেও আর বিশেষ ভাবে বুঝাইয়া দিতে হইবে না। এই সমস্যার সমাধানের উপর বাঙ্গালীর জীবন মরণ, বিশেষ ভাবে জড়িত। ইহা দূর করিবার জন্য সমস্ত বাঙ্গালীরই বদ্ধপরিকর হওয়া উচিত।

বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গের সর্ব্বত্রই অর্থকৃচ্ছতা পূর্ণ মাত্রায় দৃষ্টি গোচর হয়। বঙ্গের পল্লী আর পূর্ব্বের ন্যায় নাই। ইহার পূর্ব্বের শ্রী এবং প্রফুল্লতা চিরদিনের তরে অন্তর্হিত হইয়াছে, বলিয়া মনে হয়। বর্ত্তমান সময়ে, সকলেই যেন অভাবের তাড়নায়, ক্লিষ্ট এবং নিষ্পেষিত। তাহার উপর দুর্ভিক্ষ এবং মহামারী বঙ্গের পল্লীর ভিতর প্রবেশ করিয়া ইহাকে ভীষণ শ্মশানে পরিণত করিতেছে। কৃষক হইতে আরম্ভ করিয়া, সকলেই অভাবে জর্জ্জরিত।

কৃষকের শস্য ভাণ্ডারের ভিতর যেন অলক্ষ্মী প্রবেশ করিয়াছে বলিয়া মনে হয়। সারাদিন পরিশ্রম করিয়াও সে দুই বেলা দু'টী ভাতের সংস্থান করিয়া উঠিতে পারে না। বঙ্গের কৃষকের অবস্থা ক্রমশই যেন মন্বন্তরের দিকেই চলিয়াছে। বঙ্গের পল্লীকে ধ্বংসের পথে লইয়া যাইবার জন্য স্বয়ং ভগবানই যেন পূর্ণ মাত্রায় সহায়তা করিতেছেন বলিয়া বোধ হয়।

কৃষকের দারিদ্রতার সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালী মাত্রেরই দারিদ্রতা অত্যন্ত বাড়িয়া চলিয়াছে। এই দারিদ্রতা এবং অভাবের তাড়না যেন যথাবিত্ত বাঙ্গালীর ঘরেই ভীষণ ভাব ধারণ করিয়াছে।

পিতা তাহার পুত্র কন্যাকে বিষের চক্ষে দেখিতেছে। মাতা তাহার প্রাণসম সন্তানের মৃত্যু কামনা করিতেছে। কলেজ শিক্ষিত যুবক চাকরী না পাইয়া অভাবের তাড়নায় আত্মঘাতী হইতেছে। এইরূপ ভাবে চলিতে থাকিলে, অদূর ভবিষ্যতে মাতা-পিতা, অভাবের তাড়নায়, তাহাদের সন্তান দিগকে পণ্য দ্রব্যের ন্যায় যে বিক্রী করিতে বাধ্য হইবে—তাহা বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না।

অধুনা সকলকেই রাজ নৈতিক আন্দোলনে ব্যস্ত বলিয়া মনে হয় কিন্তু বঙ্গের বর্ত্তমান আর্থিক সমস্যা উহার চেয়ে যে কত গুরুতর ব্যাপার—তাহা মোটেই মনে হয় না। ইহাও অবশ্য স্বীকার করা উচিত যে, পরাধীনতাও আমাদের বর্ত্তমান অবস্থার সর্ব্ব প্রধান কারণ।

৫০ বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গের পল্লীতে বর্ত্তমান "হাহাকারের" এক সহস্রাংশও দৃষ্টিগোচর হইত না। এখন যেন সর্ব্বত্রই "নাই" "নাই" শব্দ। কৃষক ধান জন্মাইতেছে—অথচ তাহার ভাগ্যে ভাত নাই।

ইহার কারণ খুঁজিতে গেলে মূল কি মনে হইবে?

গভর্ণমেণ্ট হইতে আমাদের বর্ত্তমান আর্থিক-সমস্যা সমাধানের সাহায্যের প্রত্যাশা করা—অতীব দুরাশা মাত্র। এই বিপদ হইতে উদ্ধারের জন্য আমাদিগকেই সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া এক যোগে কাজ করিতে হইবে—নচেৎ অদূর ভবিষ্যতে বাঙ্গালীর মরণ যে অনিবার্য্য—তাহা সর্ব্ববাদী সম্মত।

অনতি বিলম্বে কৃষকদের মঙ্গলের জন্য, আমাদের, কৃষি সমিতি, সমবায় সমিতি প্রভৃতি গ্রামে গ্রামে স্থাপন করিতে হইবে। কারণ কৃষকদের উপরেই আমাদের উন্নতি, অবনতি, জীবন, মরণ সম্পূর্ণ ভাবে নির্ভর করে।

সর্ব্বশেষে শিক্ষিত যুবকদের প্রতি অনুরোধ এই যে—বর্ত্তমানে - বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাতে কিঞ্চিন্মাত্র কালক্ষেপ না করিয়া, তাহাদের অনতি বিলম্বে কৃষি-উপনিবেশ প্রভৃতি স্থাপন করিতে হইবে—নচেৎ তাহাদের অবস্থা ধ্বংসের পথ হইতে স্বয়ং সর্ব্বশক্তিমান ভগবানও রক্ষা করিতে পারিবেন না।

ভ্রম-সংশোধন

বাসন্তীর গত সংখ্যার (২৯শ সংখ্যা) ত্রিবর্ণ চিত্র 'বিরহে' ভ্রম ক্রমে চিত্রকরের নাম দেওয়া হয় নাই।
বিরহের শিল্পী শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র কুমারী।

স্ত্রী *

(শ্রীমনোরম চন্দ্র গুহ ঠাকুরতা)

সে আজ বহুদিনের কথা—তখন আমি পশ্চিমের কোন এক সহরে বাস করতুম। সে সময় আমি প্রায়ই রিক্সাগাড়ী ভাড়া করে সহরের চারদিকে বেড়াতুম আর রিক্সা চালকদের সঙ্গে বেশ গল্প সল্প করতুম। চালকেরাও গাড়ী টানতে টানতে তাদের পারিবারিক সুখ দুঃখের ছোট্ট ছোট্ট কাহিনী গুলো প্রাণ খুলে আমার কাছে বলতো আমিও খুব কৌতূহলী হয়ে তাদের কথা গুলো শুনতুম এবং তাদের পারিবারিক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র করুণ কাহিনী গুলোতে সহানুভূতি দেখিয়ে সে সময় গুলি কাটিয়ে দিতুম।

যে চালকেরা রাত্রিতে গাড়ী টানে, গল্প আমার তাদের সঙ্গেই জমে উঠ্‌তো বেশী রাতের বেলা যারা গাড়ী টানে, তারা সবাই গরীব চাষী। তারা গ্রাম থেকে তাদের গেরুয়া রংয়ের ছোট্ট ছোট্ট গাড়ী গুলো নিয়ে সহরে সহরে আসে পোষ্য-পরিজনের জন্য খাওয়ার আর জমীদারের জন্য খাজনা জোটাতে।

আমি একদিন এম্‌নি এক গরীব চালকের একখানা গাড়ী ভাড়া করেছিলুম। চালক বিশ বৎসর বয়সের যুবক। বেশ সুন্দর তার চেহারা। কালো মিস্‌-মিসে তার রং। কালোর ভেতরেও যে আলো থাকতে পারে, তা যে এই যুবকটীকে দেখেছে সেই বুঝবে। যেন কোন এক সুনিপুণ শিল্পী বিরাট এক খানা কালো পাথর কেটে সে মূর্ত্তিটী তৈরী করেছে। যদি তার রং কালোই না হতো তবে তাকে রাজ-পুত্র বললেও অত্যুক্তি হতো না।

চালকের সুন্দর তরুণ মুখখানার উপর একটী দুঃখের করুণ নিবিড় ছায়া আঁকা রয়েছে। বর্ষণের প্রারম্ভে আকাশের যে অবস্থা থাকে এও ঠিক তাই। প্রচণ্ড শোকের ধাক্কা কখাখাতে সমস্ত মনটা যেন তার ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে। ওঃ কি করুণ তার চাহনীগুলো.....

সে আমার সঙ্গে কথা আরম্ভ করবার পূর্ব্বেই আমি তাকে যেচে জিজ্ঞাসা করলুম এমি ভাই তোমার অমন শোকাকুল দেখাচ্ছে কেন? তোমার কি কোন বিপদ উপস্থিত হয়েছে?

যুবক প্রায় এক মিনিট পর্য্যন্ত আমার কথার কোন জবাব দিলে না তারপর ধীরে ধীরে বলতে সুরু করলো। বিপদ ব'লে বিপদ—যার চেয়ে বেশী—যার চেয়ে বেশী বিপদই বলুন, কষ্টই বলুন আর শোকই বলুন যাই বলুন না কেন—মানুষের স'তে পারে না—.....আমার স্ত্রী মরে গেছে!

—তোমার স্ত্রী এঁ্যা.....তুমি তাকে ভাল বাসতে?

যুবক আমার দিকে না তাকিয়েই নত মস্তকে উত্তর করলে "হাঁ মশাই আমি তাকে ভাল বাস্‌তুম.....প্রায় মাস আষ্টেক হলো তার মৃত্যু হয়ে গেছে তবু কেন যে তার স্মৃতি হৃদয়ে আমার অত বেশন করে বুক্‌তে পারিনে। কেন সে মরণ পথের পথিক হলো? কেন সে মুকুলেই ঝরে গেলো? কেন সে অমন তরুণ বয়সেই ভবের লীলা শেষ করে ফেল্‌লো?.....কলেরা একদিন তাকে আমার বুক থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে?

——'সেও কি তোমায় ভালবাস্‌তো?'

হতভাগ্য যুবক মার্ম্ম একটা নিশ্বাস ত্যাগের পর উত্তর দিলে। হাঁ মশাই.....কেমন সুখেই না আমাদের দিন গুলো কেটে যাচ্ছিল? তবু কেন সে আমায় ছেড়ে চলে গেলো বুক্‌তে পারিনে। যখন এখানে তার মৃত্যু সংবাদ প্রথম শুন্‌লুম তখন তার নশ্বর দেহ চিতার অগ্নিতে ভস্মীভূত হয়ে গেছে। এ বুক ফাটা দুঃসংবাদ শুনেই আমি আমাদের গাঁয়ের বাড়ীতে চলে গেলুম। যখন আমি সেখানে পৌঁছেছি তখন রাত্রি ব'য়ে গেছে। ঘরের দরজা খোলা ছিল—'সুক্ত সে কুটীর' মাঝে দপাদপ্‌ ঢুকে পড়লুম। কয়েক মিনিট ঘরের মাঝখানে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলুম, তারপর ধীরে ধীরে ডাক্‌লুম 'ফকর্মনিয়া (আমার স্ত্রীর নাম)। প্রত্যুত্তরে শুধু কি কি পোকার বিকট কি কি শব্দ ভিন্ন আর কিছুই শোনা গেলো না। আমি তখন চীৎকার করে কেঁদে উঠে ঘরে মেঝের উপর বসে পড়লুম। তারপর মুষ্টিবদ্ধ আমার হাত দুখানা দিয়ে মাটীর উপর সজোরে আঘাত করে বলে উঠ্‌লুম ডাকিনী পৃথিবী, তাকে খেয়েছিস্‌ আমায় ও খেয়ে ফেল্‌। ওহো হো হো.....

যুবক যেম্‌নি ভাবে গাড়ী টান্‌ছিল, তেম্‌নি ভাবে থেকেই, জামার আস্তিনে তার অশ্রু পূর্ণ নয়ন দুটী মুছে ফেল্‌লে, এরপর "হুঁ, হুঁ" আর একটী শব্দও তার মুখ মুখ থেকে বেরোয় নি।

গাড়ী থেকে নেবে ভাড়া চুকিয়ে দেওয়ার সময় আমি তাকে তার ভাড়া পাওনা থেকে কয়েকটী পয়সা বেশী দিয়ে দিলুম। সে যন্ত্রচালিতবৎ দুহাত পেতে আমার সেই অযাচিত দান গ্রহণ করলে, তারপর আমাকে অভিবাদন ক'রে, মাঘ মাসের দারুণ কন্‌কনে শীত ভোগ করতে করতে, পথিক বিহীন পথের মাঝ দিয়ে ধীরে ধীরে অদৃশ্য হয়ে গেলো।

* আইভান টুর্গেনিভের রচনা অবলম্বন করিয়া অনুলিখন।

বিদ্যাপানী

[শ্রীবিরূপাক্ষ মেনন কৌশলে]

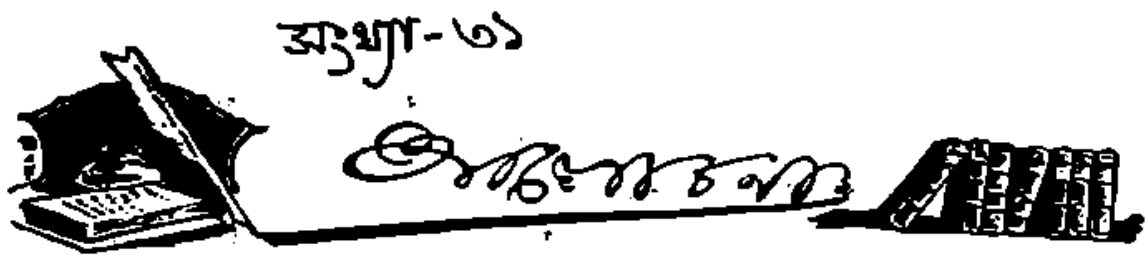

কারামুক্ত মহাত্মা গান্ধী শীঘ্রই আবার তাঁহার চিরপ্রিয় ইয়ংইণ্ডিয়া ও নবজীবন পত্রের সম্পাদন ভার গ্রহণ করিবেন। সাংঘাতিক রোগমুক্তির পরেই মহাত্মা একে একে আবার সর্ব্বপ্রকার দেশ কার্য্যেই আত্মনিয়োগ করিয়া দেশ শক্তির মূল উৎসকে সঞ্জীবিত করিতেছেন। হিমালয় হইতে কন্যাকুমারী পর্য্যন্ত নিখিল ভারতের ত্রিশ কোটী নরনারী মুক্তি পাইবার জন্য মহাত্মাকে পথ প্রদর্শক রূপে চাহিতেছে। জাতির বাসনা সফল হইবে, মহাত্মার তপ ত্যাগ ও কর্ম্ম প্রভাবে পথের নির্দ্দেশ অবশ্যই হইবে।

• • • •

ধর্ম্ম কার্য্যে ভারতীয়ের ত্যাগ, নিষ্ঠা, কষ্ট সহিষ্ণুতার কথা চিরবিদিত। দেব মন্দিরে, তীর্থ স্থানে, যোগস্নানে যে কোন রকম ধর্ম্মকার্য্যে ভারতীয় হিন্দু নরনারীর চিত্ত যে ভাবে মাতিয়া উঠে তাহা সত্যই দেখিবার বিষয়। এমনি একটা যোগস্নান গিয়াছে গত বুধবার মাঘী পূর্ণিমার চন্দ্রগ্রহণে। দেশ বিদেশের ধর্ম্মপ্রাণ নরনারী এই যোগে স্নান করিবার জন্য গঙ্গাতীরে সমাগত হইয়াছিল। গঙ্গার তীরে উদ্বেল জন স্রোত সাগরের তরঙ্গের মত উচ্ছ্বসিত হইয়া আসিতেছিল। কলিকাতার মত সহরের অত বড় বড় ঘাট গুলিতে পর্য্যন্ত এই বিরাট জনতা ধরিবে না বলিয়া মনে হইতেছিল। এই লক্ষ লক্ষ নর-নারীর জনতাকে সংহত করিয়া পুরুষ ও নারীদের ভিন্ন ভিন্ন পর্য্যায়ে নিরাপদ স্নানের ব্যবস্থা করিয়া দিয়া স্বেচ্ছা-সেবকেরা দেশবাসীর অশেষ প্রশংসাভাজন ও নিজেদের কর্ম্মকুশলতার পরিচয় দিয়াছেন।

• • • •

এইরূপ জনতার মধ্যে বিশেষতঃ যেখায় স্ত্রীলোকের জনতাই বেশী সেখায় চোর,—বদমাস জাতীয় প্রাদুর্ভাব যথারীতিই বেশী হইয়া থাকে। স্বেচ্ছা-সেবকদের কর্ম্ম-কুশলতায় এইরূপ জনতায় এসব উপদ্রবের কথা এখন আর বেশী শোনা যায় না। এ জন্য কংগ্রেস ও অন্যান্য সেবা প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগ প্রশংসনীয়।

• • •

এই সব যোগাযোগে ধর্ম্মকার্য্যে পুরুষের চেয়ে নারীর জনতাই বেশী হইয়া থাকে। নারীদের রক্ষা করিবার, নিরাপদ রাখিবার জন্যই স্বেচ্ছাসেবাদের অধিক প্রয়োজন। এসব কার্য্যে স্বেচ্ছাসেবাব্রত লইয়া নারীদের আগমনও কি বাঞ্ছনীয় নহে? আমাদের দেশে জাতীয় জীবনে নূতন আবাহাওয়া আসিবার পর হইতে নারীরা অনেক কার্য্যেই অগ্রনী হইবার চেষ্টা করিতেছেন। তাই মনে হয় এই সব স্বেচ্ছাসেবাব্রতে যদি তাঁহারা পুরুষ সেবকদের সহায় হইয়া অবতীর্ণা হন তবে দেশের নারী সমাজের মঙ্গলই হইবে। কতকটি শিক্ষিতা স্বেচ্ছাসেবা-ব্রতে অবতীর্ণা নারীর সাহস, কর্ম্মতৎপরতা দেখিয়া এইরূপ যোগে লক্ষ লক্ষ নারীর নয়নে মনে একটা নূতন আলো রেখা পড়িবে। কয়েকটির দৃষ্টান্তে লক্ষ লক্ষ নারী অনুপ্রাণিত হইতে পারিবে।

• • • •

নারী আমাদের দেশে আছনারই সামগ্রী হইয়া আছে। ঘরে নারী জ্বালায় জ্বলিয়া আত্মহত্যা করে, ঘর হইতে অসহায় নারীকে জোর করিয়া লোকে ধরিয়া লইয়া যায়, রেলে ষ্টীমারে নারীর উপর অত্যাচার হয়—সর্ব্বত্রই নারীর এই লাঞ্ছনা। নারী যদি শিক্ষা পায়—তাহাদের আত্মজ্ঞান যদি জন্মে তবে এই উপদ্রব লাঞ্ছনা অনেক নিবারিত হইতে পারে। কিন্তু দেশের নারীদের অবস্থার পরিবর্ত্তন আনিতে হইলে নারীকেই এ বিষয়ে অগ্রনী হইতে হইবে। বাংলার অধিকাংশ পল্লীতেই নারীদের শিক্ষার কোন ব্যবস্থা নাই। ঘরে বা বাহিরে আত্মরক্ষা, সম্মান বজায় রাখিবার কোন কৌশলই তাহারা জানে না। তাহারা জানে শুধু অকারণে হইয়া লাঞ্ছনা সহিয়া প্রাণ

হইতে। চোখের উপর নারী লাঞ্ছনার ঘের দেশে আর কত কাল চলিবে?

• • • •

দেশে এমন একটা সময় আসিয়াছে যে দেশবাসী মিলিত সঙ্ঘবদ্ধ হইতে না পারিলে তাহারা আর বাঁচিয়া থাকিতে পারিবে না, তাহাদের লাঞ্ছনা ও অপমানের বোঝা ভারি হইয়াই চলিবে। গ্রামে চোর ডাকাতকে বাধা দিবার জন্য গ্রাম্য সমিতি করিতে হইবে। সমাজের বাহ্যিক ছিদ্রমার্গের হীনতা ছাড়িয়া দিয়া সমাজশক্তিকে সুদৃঢ় করিতে হইবে—যাহাতে সমাজ ভিত্তির উপর দেশ ও রাষ্ট্রের ভিত্তি গড়িয়া উঠিতে পারে। দেশের জীবনে নূতন আলো আসিয়াছে—স্বেচ্ছাসেবী দেশ সন্তানদের উপর এই মহান কর্ম্মভার পড়িয়াছে।

• • • •

দেশে মামলা মোকর্দ্দমা অনেকেই করে। বিশেষতঃ আইন, আদালত, উকিল মোক্তার ও উমাইতা দিবার লোক সহজ প্রাপ্য হওয়াতে মামলা মোকর্দ্দমা দেশে নিত্য বাড়িয়াই যাইতেছে। মামলার খরচ খরচা খতাইয়া দেখিতে গেলে কোন পক্ষ যে লাভবান হইলেন তাহা বলা মুস্কিল—কিন্তু বিচারান্তে সর্ব্বস্বান্ত হইতে অনেককেই দেখা যায়। তবে সরকারের বিচার বিভাগ হইতে বেশ বিরাট একটা আয় হয়। বৎসরে এক কোটী পঁচাত্তর লক্ষ টাকার খরচা বাবদেই সরকারের পক্ষসমূহের নিকট হইতে যা নেট আদায় হয় খরচ খরচা বাদে তার পরিমাণ থাকে এক কোটি পরিমাণ টাকা। এতো এক সরকার পক্ষের আয় এ ছাড়া মামলা-বাজদের ঘাড়ে চাপিয়া অনেকেই দিন গুজরাণ করিয়া থাকে—এই মামলার হুজুগে দেশের অধিবাসী দিনের দিন আরও নিঃস্ব হইয়া পড়িতেছে।

• • • •

মার্চ্চ মাসের মধ্যভাগে কবি সম্রাট রবীন্দ্রনাথ চীনের সুধী সমাজের নিমন্ত্রণ পাইয়া চীন যাত্রা করিতেছেন। কবিবরের আগমন সম্ভাবনায় তথাকার প্রায় সকল সাময়িক পত্রেরই বিশেষ সংস্করণ বাহির হইয়াছে। তাঁহার প্রায় সকল গ্রন্থই চীন ভাষায় অনূদিত হইয়াছে। এসিয়ার বিরাট যুগন্ত শক্তি বাঙ্গালী কবি-মর্য্যাদা দানে অগ্রসর—কবির সম্মানে বাঙ্গালী গৌরবান্বিত।

যুগের গান

[শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার এম-এ]

রক্ত-ত্রিশূল যেথনি হানে
পাগলা ঘূর্ণী বায়
আকাশ-কাটা আগুন হাওয়া
বনবনিয়ে যায়—
ওগো বনবনিয়ে যায়
—হুঁ হুঁ হুঁ হুঁ—ডাক ছাড়ে হাওয়া
তুফানে কাঁপে জগৎ-হিয়া
ও—তুফানে কাঁপে হিয়া
হুঁ হুঁ হুঁ হুঁ—ডাক ছাড়ে হাওয়া—
দারুণ কঠিন—হে——মহাকাল
এই খেলা কি খেলতে হয়—
একি খেলা খেলতে হয়?
সুই বলহীন পরাণ অভিশাপ
ও খেলা যেথে লাগে ডর
খেলা যেথে লাগে ডর
যায় তবে যাক—যায় হে—সুন্দর
আমার মঙ্গল ঈশ্বর
তবো পরম ঈশ্বর
তোমার আর খেলাটী খেলো
এবে আর খেলাটী খেলো
হয়েছে খুব আর না সয়
সেই খেলাটী খেলো
ওগো সেই খেলাটী খেলো
দারুণ কঠিন-হে—মহাকাল
এই খেলা কি খেলতে হয়
একলই খেলা খেলতে হয়?

হয়েছে খুব আর না সয়
তোমার সেই খেলাটী—খেলো
আর সেই কথাটী বলো
ওগো বাঁশীর সুরে বলো
আর বাঁশীর সুরে খেলো
এবে হাতে ধরে তোলো
হে—সখা হাতে ধরে তোলো
করুণা কটাক্ষ দিয়ে বঁধু দয়া কর
এবে দয়া কর
ওগো দয়া কর।
হা-হুতাশ—হাওয়ার আগুন
সইতে পারি না আমি আর
ওগো সইতে নারি আমি আর
গেল গেল দেব—ধর ধর তুমি
এখন দয়া দেখি তোমার
এবে দেখি দয়া তোমার
ওগো সইতে নারি আমি আর।

• • • •

ঐ আকাশে বীণার সুরে ওকি গান ভেসে যায়?
(ক্ষুব্ধ) মহাকাল স্তব করে ঋষি
নইলে বিশ্ব যায় হায়।

• • • •

নীল আকাশে হেসে হেসে ও কারা ভেসে যায়
কত শশীকলার নায়—শশীকলার নায়
ও 'মা' বেরিয়ে গেলো পালে পালে
মেঘের পালে যায়—সাদা পালে যায়
নীল আকাশে হেসে হেসে ও কারা মেয়ে যায়
কত শশীকলার নায় শশী-কলার নায়
পাগলা তারা আপনা ভোলা ও তারা
সে কিসের গান গায়—কিসের গান গায়
উষার আলো আঁখি ভরা ও তারা
"ক্ষেম" ও "ক্ষমা" গায়—ক্ষেমের গান গায়
মেঘ "মল্লা"র গান-বাওয়া ওসে
"ক্ষমা"র তরী ভেসে যায়—
প্রেমের তরী ভেসে যায়
নীল আকাশে ও কারা গো হেসে ভেসে যায়
ওসে শশী-কলার নায়—শশীকলার নায়

• • • •

অলস আঁখি মেলিয়ে দেখি
প্রেম-তপন উদয় রে
আকাশ আলো রঞ্জিয়ে চলে
কোন সুদূরের গান রে
উষার মধুর অরুণ কিরণ
পরাণ ছাওয়া আবেশ রে
আকাশ বাতাস জগৎ ভরে
উঠল কাহার জয় রে
আর কিবা ভয় এল বরাভয়
ছুড়াতে জগৎ হিয়ারে
অলস আঁখি মেলিয়ে দেখি
প্রেম তপন উদয় রে।

নারী

[শ্রীমতী সরস্বতী দেবী]

এক

সে ছিল বাবুদের বাড়ীর রাতদিনের ঝি। খাওয়া পরা ও দু'টাকা হাত খরচা সে পেত। যেবার সে আসে ছোটবাবুর সেবার বিয়ে হলো কত আমোদ আহ্লাদ কত আলো, বাজনা—আর তার মাঝখান দিয়ে ছোট-বাবু তাঁর জানাকাটা পরীবউকে নিয়ে এসে ঘরে তুললেন। তারপর সুখ দুঃখের মাঝ দিয়ে দিন গুলো বেশ চলে যাচ্ছিল। কিন্তু কেন জানিনা হঠাৎ একদিন সংসার অন্ধকার করে দু'বছরের খোকাকে বাপের হাতে তুলে দিয়ে ছোট বউ তার অচেনা পরীরাজ্যে চলে গেল। তাঁর কথা এখনও তার বেশ স্পষ্ট মনে আছে।

ছোটবাবুর মনের কথা ঝি খুব কমই বুঝত। যৌবন তার কাছ থেকে অনেক দিন আগেই বিদায় নিয়ে চলে গিয়েছিল। মানুষের অভিজ্ঞতা যে তার খুব হয়ে ছিল তাতে সন্দেহ নাই। সে ভেবেছিল—কেন না এটা তার পক্ষে তাদা স্বাভাবিকও ছিল না যে ছোট বাবু খোকাকে তার হাতে তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হবেন। কিন্তু শীঘ্রই সে নিজের ভুল বুঝতে পারলে। খোকাকে কেউ দেখবার নেই এই অছিলায় তিনি আবার বিয়ে করলেন। তাদা কিন্তু আর তেমন জোড়া লাগল না। বাইরের সুস্থতা পূর্ণ হলেও মনের মাঝে তেমন আলো আর ফুটল না। রৌদ্রতপ্ত হাল্কা খণ্ড-মেঘখানা ক্রমশঃ বাতাসে লেগে খণ্ডশঃ হতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে শালাবাবুরা বাড়ীতে কায়েমী বন্দোবস্ত করে বসে গেলেন। বাবুতো বউয়ের হাতের পাঁচ। কিন্তু বনিবনা হল না তাদের সঙ্গে এই বিয়ের। খোকার অনাদর তার বুকে শেলের মত বাজ-

ছিল। মা-হারা ছেলেটিকে সেই বুকে তুলে নিয়েছিল, আর তারই বেদনায় মাঝে মাঝে সে এমন বিষোদ্গীরণ করে ফেলত যাতে শান্তি আর শুশ্রূষা সে বাড়ী থেকে বিদায় নেবার চেষ্টা করছিল, কারণ সে কাকেও ভয় করবার মেয়ে ছিল না।

ছেলেটির নাম ছিল শৈলেন। ফুটফুটে সাদা চেহারাটি; দেখলেই ভালবাসতে ইচ্ছা করে। তার ডাক নাম ছিল—অণ্টু। কি-ই তাকে এ নামটা দিয়েছিল। জীবনের এই কয় বৎসরের অভিজ্ঞতার ফলে সে বুঝেছিল যে তার মা-বাপ তার চেয়ে কিছু উঁচু ধরণের জীব। তাই ওঁদের, বিশেষতঃ তার মার কাছে সে বড় একটা ঘেঁষবার চেষ্টা করত না, সে সাহসও তার ছিল না। এই আদর ও অনাদরের মাঝখানেই সে বড় হয়ে উঠতে লাগল। কি কিছু কিছুতেই আপনাকে সামলাতে পারতো না। ফলে তার অভাব হ'ল।

এত দিনে সে নিজের অবস্থাটাকে বেশ ভাল করে বুঝে নিলে। খোকাকে তার ছেড়ে যেতে হবে। হাঁ, তার চাইতে কেন হুকুম হল না যে ওরে বি! তুই আত্মহত্যা কর না কেন? খোকা? হাঁ যাকে মার মত বুকভরা স্নেহে, দাদীর সেবায়, পিতার যত্নে সে লালন-পালন করেছে; যাকে অনাহারে অনিদ্রায় এত বড় করে তুলেছে—যাকে সর্বস্ব বিলিয়ে জীবনের বিনিময়ে পেতে সে প্রস্তুত—তাকে ছেড়ে যেতে হবে! বাঃ, বেশ হুকুম ত?

ছেড়ে তাকে যেতেই হবে, সেটা ঠিক; কারণ অণ্টুর উপর তার দাবী যত বেশী হোক না কেন তার বিরুদ্ধ দাবী যে আর একজন তারই উপর হিংসার বলে অধিকার করেছে—সে তার সৎমা। এই নতুন জীবটি যে তার উপর বুঝে সুঝেই এই অযোধ অস্ত্র প্রয়োগ করেছে তাতে কোন সন্দেহই ছিল না। স্নেহ, যত্ন ভালবাসার ধার এখানে নাই।

দুই

সেবার গ্রামে বসন্তের বড়ই প্রকোপ। ঘরে ঘরে জনে জনে এই ভীষণ রোগের কবলে পড়তে লাগল। ছোটবাবু সে গাঁ ছেড়ে যাবার জন্ত যোগাড় করছিলেন। মাবাবারা আগেই সরেছিলেন। হঠাৎ খোকার এক দিন জ্বর হল; গায়ে সব গুটী বেরুতে পাওয়া গেল। সংসার প্রকোপ তখন পূর্ণ উদ্যমে সে সংসারে আপনার আধিপত্য বিস্তার করেছিল। তাঁর হুকুমে নতুন ঝি বালককে নীচের তলার এক কুঠুরিতে রেখে দিয়ে এল। সেখানে আলো বাতাসের প্রবেশ নিষেধ। মেঝে এত ময়লা যে পা দিলে ঘাস পড়ে যায়। তারই উপর এক মাদ্ধাতার আমলের ছেঁড়া ময়লা মাদুরে তাকে শোয়ান হ'ল। বাপ একবার আপত্তি করেছিলেন, কিন্তু—'চুপ'; গিন্নিমার হুকুম। বস ছাড়া আর তাকে দেখবার কেউ রইল না।

তিন

সে দিন বাবুরা যাবেন সব ঠিকঠাক। হঠাৎ গিন্নীর মনে দয়া হ'ল ছেলেটিকে একবার দেখবার জন্ত—বোধ হয় ওটা নারী-স্বভাব সিদ্ধ। ঘরে ঢুকে দেখলেন, তাকে ঘরে ঘরে টানাটানি করছে। পরপারে যাবার পথে তার বাধা খুবই কম। তার অস্ফুট গোঙানির সঙ্গে, করুণ চাউনিতে আর নীরব বিলাপ তাঁর মধ্যে অকস্মাৎ সুপ্ত নারী প্রকৃতি সিংহের ন্যায় গর্জন করে উঠল। পরীক্ষে তারই উন্মেষ আর বিকাশ মানুষে। সমস্ত জীবনের কার্য্যের বিরুদ্ধে, তাঁর মন বিদ্রোহ প্রকাশ করলে।

অণ্টু যন্ত্রনায় চীৎকার করে উঠল।—মা, ওমা—মাগো একটু জল—বড় যন্ত্রনা।

নারী এতক্ষণ কপাট ধরে চুপটি করে দাঁড়িয়ে দেখছিলেন। আর্ত্ত বালকের আধফোটা আর্ত্তনাদ শুনে নারীর পাষাণ কঠিন প্রাণ মুহূর্ত্ত মধ্যে আর্দ্র হয়ে গেল। তিনি ছুটে গিয়ে তার মুখে একটু জল দিলেন। তারপর নারী তাঁর সুগোল নিটোল হাত দুখানি দিয়ে মলিন বালককে বুকে জড়িয়ে ধরে জিজ্ঞেস্ করলেন, "অণ্টু বাবা, খুব কষ্ট হচ্ছে না?"

ঝটকা বাতাসের মত আর এক পাগলিনী রমণী বাইরে থেকে সশব্দে দরজা খুলে ঘরে ঢুকে বললে, খোকোন—ও খোকোন? হঠাৎ চোখ দুটো গিয়ে পড়ল ঘরের মাঝখানে। সে স্তব্ধ হয়ে গেল—ঠিক কাঠের পুতুলের মত। তার মুখ দিয়ে আর কথা বার হল না—যেন বোবার মত সে হয়ে গেল। সে দেখলে, মূর্ত্তিমতী করুণার ন্যায় ছোট বৌ খোকাকে তার স্নেহময়ী জননীর মত কোলে করে নিয়ে বসে আছেন।

বাহিরে অন্ধকার জমেই জমাট বেঁধে আসছিল। গাছের ফাঁকে ফাঁকে পুকুরের আড়ে পাড়ে ঝিল্লীর একটানা সুর মুখর হয়ে উঠছিল। আকাশে বাতাসে তারই অনুরণন করুণ হয়ে ভেসে চলেছিল।

ঘরের মাঝের সে প্রগাঢ় নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে গিন্নীর স্বর শোনা গেল। হাঁ করে দাঁড়িয়ে কি দেখছিস্ কি? শীগ্‌গীর একটা আলো জেলে নিয়ে আয়, অণ্টুকে উপরে নিয়ে যেতে হবে যে।"

গৃহকর্ত্রী ও ভিখারী

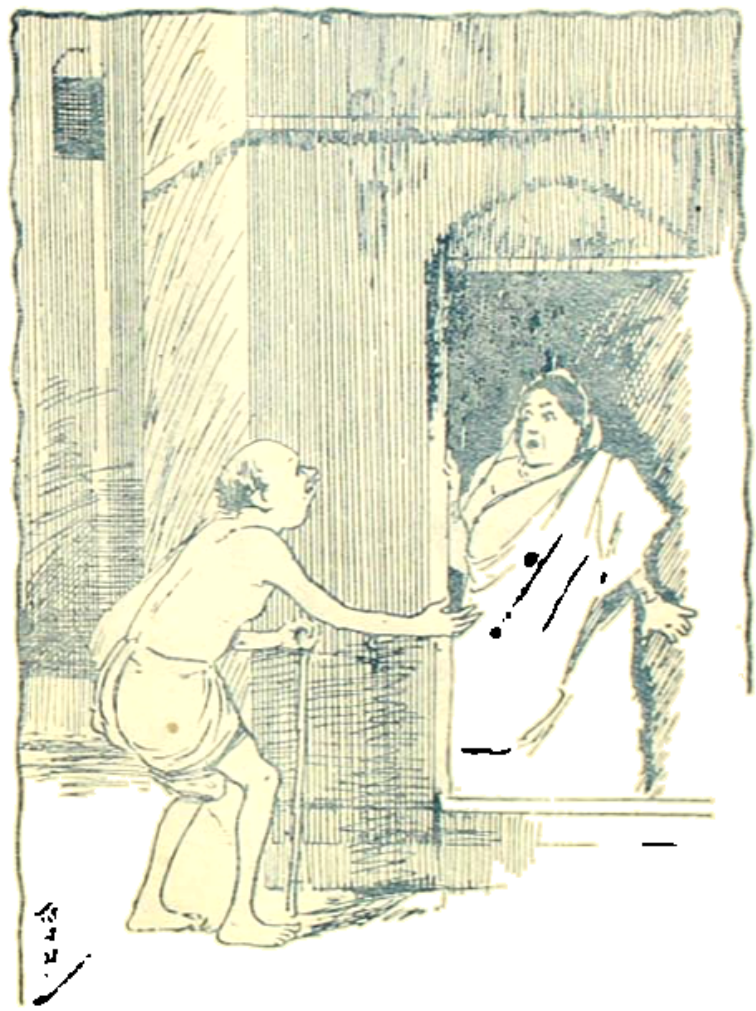

ভিখারী :—জয় হোক্ মা—দু'টি ভিক্ষা পাই—

গৃহকর্ত্রী :—দাঁড়াও বাছা—দিচ্ছি—

ভিখারী :—একটি কথা বলি মা—চাল যা দেবে,—মোলায় যেন হয়।

বুদ্ধদেবের প্রস্তর-মূর্ত্তি

মূর্ত্তি দুইটি সুলতানগঞ্জে পাওয়া গিয়াছিল, এক্ষণে বারমিংহাম মিউজিয়মে রাখা হইয়াছে

"আলো—আরো আলো।"
অঙ্কিত সরযাগ—মহাত্মা গোর্কি।

অনিলেন্দু বিশ্বাসের সৌজন্যে

ব্যতিক্রম

[শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ]

চতুঃপঞ্চাশত্তম পরিচ্ছেদ

হরসুন্দরকে বসাইয়া ঠানদিদি বিনয়ের মাকে ডাকিয়া বলিলেন, "বৌ-দিদি, একবার এদিকে এস ত মা?" বিনয়ের মাতা মাথায় কাপড় টানিয়া দিয়া দুয়ারের পাশে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তখন ঠানদিদি বলিলেন—হরু তোর ইচ্ছেটা কি!' হরসুন্দর ঈষৎ হাসিয়া অথচ সম্ভ্রমে বলিলেন 'ঠানদি ব্যাপারটা কি তা না জানতে পারলে নিজের ইচ্ছের কথা কেমন করে বলি।' বৃদ্ধা-ঠাকুরাণী এইবার একটু চটিলেন, এবং মুখ বাঁকাইয়া ঝোঁকার ছেপ ফেলিয়া বলিলেন যত দিন যাচ্ছে তত যেন খোকাটি হচ্ছিস্! বিনুর কথা জিজ্ঞাসা করছি।'—'দেখ ঠানদি শ্রীরুকপুরের কুটুম্বেরা যদি তোমাকে ধরে থাকেন তা হলে তাদের পষ্ট করে বোলো যে ও রকম রাঁড়ুনী—বৌ আমি ঘরে জায়গা দিতে পারবো না।'

হরসুন্দরের উত্তর শুনিয়া বৃদ্ধা ঠাকুরাণী একটু অবজ্ঞার হাসি হাসিয়া বলিলেন—'হরু তোর বিষয় বুদ্ধি হয়তো আছে কিন্তু সাংসারিক বুদ্ধি তোর এখনো হয় নি। তুই কি থেকে বুঝলি যে আমি শ্রীরুকপুরের ঠাকুরদের মোক্তারী করতে এসেছি! আমি সে কথা জিজ্ঞাসা করি নি, তুই তোর নিজের ছেলেকে কি করবি! 'কি আর কোরবো। ঘরের ছেলে ঘরে থাকবে। দেখে শুনে আর একটি বিয়ে দেব—এবারে ছেলের পছন্দ মতই বিয়ে দেব।' 'ঠিক বলছিস তো হরু!' 'ঠিক বলছি বই কি—এই দেখ না তুমি এখানে থাকতে থাকতেই বিয়ের সম্বন্ধটা করে ফেলি।'

'কোথায় সম্বন্ধ করছিস্ হরু—সেই ব্যারিষ্টার বাড়ী!'

'ঠানদির কি কলকাতার খবর ও রাখা যায় না!

'হরু তুই ঠিক জানিস যে সে ব্যারিষ্টারের মেয়ের সঙ্গে বিনুর বিয়ে দেওয়াতে পারবি!'

হরসুন্দর এইবার জব্দ পাইলেন। কারণ তিনি জানিতেন যে বিনা উদ্দেশ্যে বৃদ্ধা ঠাকুরাণী কোন কথা কহিতেন না। তিনি হাত জোড় করিয়া বলিয়া উঠিলেন। 'ঠানদিদি এটি ভাল সম্বন্ধ, খোকাই তোমার এটিতে বাগড়া দিও না। মেয়েটি পরীর মত সুন্দরী, নানা রকম ইংরেজী লেখাপড়া শিখেছে। মেয়ের বাপের অনেক টাকা আছে। তার উপর শুনছি বিনুর মেয়েটি পছন্দ হয়েছে।'

'শেষের কথাটি কে বলেছে ভাই?'

'মেয়ের মা-ই বলে পাঠিয়েছেন। বিনু নাকি তার ভাইপোকে পড়ায়, কিন্তু আমার ছেলে হয়ে সে যে কেন মাষ্টারী করতে যায় তা তো বুঝতে পারলুম না। কনের মা সেই ভাইপোকে দিয়ে বিনুকে বাড়ীতে ডাকিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। সেখানে বর-কনের দেখা শুনা হয়ে গেছে—'

'হরু তুই জানিস যে নির্ম্মলের বোন ইন্দু সেই বাড়ীতে মাষ্টারী কোরত, আর এই মেয়ের মা নির্ম্মলের বোনকে নষ্ট দুষ্ট বলে তাড়িয়ে দিয়েছে। একথা বিনু বা নির্ম্মল এখনো শোনে নি। কিন্তু শুনলে কি ফল হবে তা বুঝতে পাচ্ছিস্!'

'যোহাই তোমার ঠানদি, তোমার পায়ে পড়ি, কথাটা এখন দিন কত বোলো না। আগে পাক পাকটা ঘুরিয়ে দি তার পর ছেলে বেটাকে দেখে নোব।'

'হরু, শ্রীরুকপুরের বৌ সাত পাকের বৌ। সুন্দরী বৌ। বড়লোকের মেয়ে। সে না হয় লেখাপড়াই জানে! কিন্তু কলটা কি হয়েছে তা মনে করে দেখ্!'

'একবার হয়েছে বলে কি প্রত্যেকবারই হবে ঠানদি!'

'হরু! তোর টাকার মোহ এখনো কাটে নি। আচ্ছা আমি কাউকে কিছু বলবো না—কিন্তু তোর নিজের ছেলেকে ডেকে জিজ্ঞাসা কর দেখি সে বিয়ে করবে কি না!'

এই সময়ে বিনয়ের মাতা বলিয়া উঠিলেন 'ঠানদিদি শ্রীরুকপুরে যখন বিয়ের সম্বন্ধ হয় তখন আমি ঢের বারণ করেছিলুম, কিন্তু টাকার লোভে উনি আমার কথা শোনেন নি। এবারও বলছি, সে মেয়ে বিনুর মনে ধরে নি। আর সে মেয়ে আমাদের পাড়াগাঁয়ে গেরস্তর ঘরে চলবে না। তার জন্যে হয় তো সৈন্যিক ভিটে ছেড়ে কলকাতায় এসে বাস করতে হবে।'

হরসুন্দর রাগিয়া বলিলেন 'তুমি কি করে জানলে যে সে মেয়ে বিনুর পছন্দ নয়।'

'দেখ রেগে লাভ নেই, মানুষের মন যেমন মানুষে যত শীঘ্র বুঝতে পারে পুরুষে তা পারে না। বিনু আমার এক সন্তান। আমার কাছে সে ছোটটিই আছে। এবার যদি তুমি তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর করে বিয়ে দিতে চাও, তা হলে হয় তো একটা বিপদ হবে।'

হরসুন্দর বিদ্রূপের মত হাসিয়া বলিলেন 'দেখ, বিনু যেমন তোমার ছেলে তেমনি আমার ছেলেও তো বটে। তুমি দেখো সে কখনো আমার অবাধ্য হবে না।'

নৃত্য-ঠাকুরাণী বলিলেন 'হক ভাই,' কথাটা তুমি তলিয়ে বুঝছ না। এখন জোর করতে গেলে কাজ বিপরীত হবে। আমার কথায় তোমার যদি বিশ্বাস না হয় তা হলে ছেলেকে ডেকে জিজ্ঞাসা করতে পার।

হরসুন্দর মনে মনে বিষম চটিলেন। কারণ তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কেহ কোন কথা কহিলে তিনি তাহা সহ্য করিতে পারিতেন না। নৃত্য-ঠাকুরাণীর ভয়ে মনের ভাব গোপন করিয়া হরসুন্দর বিনয়কে ডাকিলেন, এবং বিনয় আসিলে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন 'বিনু বালীগঞ্জের ব্যারিষ্টার ঘোষাল সাহেবের মেয়ের সঙ্গে তোর বিয়ের সম্বন্ধ করেছি। মেয়ের মা বলে পাঠিয়েছেন যে মেয়ে দেখে তোর পছন্দ হয়েছে,—'

এই সময়ে বিনয় হঠাৎ বলিয়া উঠিল 'আজ্ঞে না।'

হরসুন্দর বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন 'না কি রে!'

পূর্ব্বে বিবাহের কথা বলিলে, বিনয় লজ্জিত হইত, কিন্তু এবারে সে স্পষ্ট বলিয়া ফেলিল 'সে মেয়ে আমার মোটেই পছন্দ হয় নি।'

তাহার উত্তর শুনিয়া নৃত্য-ঠাকুরাণী গম্ভীরমুখে প্রচুর পরিমাণে দোক্তা টানিয়া দিয়া হাস্য গোপন করিলেন। হরসুন্দর বিস্মিত হইয়া আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, 'সে মেয়ে দেখা পড়া জানে, সুন্দরী, তবে তোর পছন্দ হয় নি কেন!'

বিনয়, কিঞ্চিন্মাত্র অপ্রতিভ না হইয়া উত্তর দিল 'আজ্ঞে, তা বলতে পারি না।'

এই সময়ে বিনয়ের মাতা বলিলেন 'ছেলেটাকে আর বকাচ্ছ কেন—ছেড়ে দাও। বিনু তুই নীচে যা।'

বিনয় পিতার মুখের দিকে চাহিল, তিনি বলিলেন 'যাও।'

মুক্তি পাইয়া বিনয় নীচে চলিয়া গেল। তখন হতাশ হইয়া হরসুন্দর নৃত্য-ঠাকুরাণীকে জিজ্ঞাসা করিলেন 'এখন উপায়!'

নৃত্য-ঠাকুরাণী বলিলেন 'উপায় এখনো আছে। এখনো আমার কথা শোন, হরমোহনের মেয়ের সঙ্গে ছেলের বিয়ে দে।

হরসুন্দর কাঁপিতে কাঁপিতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, 'সর্ব্বনাশ—সে যে বিধবা! তুমি কি আমার পিণ্ডলোপ করতে চাও ঠানদিদি!'

নৃত্য-ঠাকুরাণীও উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন 'বিধবার ছেলে যে পিণ্ড দিতে পারে না—এ কথা ত আমি কখনো শুনি নি। হক তুই আমাকে স্পষ্ট করে বল তুই ছেলে চাস না টাকা চাস্!

বিনয়ের মাতা কি বলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু তাহাকে বাধা দিয়া হরসুন্দর বলিলেন—যে ছেলে বাপের অবাধ্য যে ছেলে বিধবা বিয়ে করতে চায়—সে ছেলে থাকার চেয়ে মরা ভাল।

নৃত্য-ঠাকুরাণী মনের আবেগে বলিয়া ফেলিলেন 'তবে তোর টাকাই থাক্ ছেলে নিয়ে আমি চল্লুম।'

রাগে ও অভিমানে হরসুন্দর স্তব্ধ হইয়া গেলেন। কিন্তু বিনয়ের মাতার মুখে ঈষৎ হাস্যের চিহ্ন দেখিতে পাওয়া গেল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

সেই দিন সন্ধ্যা বেলায় কালীঘাটে একটি ছোট দোতলা বাড়ীর নীচে বসিয়া ক্ষীণ প্রদীপের আলোকে ইন্দু রন্ধন করিতেছিল। বাড়ীতে আর কেহ ছিল না। সুতরাং সে ঠানদিদির হুকুম মত দুয়ার বন্ধ করিয়া ছিল। একা সে জীবনে কখনো থাকে নাই সুতরাং তাহার ভয় হইতেছিল। তাহাকে বাসায় পৌঁছাইয়া দিয়াই ঠানদিদি চলিয়া গিয়াছিলেন, সুতরাং বাসার কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবার সময় তাহার ছিল না। ঠানদিদি তাহাকে দিয়া দিয়া রন্ধন করিতে বলিয়াছিলেন। সুতরাং সে যাহা হইয়া থাকিতেছিল।

সন্ধ্যার সময়ে এক খানা ভাড়াটিয়া গাড়ী আসিয়া দুয়ারে দাঁড়াইল। দুয়ারের কড়া নড়িতে ইন্দু সভয়ে জিজ্ঞাসা করিল কে?' তাহাকে অভয় দিবার জন্য বৃত্য-ঠাকুরাণী দুয়ারের বাহিরে দাঁড়াইয়া বলিলেন—'ভয় নেই গো ইন্দু দিদি আমি।'

ইন্দু দুয়ার খুলিয়া দেখিল যে ঠানদিদির সহিত বিনয় দাঁড়াইয়া আছে। ইন্দু বিনয়কে দেখিয়া মাথার কাপড় টানিয়া দিয়া সরিয়া গেল। বাড়ীর ভিতরে আসিয়া বৃত্য-ঠাকুরাণী দেখিতে পাইলেন যে রন্ধন তখনো শেষ হয় নাই এবং ইন্দুর আহার হয় নাই। সুতরাং তিনি বিনয়কে অন্য ঘরে বসাইয়া নিজে রাঁধিতে বসিয়া গেলেন। রাঁধিয়া ইন্দুকে খাওয়াইয়া তিনি যখন উপরে উঠিলেন তখন বিনয় অস্থির হইয়া পায়চারী করিতেছিল, সে ঠানদিদিকে দেখিয়া বলিয়া উঠিল 'ঠানদিদি রাত্রি হয়ে গেল, আমার যে রান্নাঘরে ফিরতে দেরী হয়ে যাবে। আমার দেরী হলে মা যে বড় ভাবেন।'

ঠানদিদি হাসিয়া বলিলেন 'তোর আর ন্যাকরা করতে হবে না। আমি তোর মাকে বলে এসেছি।'

বিনয় নিরুত্তর হইয়া বসিল। তখন বৃত্য-ঠাকুরাণী ইন্দুকে বুঝাইতে বসিলেন, তিনি বিনয়ের কথা বলিতে আরম্ভ করিলেই বিনয় সে ঘর ছাড়িয়া বাহিরের খোলা ছাদে চলিয়া গেল। ইন্দু কিন্তু সাদা পাথরের মূর্ত্তির মত স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। বিনয় তাহাকে কতটা ভালবাসে এবং ধনীর গৃহের সুন্দরীর কন্যা ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিবাহ করিয়া তাহার কি কর্ম্ম হইয়াছে, তাহার ভবিষ্যৎ কতটা অন্ধকার তাহার জীবন কি রকম উদ্বেগ হীন এই সকল বলিয়া বৃত্য-ঠাকুরাণী যখন বলিলেন 'ইন্দু ভাই, আমি অনেক পাপ করেছি। এখন তার প্রায়শ্চিত্ত করছি। পরম কুলীন সদানন্দ চক্রবর্ত্তীর মেয়ের সঙ্গে তোর ভাইয়ের বিয়ে দিয়েছি। বিয়ে কেবল ব্রহ্ম-শাপ কুড়িয়েছি। এখন তোর সঙ্গে বিনয়ের বিয়ে দিতে চাই।'

শেষের কথাটা শুনিয়া ইন্দুর মুখ লাল হইয়া গেল। সে উত্তর দিল না। বৃত্য-ঠাকুরাণী বলিয়া যাইতে লাগিলেন 'দেখ—বিয়ের অমত হবে না। কিন্তু বিনয় বাপ সহজে রাজী হবে না। মোহিনীর বিয়ের সময়েও এই রকম হয়েছিল। অপরাধ পাপ যা কিছু হয়, আমারই হবে। আমি ব্রহ্ম-শাপের ঝুড়ি মাথায় তুলে নিয়ে স্বর্গ-ত্যাগী হব। কিন্তু তোরা দু'জন তো সুখী হবি।'

হঠাৎ ইন্দুর মুখের বাঁধন খুলিয়া গেল, সে বলিয়া উঠিল দিদি—বৌদির সম্পর্কে আপনি কে হন তা জানি না, কিন্তু আমি কারু মনে কষ্ট দিতে পারবো না। আমার সুখের জন্যে যে আমি একটা সংসারে চির দিনের মত আগুন লাগিয়ে দেব তা আমি পারবো না। আমার অদৃষ্টে ভগবান যা লিখেছিলেন। তাই হয়েছে।'

বৃত্য-ঠাকুরাণী একবার বিস্মিত হইয়া ইন্দুর মুখের দিকে চাহিলেন। তাহার পর তার চোখের জলে বুক ভাসিয়া গেল, তিনি ইন্দুকে কোলে জড়াইয়া ধরিয়া বলিয়া উঠিলেন 'আমি কেবল তোর জন্যে বলি নি ভাই,—তোর ভাই যখন পাগল হয়েছিল, একদিন সদানন্দের জন্য গৌরমোহনের সংসার যেমন উচ্ছন্ন যেতে বসেছিল আজ হরসুন্দরের সংসারও সেই রকম উচ্ছন্ন যেতে বসেছে, টাকার মোহে হরু তা বুঝতে পাচ্ছে না। ইন্দু ভাই—আমি কেবল তোর জন্যে বলি নি—আমি বিনয়ের জন্য বলছি। তার মার মুখ চেয়ে বলছি। হরু এখন বুঝছে না, কিন্তু কিছু দিন পরে বুঝবে। বিনয় যে তোর জন্যে কতদূর পাগল, তা হয় তো তুই বুঝতে পাচ্ছিস না। আমি বলি তুই বিনয়কে বিয়ে কর। আমি তোদের হাসি মুখ দেখে কাশী চলে যাই।

প্রথমে ইন্দু কিছু বলিল না অনেকক্ষণ পরে চোখ মুছিয়া সে রুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, 'দিদি আপনি আমার অপরাধ নেবেন না। আমি কারো মনে কষ্ট দিতে পারবো না।' এই বলিয়া ইন্দু উঠিয়া দাঁড়াইল। এবং ঘরের দুয়ারে গিয়া বিনয়কে ডাকিয়া বলিল—'বিনু-দাদা—মিসেস্ ঘোষাল আমাকে কেন তাড়িয়ে দিয়েছেন আপনি জানেন কি?'

বিনয় উৎকণ্ঠিত চিত্তে জিজ্ঞাসা করিল 'সে কথা তো আমারা কেউ জানি না ইন্দু। তুমি ঘোষালদের বাড়ী থেকে চলে গিয়েছ সেই কথা শুনে নিজে তোমার খুঁজতে

যেছিয়েছে। ঠানদিদি আমাকে ডেকেছেন তাই আমি এখানে এসেছি। এখানে এসে দেখছি যে তুমি ঠানদিদির বাসায় আছ।'

ইন্দু বলিল 'মিসেস্ ঘোষাল আমাকে দুশ্চরিত্রা বলে তাড়িয়ে দিয়েছেন। আমি নাকি——

ঠানদিদি হঠাৎ উঠিয়া ইন্দুর মুখ চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন—সে কথা এখন বিনুকে বলে কাজ নেই দিদি!

ইন্দু সবলে ঠানদির হাত ছাড়াইয়া লইয়া বলিল 'না ঠানদিদি—সে কথা বলাই ভাল। বিনু দাদা সকলের মত যে আমার সংস্পর্শে এসে আপনার চরিত্র খারাপ হয়েছে—আর আমার জন্যই আপনি আপনার বিবাহিতা স্ত্রীর কাছে যান না। আমি হিন্দুর মেয়ে ব্রাহ্মণের বিধবা এর চাইতে বড় অপবাদ ব্রাহ্মণের বিধবার আর কিছু হতে হতে পারে না। এখন থেকে আপনার সঙ্গে দেখা হলেও আমার কলঙ্ক হবে। বিনু-দাদা আপনি চলে যান—মাকে বলবেন আমি ভাল আছি—কিন্তু আপনি আমার কাছে আর আসবেন না—এলে হয় তো আমাকে আত্মহত্যা করতে হবে।

বিনয়ের কাল মুখখানা হঠাৎ সাদা হইয়া গেল। সে বারান্দার রেলিংটা জোরে চাপিয়া ধরিল। অনেকক্ষণ কেহ কোন কথা কহিল না। নৃত্য-ঠাকুরাণী একবার বিনয়ের মুখের দিকে আর একবার ইন্দুর মুখের দিকে চাহিলেন। ইন্দুর চোখ দিয়া তখন আগুন বাহির হইতেছিল। বিনয় কিন্তু ইন্দুর দিকে না চাহিয়া আকাশের দিকে চাহিয়াছিল।

অনেকক্ষণ পরে বিনয় বলিল 'ইন্দু এ সকল কথা আমি শুনি নি—তাই এসেছিলুম, তুমি যে এখানে আছ—তাও আমি জানতুম না, জানলে হয়তো আসতুম না। আজ থেকে তুমি নিশ্চিন্ত থাক, তুমি না ডাকলে আমি জন্ম থাকতে তোমার নিকটে আসবো না।'

কথাটা শেষ হইবার পূর্বেই বিনয় নামিয়া চলিয়া গেল। যাইবার সময় ইন্দুর দিকে ফিরিয়াও চাহিল না। ইন্দু সেই খানেই দাঁড়াইয়া রহিল। অনেকক্ষণ পরে নৃত্য-ঠাকুরাণী জিজ্ঞাসা করিলেন। 'ইন্দু দিদি চল তোকে বাপের বাড়ী দিয়ে আসি।'

ইন্দু ধীরে ধীরে কহিল 'দিদি আমার স্বামী সে আশায় ঘুচিয়ে দিয়েছেন।'

'তবে এখন কি করবি ভাই?'

'কি করবো ভাই ভাবছি দিদি। কাল সকালে অন্য কোথাও যাব।'

তখন ইন্দুকে জড়াইয়া ধরিয়া নৃত্য-ঠাকুরাণী বলিয়া উঠিলেন 'যেখানেই যাবি—আমাকে তোর সঙ্গে যেতে হবে ভাই —।'

ইন্দু বিস্মিতা হইয়া জিজ্ঞাসা করিল. 'কেন দিদি?'

নৃত্য-ঠাকুরাণী বলিলেন 'অদৃষ্টের লিখন দিদি।' দুইটি বিধবা বিনিদ্র অবস্থায় সমস্ত রাত্রি কাটাইয়া দিল। সকালে নৃত্য-ঠাকুরাণী বাসা তুলিয়া দিয়া ইন্দুর সহিত চলিয়া গেলেন; নির্মল এক ঘণ্টা পরে আসিয়া তাহাদের সন্ধান পাইল না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ, প্রথম পরিচ্ছেদ

সকালে উঠিয়া বিনয় তাহার মাতাকে বলিল, 'মা চল বাড়ী যাই।'

বিনয়ের মাতা অতিশয় বুদ্ধিমতী—তিনি পুত্রের মুখের ভাব দেখিয়া রাত্রিতেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে নৃত্য-ঠাকুরাণী বিনয় বা ইন্দুকে বিবাহে সম্মত করাইতে পারেন নাই। তাহার মন অত্যন্ত চঞ্চল হইয়াছিল। কারণ তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে ইন্দুর সহিত বিনয়ের বিবাহ দিতে না পারিলে তাহার স্বত্ত্ব বংশের ভবিষ্যৎ অতি অন্ধকার। বিনয় দেশে ফিরিতে চাহিলে তাঁহার মন আনন্দে নাচিয়া উঠিল, কারণ পুত্রের মুখের ভাব দেখিয়া তাহার ভয় হইয়াছিল যে বিনয় হয়তো বিবাগী হইয়া যাইবে।

হরসুন্দর পাশের ঘরে বসিয়াছিলেন, অবিনাশ ঘোষালের দশ সহস্র টাকার শোক তাঁহাকে অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছিল। তিনি এক মনে পুত্রের নির্দ্ধিতা ও নিজের অন্যত্র সময়ের কথা ভাবিতেছিলেন। এই সময়ে বিনয়ের মাতা আসিয়া বলিলেন, 'দেখ বিনু যেতে চাচ্ছে—চল আমরা আজই চলে যাই।'

হরসুন্দর বিনয়, বদনে জিজ্ঞাসা করিলেন লক্ষ্মীছাড়া

বাবার ছেলে তবে কিছুতেই ঘোষালের মেয়েকে বিয়ে করবে না।'

বিনয়ের মাতা বলিলেন, 'দেখ একটিবার আমার কথা রাখ, তুমি কিছুদিন বিনয়ের বিয়ের কথা ভুলে রাখ। ছেলেটাকে সামলাতে দাও। চল দেশে ফিরে যাই। সেখানে কিছু দিন থাকলে হয়তো ওর মতি গতি বদলাতে পারে।'

আর একবার চেষ্টা করে দেখলে হোতো না! দেখ অনেকটা টাকা, কুটুম্ব ও ভাল—'

'টাকার চিন্তা একবার ছাড়, টাকা টাকা করে, ছেলে-টাকে মারতে বসেছ—তা বুঝতে পাচ্ছ না কি? ছেলেই যদি না বাঁচে তা হলে টাকা নিয়ে তোমার আমার কি হবে!'

'একবার বিয়েটা জোর করে দিতে পারলে বুঝে নিতুম ছেলের মন বদে কি না বসে।'

'এবার আর পারবে না। শ্রীকৃষ্ণপুরের বিয়ের বারে, বিনু তোমার কথা শুনেছিল—কিন্তু এবার শুনবে না। আমি বলছি শোন, বিনু অন্য রকমের ছেলে।'

এই সময়ে নির্ম্মল ছুটিতে ছুটিতে উপরে আসিয়া বলিল 'মা ইন্দু তো সেখানে নেই!'

বিনয়ের মাতা ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন 'ঠানদিদি সেখানে নেই কি!'

নির্ম্মল বলিল না, সে বাসায় কেউ নেই। বাড়ীওয়ালা কালীঘাটের একজন পাণ্ডা সে বল্লে দুটী বিধবা স্ত্রীলোক সকাল বেলায় উঠে কোথায় চলে গেছে।

'তোমার ভয় নেই বাবা, ঠানদিদি যখন ইন্দুর সঙ্গে আছেন তখন তার কোন অমঙ্গল হবে না।'

নির্ম্মল চোখের জল রাখিতে পারিল না। তাহা দেখিয়া বিনয়ের মাতা অঞ্চল দিয়া তাহার চোখ মুছাইয়া বলিলেন কেঁদো না বাবা। তোমরা নেহা-ঠানদিদিকে চেন না। চল আমি তোমাদের বাড়ী যাই, তোমার মাকে বুঝিয়ে আসি। মেয়েটা বড় ঘা খেয়েছে। তাই পাগলের মত ছুটে বেড়াচ্ছে। তুমি একখানা গাড়ী ডেকে নিয়ে এস।'

নীচে নামিয়া গিয়া নির্ম্মল যখন বিনয়কে সমস্ত কথা বলিল তখন বিনয় অবিচলিত ভাবে শুনিয়া গেল এবং নির্ম্মলকে তাহার কাছে বসাইয়া তাহাকে শান্ত করিয়া রাত্রির কথা সমস্ত খুলিয়া বলিল। সমস্ত কথা শুনিয়া নির্ম্মল আবার অশান্ত হইয়া উঠিল। সে পাগলের মত বলিয়া উঠিল 'তবে ইন্দুর কি হবে ভাই! আমি যে মনে করেছিলুম যে মলিনাক্ষ একটা দুঃস্বপ্ন—সেটা কেটে গিয়েছে। ঠানদিদি ইন্দির সঙ্গে তোর বিয়ে দিয়ে এই দুটো সংসারের অশান্তি ঘুচিয়ে দেবেন! তাতো হোলো না, ইন্দি কোথা গেল—মা সে কেঁদে কেটে অস্থির হচ্ছেন!'

বিনয় স্থির হইয়া বলিল—'নিরু সংসারটা যত সহজ ভেবেছিলুম তত সহজ নয়। কাল রাত্রে ইন্দুর যে মূর্ত্তি দেখেছি তাতে অন্ধ হয়ে গেছি। আমাদের ঘরের মেয়ে কর্ত্তব্য স্থির জেনে মন এত শক্ত করতে পারে, তা আমি জানতুম না। নিরু ইন্দুর মানসিক শক্তি দেখে আমি আমার নিজের মনটাকে বশ করে ফেলেছি। সে হিন্দুর ঘরের বিধবা, সে ব্রাহ্মণের মেয়ে, অদৃষ্টের উৎপীড়ন সে মাথা পেতে নেনে নিয়েছে সুতরাং তাকে আমাদের চাকলা দেখিয়ে চকল করা উচিত নয়। সে যখন ঠান-দিদির সঙ্গে আছে তখন তার জন্যে ভয় করিস নি, তার আত্মীয় স্বজন বা পয়সার অভাব কোন দিন হবে না। মার কথাই ঠিক। তুই যাকে তোর মার কাছে নিয়ে যা, আমরা হয়তো দুই এক দিনের মধ্যেই দেশে চলে যাব।'

নির্ম্মল বিনয়কে শান্ত দেখিয়া বিস্মিত হইয়া গেল। সে গাড়ী আনিয়া বিনয়ের মাতাকে লইয়া চলিয়া গেল। তাহারা চলিয়া যাইবার দশ মিনিট পরে আর এক খানা গাড়ী আসিয়া বিনয়ের বাসার দুয়ারে দাঁড়াইল, পরেশচন্দ্র তাহার বৃহৎ বপু কষ্টে কোচবাক্স হইতে নামাইয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। বিনয় তখন বাড়ীর সম্মুখেই দাঁড়াইয়া ছিল তাঁহাকে দেখিয়া প্রণাম—করিয়া পরেশ বলিল, 'এজ্ঞে বড় দিদিমণি এসেছেন, গাড়ীর দুয়ার খুলিয়া বিনয় সারদা ও তাহার দাসীকে উপরে লইয়া গেল। তাহার ভাব দেখিয়া পরেশ মনে করিল যে এত দিনে সে ঘিতিয়াছে।

একঘণ্টা পরে বিনয়ের মাতা যখন ফিরিয়া আসিলেন তখন তিনি সারদাকে দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন। সারদা তাঁহার সম্মুখে হরসুন্দরের দুই পা জড়াইয়া ধরিয়া তাঁহাকে অস্থির করিয়া তুলিল। তিনি উপায়ান্তর না দেখিয়া বিনয়কে ডাকিয়া পাঠাইলেন। পরেশ বাবুও বিনয়কে কোন কথা বলে নাই তথাপি সারদার আগমনের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়াছিল। সে উপরে আসিলে সারদা যখন তাহার হাত ধরিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিল সে স্থির হইয়াই দাঁড়াইয়া রহিল। সারদার কথা শেষ হইলে বিনয় বলিল 'দিদি আপনি যে বলছেন তা হয় তো ঠিক এ রকম অবস্থায় হয় তো আমার আপনাদের বাড়ী যাওয়া উচিত—কিন্তু আমি যাব না। বিয়ের কথাটা এখনো আমার মনে আছে। আপনি থালাটা ছুঁড়ে না ফেলে দিলে হয় তো সেই দিনই আমার ভবলীলা সাঙ্গ হয়ে যেত, কিন্তু সে কথাও আমি এখন বলছি না, গোড়া থেকেই আমার আপনাদের হাব ভাব ভাল লাগে না, সেই জন্য কর্ত্তব্য হলেও আর শ্রীকৃষ্ণপুরে যাব না।

সারদা তখন অন্নদাকে হরিহরপুরে পাঠাইবার কথা বলিল। অবিনাশ ঘোষালের দশহাজার টাকার আশা ছাড়িয়া হরসুন্দরের মন আবার শ্রীকৃষ্ণপুরের দিকে ঝুঁকিয়াছিল। সারদার অনুনয়ে বিনয়ে তিনি যখন অন্নদাকে হরিহরপুরের গৃহে আশ্রয় দিতে সম্মত হইলেন তখন বিনয় কিছু বলিল না, কেবল ওষ্ঠ দংশন করিয়া রহিল।

বিনয়ের মাতা ভয় পাইলেন, তিনি কখনো পুত্রের মুখে দৃঢ় প্রতিজ্ঞার এত দৃঢ় রেখা দেখেন নাই। সারদা ভাবিল যে এতক্ষণে সে অন্ধকারে আলো দেখিতে পাইয়াছে। সে বিনয়ের পিতা মাতার নিকট প্রতিজ্ঞা করিল যে সে নিজে অন্নদাকে হরিহরপুরে লইয়া আসিবে।

আহারের পরে বিনয় মাতাকে বলিল যে সে এখন হরিহরপুরে যাইবে না। সন্ধ্যার পূর্ব্বে হরসুন্দর বিনয়কে ডাকিয়া খুঁজিয়া পাইলেন না। বিনয় সে দিন বাসায় ফিরিল না। সুরু অন্ন করিয়াছিল মনে করিয়া সারদা হরসুন্দরের সংসারে একটা নূতন বিপ্লবের সৃষ্টি করিয়া দিল।

পল্লীবাস

[শ্রীচণ্ডীচরণ মিত্র।]

ভায় পল্লব-ছায়ে মোর পর্ণকুটীর,
এর চিত্র যে মনে গাঁথা' সদা সুন্দর।
নীল নিঃসীম নভোরূপ কিবা গম্ভীর,
বায়ু মন্দ বহিয়ে দেয় তোলে মর্ম্মর!

কত মধুর বেণু ওড়ে প্রথম প্রাতে,
গোপে ধান্য বলাকা-শ্রেণী অম্বর-গায়;
বলে ক্ষেত্রে সুষমা-ছবি রৌদ্রপাতে,
নব ছন্দে সকলি যেন মজ্জিত তায়!

কোন বৃক্ষে বা গায় পাখী মিষ্ট-সুরে,
কোটে গুল্ম কত না এরি আর্দ্র ভূঁয়ে,
শুনি মন্দির হ'তে শাঁখে শঙ্খ ঘুরে,
যায় গন্ধদীপের বাস মর্ম্ম ছুঁয়ে!

কিবা কৌমুদীস্নাত নিশা শুভ্র-হাসে,
পাশে গঙ্গাটি কুল্‌কুল্ বয় গো চুপে!
প্রাণে শান্তি সতত রাজে পল্লীবাসে,
দুখ চিন্তা আসে না যেথা কোনও রূপে।

ইউরোপের চোখে বিশ্বভারতী

[শ্রীদেবী মুখোপাধ্যায়]

বোলপুর শান্তি নিকেতনে প্রতিষ্ঠিত নূতন বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্বভারতী' আজ আমাদের দেশের সঙ্গে ততটা বেশী পরিচিত হয়ে উঠতে পারে নি, যতটা সে হয়েছে ইউরোপের সঙ্গে। আজ প্রায় বিশ বৎসর পূর্ব্বে এই বিশ্ব ভারতীর প্রথম উদ্বোধন হয়েছিল। তখন যে বীজ সবে মাত্র অঙ্কুরিত হয়েছিল, আজ সে পল্লবিত হ'য়ে উঠেছে—আজ বিশ্বভারতী জগতের সাম্‌নে এমন একটি উজ্জ্বল দীপ শিখা প্রজ্বলিত করে দিয়েছে, যাতে সারা বিশ্ব উদ্‌গ্রীব হয়ে এর ভবিষ্যতের দিকে চেয়ে রয়েছে। ইউরোপ আজ বিশ্বভারতীকে কি রকম চোখে দেখ্‌ছে সেটা আমাদের লক্ষ্য করা উচিত। গত ৭ই পৌষ বোলপুর শান্তি নিকেতনে "পৌষ উৎসবে" শান্তি নিকেতনের ভূত পূর্ব্ব ছাত্রদের যে সভা হয়েছিল, সেখানে শ্রীযুক্ত কালিদাস নাগ মহাশয় বলেছিলেন :—

নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বিশ্বভারতী সম্বন্ধে ইউরোপের মনীষিগণের অভিমতটুকুই আমি আজ আপনাদের কাছে নিবেদন করব। আমি বিশ্বভারতীর ছাত্র ছিলুম না—কাজেই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে শুধু তাঁর কাব্যের ভিতর দিয়েই ছেলেবেলা থেকে একটু আধটু পরিচয় ঘটেছিল। কাব্যের মাধুর্য্যই শুধু আমাকে আকৃষ্ট করেছিল। যখন ইউরোপে শিক্ষালাভ করিতে যাই তখনও তাঁর বিশ্বভারতী সম্বন্ধে তত উৎসুক হইনি, যতটা হয়েছিলুম তাঁর কাব্য সম্বন্ধে। ইউরোপে গিয়ে একমাত্র তাঁর অনুগ্রহেতেই এমন সব মনীষিগণের সঙ্গে পরিচিত হবার সৌভাগ্য লাভ করে ছিলুম, যে তিনি সে সময়ে বিদেশে না থাকলে আমি বোধ হয় কখনই তাঁদের সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ পেতুম না। ইউরোপে ছাত্ররূপে যাওয়ার জন্য একটু বিশেষ রকম অসুবিধাও ভোগ করতে হয়েছিল। সেখানকার শিক্ষকেরা আর সে রকম আগ্রহ নিয়ে ছাত্রদের শিক্ষা দেন না বাস্তবিকই ছাত্র হয়ে যাওয়ায় আজ কাল আমাদের দেশের অনেক অসুবিধা সহ্য করতে হবে। তারা বলে,—তোমরা কি চিরকালই ছাত্র হয়ে আমাদের দোরে আসবে? আমরা কি চিরকালই তোমাদের দিতে থাকব? তোমরা কি আমাদের কিছু দেবে না? কেবল মাত্র এক ঘেয়ে ভাবে দান করে করে তারা বেশ বিরক্ত হয়ে উঠেছে বোঝা গেল। আমিও লজ্জিত আর দুঃখিত না হয়ে থাকতে পারলুম না। তারা বলে—'তোমাদের সব প্রাচীন পুঁথির মধ্যে যে সব দর্শন, বৌদ্ধ যুগের যে সব জ্ঞান রত্ন ছিল সে সব তোমাদের কোথায় লুপ্ত হয়ে গেল? তোমাদের দেশের বিশিষ্টতা কোথায় গেল? তখন তাদের কথা শুনে নিজেদের দৈন্য স্মরণ করে, দেশের জ্ঞান রত্নের আকর কোথায় তার সন্ধান করতে প্রবৃত্ত হলুম। সত্যই ত আমরা আমাদের দেশের নিজ স্বরূপ হারিয়ে ফেলেছি! যাই হোক দেশের অন্তর দিকে একবার সন্ধানী চোখ ফেরাতে হল। এই সময়েই রোমাঁ রোঁলা, পাসেল প্রভৃতি বিশ্ববিখ্যাত মনীষিদের সঙ্গে আলাপ ঘটল। রোঁলার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের চিন্তার ধারার এমন একটা অপূর্ব্ব মিল আছে যেটা সাধারণতঃ দুজনে মনীষীদের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায় না। আমেরিকার কোন সভার নিমন্ত্রণ পেয়ে রবীন্দ্রনাথ যখন ১৯১৬ সালের যুদ্ধের জন্য লক্ষ্য স্থানে পৌঁছুতে না পেরে, জাপানে বসেই Nationalism বক্তৃতাটি লিখলেন, ঠিক সেই সময়েই রোমাঁ। Above the battle field নামে একখানি বই প্রণয়ন করলেন। যদিও দুই গ্রন্থকারের মধ্যে এক পূর্ব্বে এই গ্রন্থের ভাব সম্বন্ধে কোনও রকম আলোচনা হয় নি, তবু আশ্চর্য্যের বিষয় যে উভয়েরই বাণীর মধ্যে একটা অপূর্ব্ব সামঞ্জস্য আছে। এই রকম ভাবের বিশ্বজনীন ভাব প্রকাশ করে, নিজের দেশের দোষ ত্রুটি দেখিয়ে দেবার জন্য তিনি (রোঁলা) দেশ থেকে তাড়িত হয়েছেন, অথচ তাঁদের বিবেক বুদ্ধির বলে, যেটাকে সত্য রূপে গ্রহণ করেছেন, তাকে জীবনে পরিত্যাগ করতে পারেন নি। এঁদের একটা গুপ্ত সমিতি আছে। সে সমিতির উদ্দেশ্য জগতে অহিংসার বাণী প্রচার করা—বিশ্বকে আপন করে নেওয়া। এই সমিতির এক বৈঠকে গিয়ে হাজির হয়েছিলুম। সেখানে বিভিন্ন দেশবাসীর এই ধরণের বিশ্ব প্রেমিক লোক নিজ নিজ দেশের সম্পদ রূপ জ্ঞান ভাণ্ডার মুক্ত করছিলেন। আমি অবশ্য তাঁদের সভায় সে অবের কিছু দান প্রথমে করতে পারিনি।

তাঁরা যে কথা গুলি বললেন তার মধ্যে ফুটে উঠেছিল বিশ্বের মঙ্গল সাধনা—তাঁরা বলেন, দেশের ইতিহাস লেখকেরা সভ্যতার মুখোস পরিয়ে হিংসা আর মিথ্যাকে সত্য বলে জাহির করছে। এই রকম ভাব ফুটিয়ে তোলার জন্যই এই ভীষণ যুদ্ধটা। এই সভ্য-জগতের বুকে অমন নৃশংস পাশব ভাবে সম্পন্ন হয়ে গেল। যখন তাঁরা বিশ্বজনীন ভাব প্রকাশ করে—সেইটাকেই নিজেদের গৌরব—কর ধান বলে প্রচার করলেন, তখন আমার মনে পড়ল বিশ্ব ভারতীর কথা, রবীন্দ্র নাথের কাব্যের কথা—যেখানে এই বিশ্বজনীন ভাব বেশ স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে। আমি তখন রবীন্দ্রনাথের কাব্য থেকে অনুবাদ করে তাঁদের শোনাতে লাগলুম। তাঁরা সেটা শুনে চমৎকৃত হয়ে গেলেন। তখন তাঁরা বল্লেন কৈ আমরা ত এ জানতুম না। আপনাদের যদি এ সব সম্পদ আছে তবে এতদিন আমাদের জানান হয় নি কেন? এই ত এক চমৎকার জিনিষ রয়েছে যেটা ভারত ইউরোপকে অক্লেশে দিতে পারে। এমন ব্যবস্থা শীঘ্র করে ফেলুন, যাতে এই গুলি সকলে জানতে পারে। এটা না হলে Internationalism জিনিষটা কিছুতেই গড়ে উঠতে পারছে না। তারপর তাঁরা আক্ষেপ করে বললেন—আমরা ত বর্ত্তমান ইতিহাস বা সংবাদ পত্রের মধ্যে দিয়ে তোমাদের দেশের এমন একটা রূপ দেখতে পাই যেটা দেখলে আমাদের হাসি আসে। আমরা যে রাষ্ট্র-নীতিকে ত্যাগ করছি, সেইটাকেই তোমরা সাজিয়ে গুছিয়ে নিজের মনের মত করে নিয়ে বলছ, আমরা তোমাদের সমান অধিকারী হয়েছি। কিন্তু সেটা বোঝা একটা মস্ত ভুল। তোমাদের দেশের যে সম্পদ আছে, তা দান করতে হবে, নচেৎ অধিকার অধিকার বলে শুধু চেঁচালে কিছু হবে না।

কাজেই এখন এমন সব নতুন ইতিবৃত্ত লেখকের প্রয়োজন—যারা প্রচার করবেন শুধু অহিংসা আর প্রীতি এটা দেশের নিজস্বরূপ। আমাদের দেশের-এই নিজস্ব জিনিষটি দেশের মধ্যে থেকে উঠেছে। এই বিশ্বভারতীতে বিশ্বভারতীর গুরু যে ভাবটিকে ফুটিয়া তুলেছেন, সেটি বিশ্বজনীন ভাব। এই ভাবকে বিশ্বের ভাবধারার সঙ্গে মেলানোর জন্য এখনও বহু আয়াস করতে হবে। অহিংসা ও সাম্যনীতি প্রচার করতেই হবে, কেন না সেটা হচ্ছে দেশের নিজস্ব সুর। তাই এই নীতি প্রচারণ করে ভারতের এক প্রান্ত থেকে মহাত্মা গান্ধী আর, অন্যপ্রান্ত থেকে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বের সম্মুখে ভারতের নূতন রূপের ছবি ধরেছেন। দুজনের কাজের মধ্যে সামান্য প্রভেদ থাকলেও, চিন্তার ধারা আর লক্ষ্য একই। মহাত্মাও বলেন যে, অহিংসার সাহায্য দেশোদ্ধার হবত হোক্, আর হিংসায় যদি করতে হয় তবে তাতে কাজ নেই। রবীন্দ্রনাথও শোনাচ্ছেন এই প্রীতির সুর। 'বিশ্বভারতী' কথাটাই যে কত চমৎকার তা একটু তলিয়ে বোঝবার চেষ্টা করলেই বেশ স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়বে! ইউরোপের সকলে এই জিনিষটার ওপর আগ্রহভরা দৃষ্টি রেখে দিয়েছে। এটিকে ভাল করে গড়ে তুলে, জগৎকে এক নতুন ঐশ্বর্য্য দান করতে হবে। এখানে যখন কাজ আরম্ভ করা হয়েছে, তখন আমাদের দেশের সমৃদ্ধি ইউরোপকে দান করবার পক্ষে, উৎসবার এখানেই মুক্ত করা সহজ কাজ হবে। এক শতাব্দী পূর্ব্বে মনীষী রামমোহন রায় ইউরোপকে উদ্দেশ করে বলেছিলেন যে আজ ভারত দীনবেশে ভিখারীর মতন তোমাদের দ্বারে ভিক্ষাপাত্র পেতেছে বটে, কিন্তু অদূর ভবিষ্যতে তার অবস্থার এতদূর পরিবর্ত্তন ঘটবে যে' সে জগতকে নতুন বাণী শোনাবে। ইউরোপ তখন সশ্রদ্ধ বিস্ময়ে তার পানে মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকবে। আজ সেই দিনের সূচনা হয়েছে এই বিশ্ব-ভারতীর মধ্য দিয়ে। এখন বিশ্বভারতীর আদর্শকে কাজে পরিণত করতে পারলেই ভারতের নিজস্বরূপ দিনের আলোর মত প্রকাশ হয়ে পড়বে।

ইউরোপ বিশ্বভারতীকে যে বেশ শ্রদ্ধার চোখে দেখছে তা বোঝা যায় মহামতি এনড্রুজ পরলোক গত সিঙ্গারবন প্রভৃতি সুধীজনের সমাদরে। প্রফেসর সিলভা লেভির মত লোক বলেন যে তিনি এখানে প্রকৃত আনন্দ পান। আজকালও শান্তি নিকেতনে বাণীর বহু পুত্র পাশ্চাত্য জগত হতে এখানে এসে, বাঙালীর মধ্যে বাঙালীর সাজে সজ্জিত হয়ে বিদ্যাদান ও বিদ্যালাভ করছেন। পৃথিবীর সকল সভ্য দেশেই মাসিক পত্রে এ সম্বন্ধে যথেষ্ট আলোচনা হচ্ছে। দেশের সকলের দৃষ্টি এখন বিশ্বভারতীর উন্নতির জন্য নিয়োজিত করা উচিত।

লেখিকা

[শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার গুপ্ত]

বার বার তিনবারের বারও যখন আই-এ পরীক্ষায় ফেল্ হইলাম দাদা মন্তব্য প্রকাশ করিলেন যে বিনা-পাঠে এপর্য্যন্ত কেহই পাশ হইতে পারে নাই, পিতা বলিলেন আড্ডা নামক স্থান পরিত্যাগ ব্যতীত পাশ হওয়ার আশা সুদূরপরাহত—কিন্তু একজন সে সময়ে আমার তিরস্কৃত অনুতপ্ত মৌন মুখ দেখিয়া কিঞ্চিৎ সহানুভূতি প্রকাশ করিলেন। তিনি আমার স্নেহময়ী বৌদিদি! সময়ে অসময়ে কারণে অকারণে তিনি আমার এ বেদনা তপ্ত অভিমানী জীবনের উপর যে সহানুভূতির ধারা বর্ষণ করিতেন তাহার জন্য আমি চিরকাল সেই ছোট্ট—দেবীটির প্রতি কৃতজ্ঞ ছিলাম, এই বিপদে—যখন সকলেই আমার এ ব্যর্থতাকে স্বেচ্ছাকৃত বলিয়া ভর্ৎসনা করিলেন স্নেহময়ী বৌদিদি আমার তখন সকলের যুক্তিকে নির্ভীকতার সহিত খণ্ডন করিয়া বলিলেন—আচ্ছা ফেল্ কি আর লোকে হয় না? বেচারীর 'অদেষ্ট' মন্দ বলেই—না এতবার হচ্ছে! যাক্ এবারে ভাল করে পড়ুক তো।—কি ঠাকুরপো, পড়বে তো আবার ভাল করে?

কথাটা বলিয়াই বৌদিদি আমার মুখের দিকে তাকাইলেন, তাঁহার সমস্ত কথাগুলাই বেশ ভাল লাগিয়াছিল কিন্তু শেষের এই কয়েকটা কথা যেন কাঁটার মত আমার বুকে ফুটিল। হায় হায়, আবার সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের কাঠগড়ায় মাথা ঢুকাইতে হইবে? আবার সেই অর্ব্বাচীন—না, না, জীবন থাকিতে আর তাহা পারিব না। পথে বসিয়া যদি ভিক্ষা করিতে হয় ত—ও স্বীকার, কিন্তু ঐ ক্লাসে বসিয়া অধ্যাপকের মুখের আধার সেই নীরস সিলেবিয়স্ হিজিবিজি টায়রস্—না, না, তাহা আর সহ্য করিতে পারিব না তাই আজ বৌদিদির মুখের উপরও সহসা আমার কথা আসিল, আম্‌তা আম্‌তা করিয়া বলিলাম—তা না হয় হোল বৌদি, কিন্তু যদ্দে কুতে যদি ন—

আনালার উপর আলীখানি রাখিয়া দাদা দাড়ী কামাইবার উদ্যোগ করিতেছিলেন, আমার এ অকাট্য যুক্তি তাঁহার সহ্য হইল না, ধমক দিয়া বলিয়া উঠিলেন—যদ্দে কুতে কি? কোনকালে যদ্দ তুমি করেছিলে টুপিড়? কেবল ত আড্ডা দিয়েই বছর দুটো কাটিয়ে দিয়েছ! আবার যদ্দে কুতে!

বৌদিদি হাসিয়া বলিলেন—আহা যাক্ বেচারী যদি না'ই পারে!

কোন একটা আফিসে টাকিসে—

শুনিয়াছিলাম বৌদিদি না-কি বিবাহের পূর্ব্বে কবিতা লিখিতেন। এমন কাব্য-রস-লেশশূন্য কথা শুনিয়া তাহা আর বিশ্বাস হইতে চাহিল না। কোথায় ঘরে বসিয়া কিছুদিন আমার নিভৃত-সাধনা সাহিত্য—চর্চ্চাটা করিব, না—আফিসের কেরাণী করিবার ইচ্ছা আসিল! হা রে! সাধে কি শাস্ত্রে নারীদিগকে—ধাক্ সে কথা! শেষে অনেক কষ্টে—ভবিষ্যতে কিংকর্ত্তব্য চিন্তা করিবার জন্য মাস দুই তিন সময় পাইলাম। অন্তর হইতে কে যেন তাহার সফলতাপূর্ণ কিন্তু আলোকদীপ্ত চক্ষু লইয়া আশ্বাস প্রদান করিল—ভয় নাই, চেষ্টা করিলে এই তিনমাসেই তুমি দেশের একজন প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক হইতে পারিবে।—সেইদিন সন্ধ্যাকালেই কয়েকখানি ইংরাজী মাসিকপত্র ও খান দুই লিখিবার প্যাড্ কিনিয়া আনিলাম,—বুকে তাল ঠুকিয়া বলিলাম—শুভস্য শীঘ্রম্!

দূর হইতে জিনিষটিকে বেশ সুদৃশ্য এবং পরিষ্কার দেখায় কিন্তু নিকটে গেলেই তাহার সৌন্দর্য্য চলিয়া যায়—এ সাহিত্য জিনিষটাও দেখিলাম ঠিক তাই। দূর হইতে মনে হইত—কি গল্প কি প্রবন্ধ কি কবিতা যে কোন জিনিষ ইচ্ছা করিলেই লিখিতে পারিব। কিন্তু ওঃ হরি। জলখাবারের পয়সা বাঁচাইয়া বায়োস্কোপের পয়সা লুকাইয়া এই দীর্ঘ তিনমাস ডাক খরচ করিয়া লেখা পাঠাইবার পর দেখিলাম সকলই ব্যর্থ! যত পাঠাইয়াছি সবগুলিই ফিরিয়া আসিয়াছে। পাছে বৌদিদির চক্ষে আমার এ হীনতা ধরা পড়ে পত্রগুলির সমস্ত টিকানাই দিয়াছিলাম আমার এক বন্ধুর আবাসে।

সত্য কথা বলিতে কি এই সম্পাদক—জাতভগার উপর আমার যে ভক্তি ও শ্রদ্ধা ছিল কর্পূরের মতই তাহা যেন দিন দিন নিঃশেষ হইতে লাগিল। শেষে একদিন সত্য সত্যই হতাশ হইয়া পড়িলাম; কিন্তু বন্ধুবর ছাড়িলেন না, পিঠ চাপড়াইয়া সান্ত্বনা দিলেন—Rome was not built in a day.

সেদিন সন্ধ্যার সময় পড়ার টেবিলে বসিয়া স্ত্রী-স্বাধীনতা বিষয়ে একটী প্রবন্ধ লিখিতেছিলাম, স্ত্রী দিগকে স্বাধীন করা উচিত কি—না ঠোঁটে কলম লাগাইয়া তাহাই ভাবিতে ছিলাম, হঠাৎ হাসি-হাসিমুখে ধীরেন আসিয়া হাজির। হাতে একখানি কাগজ, বোধ হয় সাপ্তাহিক। ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করিলাম, একটু গম্ভীর হইয়া বলিল—শোন লেখা টেখা মজুত আছে—দিতে পারিস?

এ বলে কি? মাথাটা যেন আমার কেমন ঘুরিয়া উঠিল। চেয়ারটা কাছে টানিয়া উৎসাহভরে বলিলাম—কেন বল্ তো কি হয়েছে?

ধীরে ধীরে কাগজখানি আমার চক্ষের সম্মুখে ধরিয়া সে একটা হাল দেওয়া আয়না দেখাইল, বলিলাম—সত্যি?

উৎসাহভরে ধীরেন বলিল—সত্যি না, কি মিথ্যে রে? শুধু প্রবীন নিয়েই তো সকলে টানাটানি করে না, নবীনের ভক্তও ঢের আছে রে! জানিস্ তো—The old goes and the young comes.

নবীন লেখকদিগকে উৎসাহ দেওয়ার ফলে হউক বা অন্য যে কারণেই হউক এই নবীন সাপ্তাহিক 'বিশ্বভূমির' উপরে আমার ভক্তি ও শ্রদ্ধা যথেষ্ট বর্দ্ধিল। তৎক্ষণাৎ দেরাজটা খুলিয়া অর্ব্বাচীন সম্পাদকগণ প্রেরিত গল্পের মধ্যে একটী ছোট গল্প ধীরেনের হাতে দিলাম, এবং সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বভূমির—ঠিকানাটী পকেট বুকে তুলিয়া লইলাম।

একটি মাস কাটিয়া গিয়াছে। সাহিত্যিক বলিয়া আমার যশ নামটী হাটে বাজারে না হিসক বন্ধুগণের মুখে মুখে প্রায়ই ফিরিত, এবং উৎসাহও ঢের আসিত।

ধীরেনদের বাড়ীতে বসিয়া ধীরেনের ছোট বোন মোতাকে আমার সম্মুখে দাঁড় করাইয়া নব-রচিত একটা কবিতা পাঠ করিতেছিলাম হঠাৎ ধীরেন আসিয়া বলিল—এই যে হতভাগা—পড়ে দেখ।

উৎসুকভরে পোষ্টকার্ডখানি পড়িলাম, বিশ্বভূমির, সম্পাদক মহাশয় 'সবিনয় নিবেদন' করিয়াছেন যে নবানুরাগের খ্যাতনামা লেখিকা রেণুকা দেবী আমার স্ত্রী-স্বাধীনতার একটী প্রতিবাদ লিখিয়া পাঠাইয়াছেন। আমার অনুমতি পাইলে তিনি কোন প্রতিবাদ না করিয়াই ছাপাইতে পারেন কিন্তু প্রতিবাদ করা উচিত কি-না তাহা দেখিতে আমার যাওয়া না-কি বিশেষ প্রয়োজন, কি করি—সম্পাদকের আমন্ত্রণ, এ ভীষণ জাতটীকে চটাইয়া লাভ ত কিছু নাই-ই বরং লোকসানের সম্ভাবনা ঢের বেশী! তাই দুইটা না বাজিতেই কর্ণওয়ালিশের পথ ধরিলাম।

রৌদ্রতপ্ত মুখে ক্লান্ত প্রান্ত হইয়া যখন বিশ্বভূমির অফিসে ঢুকিলাম—ঘরটী খালি। টেবিলের উপর একরাশ কাগজ। তাহার মধ্যে ছেঁড়া প্রুফের কাগজই বেশী, বাকী সব সংবাদপত্র ও কাপি। চাকর আসিয়া জানাইল যে একটু বসিতে হইবে, সম্পাদক—বাবু নীচে চা পাখানা ঘরে গিয়াছেন, এখনি আসিবেন।

টেবিলের উপর হইতে একখানি পুরাতন কাটিংএর ভিজাইন লইয়া নিবিষ্টমনে দেখিতেছি হঠাৎ কে বলিয়া উঠিল—এ কি রে বিমল যে! তারপর, এখানে কোথা?... আশ্চর্য্য আমিও বড় কম হই নাই। ইস্কুলের সহপাঠী বাল্যের সঙ্গী অতুলকে এমন সহসা দেখিব, স্বপ্নেও ভাবি নাই। হাতে কতকগুলি প্রুফ লইয়া সেগুলিকে বাতাসে নাড়িতে নাড়িতে অতুল বলিল—এখানে কোথা রে? কালেক্তার, বুঝি? আচ্ছা দাঁড়া দেখি,—চন্দুয়া?

কালেক্তারের জন্য দূরে কাশবাজার হইতে বৌবাজার পর্য্যন্ত ছুটিয়া কালেক্তার আনিবার উৎকট সখ যে আমার নাই তাহা বুঝাইয়া দিয়া পকেট হইতে ধীরে ধীরে চিঠিখানা বাহির করিয়া দিলাম। বিহ্বা কামড়াইলে লোকে যেমন সহসা লাফাইয়া উঠে পত্র দেখিয়া ঠিক তেমনি লাফাইয়া উঠিয়া আনন্দোৎফুল্লকণ্ঠে অতুল বলিল—কি রে—তুই আমাদের বিমল যাদুলী? আরে বোস, বোস, এ যে স্বপ্নেও ভাবি-নি।...হোটেলের ঠিকানা বুঝি এটা?

লুপ্ত বন্ধুত্বকে পুনর্লাভ করিয়া অনেকক্ষণ গল্প করিলাম, অতুল শেষে ড্রয়ার হইতে একখানি খাতা বাহির করিয়া

ঈষৎ উত্তিজিতকণ্ঠে বলিল—এই দেখ, ভাই, তোর সে প্রবন্ধটার প্রতিবাদ এসেছে,—সম্পাদক এখানে নেই কি-না তাই তোকে ডেকে পাঠিয়েছিলুম।

প্রতিবাদটীর নিম্নে নাম স্বাক্ষরিত ছিল। কে এই লেখিকাশ্রেষ্ঠা রেণুকাদেবী না জানিলেও কল্পনা চক্ষে যাহাকে দেখিলাম—বয়স তাহার প্রায় সতেরো কি আঠারো, রং বেশ ফরসা, গঠন শ্রী চমৎকার না হইলেও মন্দ নয়; পৃষ্ঠে ঘন কেশরাশি, চক্ষে সরস দৃষ্টি! মনটী আমার নিমেষেই তাহার চিন্তায় ভরিয়া উঠিল।

আরও কয়েক দিন কাটিল। এতদিন ভয়ে ভয়ে থাকিতাম কিন্তু আর পারিলাম না! একদিন সহসা অতুলকে বলিয়া ফেলিলাম এই, এ রেণুকা দেবীটী কে রে?

মৃদু হাসিয়া অতুল বলিল—কেন লোভ হয়েছে না-কি! সাবধান! লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু—

একটা ঠেলা দিয়া বিরক্তভাবে বলিলাম—আরে যা যা। ভারী সাধু হয়েছিস্। এ পাপ কি—পাপ রে? এ যে—

মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া মৃদু হাস্যের সহিত অতুল কহিল এ পাপ 'পুণ্যি'! নয় রে? তা থাক্ ও কে জান্‌বি? একটী সম্ভ্রান্ত মহিলা—গোঁপ-দাড়ী বিবর্জ্জিতা সাহিত্যিক। বলিলাম—বয়স কত, জানিস্?

তা প্রায় ষোল, সতেরো হবে।

ঠিকানা কি রে?

এইবার অতুল হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল—বলিল কেন যাবি না-কি? আলাপ করিস ত বল, করিয়ে দি! অনেক শলা পরামর্শের পর স্থির হইল যে অতুল আমার হইয়া এই ক্ষুদ্র মানসীটীকে একখানি পরিচয়-লিপি পাঠাইবে তাহার পর দুইজনে গিয়া একদিন তাঁহার শ্রী মুখখানি দেখিয়া আসিলেই চলিবে।

দিন দুই বাদে ধীরেনের ঠিকানায় একখানি খাম আসিয়া হাজির। কোন সম্পাদক-প্রেরিত অযাচিত গল্প ভাবিয়া অত্যন্ত বিরক্তচিত্তে তাহার মুখটী খুলিয়া ফেলিতেই সে এক আশাতীত—কল্পনাতীত! একটী রঙীন্ কাগজে মেয়েলী অক্ষরে আঁকা বাঁকা ভাবে লেখা—

সবিনয় নিবেদন,

আপনি আমার সহিত পরিচিত হইতে ইচ্ছুক হইয়াছেন জানিয়া আমি যে কত বড় আহ্লাদিত হইয়াছি, কি বলিব, অতুলবাবু আমার বিশেষ বন্ধু তাঁহার সহিত একদিন এ দরিদ্রের শ্রীহীন কুটীরে পদার্পণ করিলে নিজকে অত্যন্ত সৌভাগ্যবতী জ্ঞান করিব, নমস্কার লইবেন, আসিতে ভুলিবেন না। ইতি বিনীতা—

শ্রীরেণুকা দেবী।

দরিদ্র? শ্রীহীন—কুটীর! হায় আমার কল্পনাময়ী মানসী জান না তুমি আমার কাছে তোমার মূল্য কত! তোমার ঐ শ্রীহীন কুটীরই শত সহস্র 'শ্রী'তে পূর্ণ!

ধীরেন ত পত্র পড়িয়া হাসিয়াই খুন। বলিল—সাবধান বন্ধু, এ রকম মৎলব করে কোনদিন যেন পদার্পণ কোরতে যেও না, আর নিতান্তই যদি যাও তো আগে হাসপাতালে কোন সিট্ খালি আছে কি না জেনে যেও—বুঝ্‌লে?

বিরক্তভাবে বলিলাম—সকলেই ত তোমার মত নয়, যে ভদ্রলোক দেখা কোরতে এলে...

হায় ধীরেন, সে সময়ে সত্যই যদি তোমার কথা শুনিতাম!

অতুলের সহিত কথাবার্ত্তা হইল। সে বলিল যে পরশু সকালে সে একবার লেখিকা মহোদয়ার নিকট যাইবে এবং তাঁহাকে জানাইয়া আসিবে যে সেইদিন বৈকালেই আমরা সাক্ষাত করিতে যাইব।

যাবের দিন প্রায় একরূপ চিন্তা ও কল্পনারাজ্যেই কাটিয়া গেল। পরদিন সকালে ভাল করিয়া মুখ হাত পা ধুইয়া চা খাইতে বসিলাম। চা টা গরম গরম বোধ হয় জুটিত না কিন্তু আমার সঙ্গে দাদা ও তাঁহার সহধর্ম্মিনীও সেই কার্য্যটা সমাধান করিতেছিলেন বলিয়া চিন্তজাল হইতে পরিত্রাণ পাইলাম। চা পান করিতে করিতে কত কল্পনাই আসিতেছিল, এতক্ষণ হয় তো অতুল লেখিকার সহিত সামনা-সামনি উপবিষ্ট আর তাহাদের বক্তব্যবিষয়—আমারই কথা! কল্পনাবলে দেখিলাম আমার নাম শুনিয়া—ঐ—ঐ—আমার মানসী দেবীর মুখমণ্ডল নিমিষেই আনন্দরঞ্জিত হইয়া উঠিল, ঐ আমার অতুল—

সহসা ঘুস্ ঘুস্ করিয়া একটা শব্দ আসিয়া আমার

কল্পনা আমাকে নিশ্চয়ভাবে স্থির করিয়া দিল। এ কি! অতুল কোথা হইতে আসিল? এখানে কেন?...

অতুল আমাকে দেখিয়া সহর্ষে বলিয়া উঠিল—এ কি তুই যে এখানে বিমল? বাঃ বেশ সাহিত্যিক ত তুই? কোথায় introduce করিয়ে দেবার কথা—না আপনিই ছুটেছিস্.....।

পরে বৌদিদির দিকে তাকাইয়া বলিল—এই ইনি হচ্ছেন শ্রীবিমল গাঙ্গুলি যাঁর লেখা আপনি—মনে হইতেছিল একটা প্রচণ্ড ঘুষিতে দি-ই ঐ হতভাগোর মুণ্ড উড়াইয়া। তাহাতে হত্যাপরাধে লিপ্ত হইতে হয়, তাহাও স্বীকার।

লজ্জায় ক্ষোভে এবং একটা অপরিসীম দুঃখে কাল ছুটিয়া আমার পুড়িয়া যাইতেছিল, বৌদিদি বলিতেছিলেন ও মা! তুমিই যে আমাদের বিমল গাঙ্গুলি, তা-কি আমি জানি!

হায় বৌদিদি! কি বলিব তোমাকে? তোমার ভাল নাম জানা থাকিলে আজ কোন না—যাক্ সে কথা।

নির্ব্বোধ অতুল তখন দাদাকে লইয়া অন্য একটী চেয়ারে বসিয়া চেঁচামেচি করিয়া প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিতেছিল—যে সাহিত্যিক সাহিত্যিককে যত চিনিতে পারে কবি কবিকে যত শীঘ্র চিনিয়া লইতে পারে আর কেহই তত পারে না।

লালবাজারে arms actএ একটা পিস্তলের লাইসেন্সের জন্য দরখাস্ত করিয়াছি। তবে পাইব ঠিক নাই, তবে ইহা ঠিক যে সেদিন অতুলের একমাত্র পুত্রকে পিতৃহীন হইতে হইবে।

উপেক্ষা।

শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী

(১)

অশ্রু-নয়নে পুনঃ হায়! ফুটে উঠে
কেন আলো, কেন আলো;
নিভে যা, নিভে যা ওরে, না থাকিস্ মোটে,
তাই ভাল, তাই ভাল।

(২)

বধির-শ্রবণে পুনঃ সুর বেজে উঠে
কেন শুধু, কেন শুধু;
চলে যা, চলে যা ওরে, না থাকিস্ মোটে,
তাই মধু, তাই মধু।

(৩)

বুকের অধর পুনঃ গান হায়! উঠে
কেন গাহি, কেন গাহি;
থেমে যা, থেমে যা ওরে, না থাকিস্ মোটে,
তাই চাহি, তাই চাহি।

(৪)

নীরস মরুর বুকে সুধা ধারা বিধি
কেন ঢালো, কেন ঢালো,
অশ্রু, বধির, মুক, সুর নিরবধি,
তাই ভাল, তাই ভাল।

ইণ্ডিয়ান সোপ কোম্পানীর
মেসিনে প্রস্তুত
চন্দন, রয়েলবকুল, মাল্ক ও ভেলভেট সাবান
ব্যবহার করুণ। টেলিফোন, ২৪৯৬

সংগ্রহ

[শ্রীমানবেন্দ্রনাথ বসু।]

আশ্চর্য্য হ্রদ :—সম্প্রতি আয়র্লণ্ডে একটী আশ্চর্য্য হ্রদ দেখতে পাওয়া গেছে। হ্রদটীর বিশেষত্ব এই যে তাতে কোন জিনিস পড়ে গেলে সেটা ক্রমে পাথর হয়ে যায়। ইংলণ্ডের এক বিখ্যাত ছুরি-কাঁচি বিক্রেতা ঐ বিষয়টীর সত্যাসত্য নির্ণয় করার জন্য আয়র্লণ্ডে একজন লোক পাঠালেন। লোকটী প্রথমে কয়েক খণ্ড কাঠ নিয়ে ছোট 'বয়া'র সঙ্গে সংযোজিত করে জলে ডুবিয়ে রেখে দেয়। প্রায় পনেরদিন পরে লোকটী পুনরায় আয়র্লণ্ডে ফিরে কাঠগুলিকে তুলে দেখলে যে সেগুলি পাথরের মত হয়ে গেছে। অনেক পরীক্ষার পর দেখা গেল উক্ত পাথরের খণ্ডগুলি পাথর বলে ব্যবহৃত না হলেও ছুরি-কাঁচি শানাবার উপাদানরূপে অনায়াসে ব্যবহৃত হতে পারে। তাঁরা হ্রদটী নিজেদের কাজে লাগাবার চেষ্টা করছেন।

অদ্ভুত মেয়ে :—বালিনে সম্প্রতি একটী অদ্ভুত মেয়ের সন্ধান পাওয়া গেছে। মেয়েটীর বয়স বেশী নয় মাত্র সতেরো বছর এই বয়সেই তার মুখমণ্ডল দাড়ীতে ভরে গিয়েছে। মেয়েটীকে একটি পাদরীর বাড়ীতে রেখে দেওয়া হয়েছে। আমাদের দেশেও অনেক মেয়েকে দেখা যায় যাদের গোঁফের চিহ্ন দেখা দিয়েছে। ব্যাপারটা প্রকৃত হলে আশ্চর্য্য বলতে হবে সন্দেহ নাই আশা করা যায় শিক্ষাবৃদ্ধির সঙ্গে আকার অবয়বেও মেয়েরা শীঘ্রই পুরুষের সমকক্ষ হয়ে দাঁড়াবে। তবে পুরুষের মত বীর না হলেই মঙ্গল।

সিগারেটে ক্ষতি :—সুইডেনে সিগারেটের আগুন যতটা ক্ষতি করেছে অন্য কোন দেশে বোধ হয় ততটা করেনি। গত ১৭৯০ খৃষ্টাব্দে একটি যুবক ধূমপানের পর সিগারেটটী কোন কাঠের আরতের উপর নিক্ষেপ করেছিলেন। ফলে প্রায় ৬০,০০,০০০ লক্ষ টাকার ক্ষতি হয়েছিল। অধিকাংশ অগ্নিকাণ্ডই সিগারেটের আগুনে সাধিত হয়েছে। সুইডেনে অগ্নি-নিবারক সমিতির সভ্যেরা ধূমপান রহিত করবার চেষ্টা করছেন।

অদ্ভুত প্রতিযোগিতা :—প্রতিযোগিতা অনেক রকমই হয় বটে বৈচিত্র্য তাতে বেশী দেখা যায় না। লণ্ডনে সম্প্রতি একটি বেশ বৈচিত্র্যপূর্ণ প্রতিযোগিতা খেলা হয়েছিল। প্রতিযোগিতার বিষয় যে যত বেশীক্ষণ না ঘুমিয়ে থাকতে পারবে তারই জয়। প্রতিযোগিতায় নামবার লোকের অভাব হোল না। সকলেই নাম দিলেন কিন্তু দুজন ছাড়া অবশেষে সকলকেই পালাতে হলো, প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান অধিকার করলেন দুটী যুবক। যিনি প্রথম হয়েছিলেন তিনি মাত্র সাতানব্বই ঘণ্টা পঞ্চাশ মিনিট জেগেছিলেন। প্রতিযোগিতাটা বাংলা দেশে নববিবাহিতদের মধ্যে খেলা হলে কি হত বলা যায় না।

আকাশে ঘর :—আমেরিকার সম্প্রতি একটি বাইপ্লেন তৈরারী করা হয়েছে। 'বাইপ্লেনটী আকারে তেমন বড় নয়, তাতে তিনটী ঘর আছে, তার মধ্যে একটি স্নানাগারও আছে। স্নানাগারটীর মধ্যে গরম ও ঠাণ্ডা জল সর্ব্বদাই মজুত থাকে তা ছাড়া টব আয়না চিরুনী প্রভৃতিরও অভাব নেই। 'বাইপ্লেনটী যখন পূর্ণবেগে উড়তে থাকে তখন স্নানের কোনও ব্যাঘাত জন্মে না। আশা করা যায় ভবিষ্যতে আরও উন্নতি হবে।

গাছের বিদ্যে :—গ্রাসেস্টারশায়ারে ভাল নিতে সেদিন একটি অদ্ভুত এল্ম গাছের পরিচয় পাওয়া গেছে। উক্ত গাছটী জ্যোতিষ বিদ্যায় খুব পরিপক্ক। তবে অন্য কোন বিষয়ে নয়—কেবলমাত্র প্রাকৃতিক আবহাওয়া বিষয়ে। গ্রীষ্ম পড়বার পূর্ব্বে গাছের পাতাগুলি লাল হয়ে যায়। আবার পাতাগুলি যখন পূর্ব্বের মত হয়ে যায় তখন বুঝতে হবে, বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা অত্যন্ত অধিক।

বিদ্রোহী

(চিত্র)

[শ্রীঅজয়কুমার সেন]

ভীল সর্দ্দার ভৈরুকে যখন কোন প্রকারেই আয়ত্তে আনা গেল না তখন মহারাজা রাজ্যের মধ্যে ঘোষণা করিয়া দিলেন ; কেহ যদি সেই বিদ্রোহী সর্দ্দারকে বন্দী অবস্থায় ধরিয়া আনিয়া দিতে পারে, তবে সে অযাচিত পুরস্কার পাইবে।

এই আদেশ নগরে প্রচারিত হইয়া যাত্র নগরের মধ্যে বিপুল চাঞ্চল্যের চিহ্ন দেখা দিল। পরিশেষে কিন্তু কেহই আর পুরস্কারের লোভে ঐ কার্য্যে অগ্রসর হইল না।

কিছুদিন এমনি করিয়াই কাটিয়া গেল। ভীলসর্দ্দারকে বন্দী করিবার এত আয়োজন কিছুকালের মধ্যেই নীরব হইয়া গেল।

একদিন হঠাৎ সীমান্ত প্রদেশ হইতে সংবাদ আসিল, সর্দ্দারের লোক দলে দলে গ্রামের ভিতর প্রবেশ করিয়া নৃশংস ভাবে গ্রামবাসীদিগকে হত্যা করিয়া, যাহা পাইতেছে তাহা লইয়া চলিয়া যাইতেছে। এই সংবাদ শুনিয়া, মহারাজা প্রধান সেনাপতিকে আহ্বান করিয়া আদেশ দিলেন—যে কোন প্রকারেই হৌক না কেন বিদ্রোহী সর্দ্দারকে ধরিয়া আনা চাই ! এত অত্যাচার—অসহ্য।

মহারাজের কঠোর আদেশ শুনিবামাত্র, প্রধান সেনাপতি দক্ষিণ হস্তস্থিত অর্দ্ধমুক্ত অসিকে নিষ্কাসিত করিয়া বজ্র গম্ভীর কণ্ঠে কহিল, "মহারাজের আদেশ অবশ্য প্রতিপাল্য,

পুনরায় উত্তেজিত হইয়া মহারাজা বলিলেন, "কল্য প্রভাতেই সর্দ্দারের বিরুদ্ধে অভিযান করা চাই—নচেৎ বিলম্বে সবই ব্যর্থ হইবে।"

"যো হুকুম।" বলিয়া প্রধান সেনাপতি নীরব হইলে সেইস্থানের অন্যান্য সেনানীদিগের কোষবদ্ধ অসি নিমেষের মধ্যে ঝন্ ঝন্ করিয়া ঝঙ্কার দিয়া উঠিল। সেনানীদিগের বীরত্ব-ব্যঞ্জক মুখের দিকে চাহিয়া সেনাপতি গম্ভীর কণ্ঠে আদেশ দিলেন,

"অদ্য রাত্রের মধ্যেই প্রস্তুত হওয়া চাই।"

মস্তক অবনত করিয়া সেনাপতির আদেশ তাহারা গ্রহণ করিলেন। মহারাজা আসন ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

(২)

ভীল সর্দ্দারের বাহিনীকে প্রতিরোধ করা যখন একান্তই দুর্দ্ধার হইয়া উঠিল, তখন প্রধান সেনাপতি নিজের শিবিরে আহূত সেনানায়কদিগকে নিভৃতে আহ্বান করিয়া, কি কৌশলে বিদ্রোহী সর্দ্দারকে বন্দী করা যায় সেই পরামর্শে রত হইল।

পরামর্শে এই স্থির হইল যে গভীর নিশীথে যখন সর্দ্দারের দল নিদ্রিত রহিবে, সেই সময়ে কৌশল করিয়া তাহাকে বন্দী করিতে হইবে ; নচেৎ অন্য কোন উপায়ে তাহাকে বন্দী করা একান্ত অসম্ভব। একদল নির্ভীক সেনা সেই অতি দুঃসাহসিক কার্য্য করিবার জন্য প্রস্তুত হইল। গভীর রজনীর সূচীভেদ্য অন্ধকারের মধ্য দিয়া তাহারা অস্ত্রে-শস্ত্রে সজ্জিত হইয়া, সেই ভীষণ স্থানের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিল।

কত ছোট বড় উপলখণ্ড ক্ষুব্ধ ক্ষুব্ধ বেগবতী পার্ব্বত্য নদী ও লতাগুল্ম অতিক্রম করিয়া তাহারা নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইয়া দেখিল,—জনমানবের চিহ্ন কিছু মাত্র নাই ; অল্পকাল পূর্ব্বে যে সর্দ্দারের দল পলায়ন করিয়াছে, তাহার চিহ্ন চারিদিকে পরিস্ফুট রহিয়াছে। সেইসকল চিহ্ন অনুসরণ করিয়া, হিংস্র জন্তু পরিবেষ্টিত ভীষণ অরণ্যের মধ্য দিয়া তাহারা পুনরায় চলিতে লাগিল।

(৩)

সর্দ্দারের মন আজ বড়ই উন্মনা। বিশাল ললাট চিন্তার ঘন রেখায় রেখাঙ্কিত। ঘনকৃষ্ণ কুঞ্চিত কেশরাশি রুক্ষ ও ধূলিসমাচ্ছন্ন। সর্দ্দার নিম্নে এবং তাহার দলবল সকলে বিশাল পর্ব্বত রাজির এক প্রান্ত হইতে অপর

প্রান্ত পর্য্যন্ত বহন করিয়া বেড়াইয়াছে; কিন্তু তাহার একমাত্র কন্যাকে খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না।

এত অনুসন্ধান করিয়াও যখন তাহার কোন সন্ধান পাওয়া গেল না; তখন সর্দ্দার তাহার দলকে নিকটে ডাকিয়া কহিল, "দেখ, আমার হৃদয়ের কলিকাকে কে যেন অপহরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে।" এই বলিয়া বিদ্রোহী সর্দ্দারের দুই চক্ষু দিয়া জলের ধারা গড়াইয়া পড়িতে লাগিল! সর্দ্দারকে এইরূপ অবস্থায় দেখিয়া তাহারা বিষন্ন অন্তরে আবার সর্দ্দার কন্যার খোঁজে বাহির হইল।

সন্ধ্যার আঁধার গাঢ় হইয়া আসিলে, বনবৈতালিকের সান্ধ্যবিরামের অন্যান্য কূজন নীরব হইলে, সর্দ্দার তাহার কোন এক প্রিয় অনুচরকে নিকটে ডাকিয়া কহিল, "দেখ, এতদিনের সব বন্ধন আমার একনিমেষে ছিঁড়িয়া গিয়াছে। কোন শয়তান্ আমার একমাত্র নয়নের মণি ছিনাইয়া লইয়াছে—আমি এখন সর্ব্বহারা নিঃস্ব।" তোমরা আমাকে চিরদিনের মত বিদায় দাও আমি এই বিজন পাহাড়ের বুকে ডুবিয়া যাই। এই বলিয়া সেই বিদ্রোহী সর্দ্দার ডুকরিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

পরদিন সকালে আর বিদ্রোহী সর্দ্দারকে খুঁজিয়া পাওয়া গেল না।

প্রেম অন্ধ নয়—অন্ধ তুমি।

—•—

বৈধ্যেই ক্ষমতার শেষ পরীক্ষা মেলে।

—•—

জীবনের শত্রু—ক্ষুদ্রতা, সঙ্কীর্ণতা আর স্বার্থপরতা।

—•—

যুবকদের কাছে প্রেম, ভালবাসা একটা বিলাসের দ্রব্যের মত কিন্তু যুদ্ধের পক্ষে ইহা প্রয়োজন।

—•—

প্রেম সব সময় খুসীই করতে চায় না—সময় সময় ইহা ব্যথাও দিতে চায়।

—•—

হেড়ে দেওয়া—আর তার পাওয়া এই হচ্ছে জীবনের দুঃখ।

—•—

অপর কারো জীবনের ভেতরকার ইতিহাস জানলে পরে তাকে আর আমরা হিংসা করতুম না।

—•—

প্রেমে যে যত বেশী মত্ত—অর্থচাপা তার তত মন্দ।

—•—

সকল রোমান্সেরই শেষে দেখা যায় খরচের খাতা ভারী।

—•—

যে নারী তোমায় ভালবাসে তুমি তাকে চুম্বো দিতে কার্পণ্য করলে সে অখুসীই হবে।

—•—

প্রেমিক প্রেমিকার অনর্গল কথা অর্থশূন্য হতে পারে কিন্তু তারা যে সময়টুকু চুপ করে থাকে সে সময় অনেক জানই তাদের অন্তরে ফুটে উঠে।

—•—

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

ভারতবর্ষ, ফাল্গুন—১৩০৮, এবারকার ভারতবর্ষের ছবিগুলির ছাপা ভাল। কিন্তু প্রথম ছবিখানি দেখে বড়ই দুঃখিত হতে হল। ছবিখানির নাম 'ঘরে-বাইরে' এবং চিত্রকরের নাম দেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরী। গোটাকয় পড়লে যে মস্তিষ্কের পথে পুলার্থিনীর বুকের কাপড় সরে যায় এবং রূপসী যুবতীর স্তন অনাবৃত হয়ে পড়ে সেটা সকলের জানা ছিল না। এরূপ ছবি ভারতবর্ষের মত সমাজ কাগজে দেখলে দুঃখিত হতে হয়। এ মাসের প্রথম প্রবন্ধ শ্রীকমলকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'ঈশ্বর কর্তৃত্বাদ' প্রবন্ধটি সুলিখিত এবং প্রবন্ধ প্রবন্ধ হবার যোগ্য কিন্তু লেখক ঈশ্বর থেকে দয়া দয়া সরুচ্ছ শ্রোত ঘুমন্ত বাঙ্গালী পাঠকের বৈর্যচ্যুতির উপায় করে দিয়েছেন। 'ঘরের বর্ণমালা' শ্রীযুক্ত প্রভাবতী দেবী সরস্বতীর ক্ষুদ্রগল্প প্রকাশ উপন্যাস। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ কবিসম্রাট শ্রীযুক্তের তর্কবাগীশ বাল্য বিবাহ ও যৌবন বিবাহ সম্বন্ধে যে ব্যবস্থা দিয়েছেন তা আর এজগতে চলে না। তর্কবাগীশ মহাশয় জানেন যে এখনো ভারতবর্ষটা পঞ্চম পঞ্চাশতেই আছে। ভারতবর্ষের প্রবীন সম্পাদক মহাশয়, এ সম্বন্ধে আর কোন প্রবন্ধ ছাপবেন না বলে সংবাদপত্রে পড়িয়ে দিয়েছেন। ভট্ট নবেন্দ্রচন্দ্রের 'বিদর্ভীয়' নামে শেষ হল। এই উপন্যাসের শেষে কবি শ্রীযুক্তরাজন মল্লিক দুই ছত্র কবিতা ছেড়েছেন, তাতে ভাষা এবং ভাবের বিস্তর অভাব। ছন্দ এবং বিবিধ প্রসঙ্গ সাধারণত আজীর এতে পাঠ্য বস্তুর বিশেষ অভাবই দেখতে পাওয়া যায়। এর মধ্যে শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায়ের 'মহাকবি কালিদাস কি বাঙ্গালী? উল্লেখ যোগ্য। শ্রীরাধাচরণ চক্রবর্তীর 'পাড়ার বৌ' নামক চিত্রটি বিশেষ বিহীন এবং উদ্দেশ্য বর্জিত। পত্নী সঙ্গীত সংক্রান্ত অনুবাদটি মন্দ নয়। শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র বসুর 'পর্জন্যের ভেদ' প্রবন্ধটি মন্দ নয়। শ্রীজ্ঞানদা রায়ের শেষ রবীন্দ্রনাথের অনুকরণ, ভাবের অভাব নাই ছন্দ কিন্তু ভাষার ও লালিত্যের চিহ্নও দেখতে পাওয়া যায় না। শ্রীযুক্তা সরোজবালা বসুর 'সংযোগ' গল্পটি অত্যন্ত অস্বাভাবিক। বাজার দুষ্প্রাপ্য স্বামী বন্ধু বান্ধবের মনের 'ঢাট' যোগাতে না পারায় স্ত্রীর প্রাণ কেরোসিন তৈল ফেলে পুড়িয়ে দিল আর স্ত্রীটি তার বিরহে পাগল হয়ে গেল। কাঠামোটি মেলো ড্রামাটিক কিন্তু গল্পটা অসম্ভব রকম অস্বাভাবিক। শ্রীবিমলাপ্রসাদ রায় 'আষাঢ়ের দিন-পঞ্জিকা আরম্ভ করেছেন—যদি সাহস প্রত্যয়টা কি আর্ষে বা পদ্মার্থে? ভাষা ভাষাটা যত সোজা করে লেখা যায় তাই ভাল। লেখা বেশ সরস এবং সহীত শাস্ত্রে সুপণ্ডিতের লেখা। চিত্রখানার নামক sketch টি শ্রীযুক্তের নাম নামক শিল্পীর অঙ্কিতপ্রসূত। শিল্পীর ভেতরে বোধ হয় একটা আষাঢ়ের চন্দ্র আছে" যার জন্য তাঁকে বিষাদচন্দ্রে আষাঢ়ের রূপ আঁকতে প্রবৃত্ত করে দিয়েছে। শিল্পীটি বিরহ সহরবাসের সাহিত্যগ্রন্থ পাঠ করলে ভাল ছবি আঁকতে পারবেন। অধ্যাপক শ্রীবিনয়কুমার সরকারের 'হিন্দুনলিজ' নামক প্রবন্ধের, প্রবন্ধটি মন্দ নয়। শ্রীউপেন্দ্র নাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'অমলা' ক্ষুদ্রগল্প প্রকাশ উপন্যাস এবং শ্রীযুক্তের যেরো 'আর্ট্রেলিয়া' ক্ষুদ্রগল্প প্রকাশ প্রবন্ধলিকা। পাতকাদ্য হয় নামে যিনি ভূমন্তীর নাম নামক এই চিত্রটি এঁকেছেন তাঁকে ধন্যবাদ বাংলা সাহিত্য জগতের এরূপের বলে সাহিত্যের গতি বলেই মনে হয়। এরূপ হাস সিক্ত ছবি ঈশ্বর ত্রৈলক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের ৺ প্রাপ্তির পরে আর পড়ি বি বাংলা সাহিত্যে এরূপ ছবির এখন বিস্তার অভাব। লেখকের 'সিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড' বাংলা সাহিত্যে ক্লাসিক হয়ে রয়েছে। ভারতবর্ষে যদি প্রতিমাসে এই জাতীয় একটা লেখা বের হত, তা হলে ভারতবর্ষ অমর হয়ে যেত, আশা করি গ্রন্থকার তাঁর অন্যান্য গ্রন্থের আকারে ছাপবেন। শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রের ভারতের বিদেশী বাণিজ্য এবং শ্রীবিভূতি ভূষণ রায়ের বিভূতিমূর্তি। এবারে কবিতা। প্রথমটা অনাবশ্যক মন্দ নয় দ্বিতীয়টা আপাত পড়া। শ্রীযুক্তরায় বসুর 'মধু' উপন্যাসটি ক্ষুদ্রগল্প প্রকাশ। শ্রীবিষ্ণুপদ 'হরিণ' নামক অতীব অসম্ভবনা লেখার লাইনের মত লম্বা হয়ে চলেছে। লেখক যে বিষয়ই লেখুন যেই বিষয়ের পরাতের মোহর তাঁর লেখায় কুইনাইন বিক্রয়ের মত প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সুস্পষ্ট হয়ে আছে। ভারতবর্ষের সংবাদপত্রের অংশ ক্রমশঃ বেড়ে চলেছে। ঐ পত্রাকুল

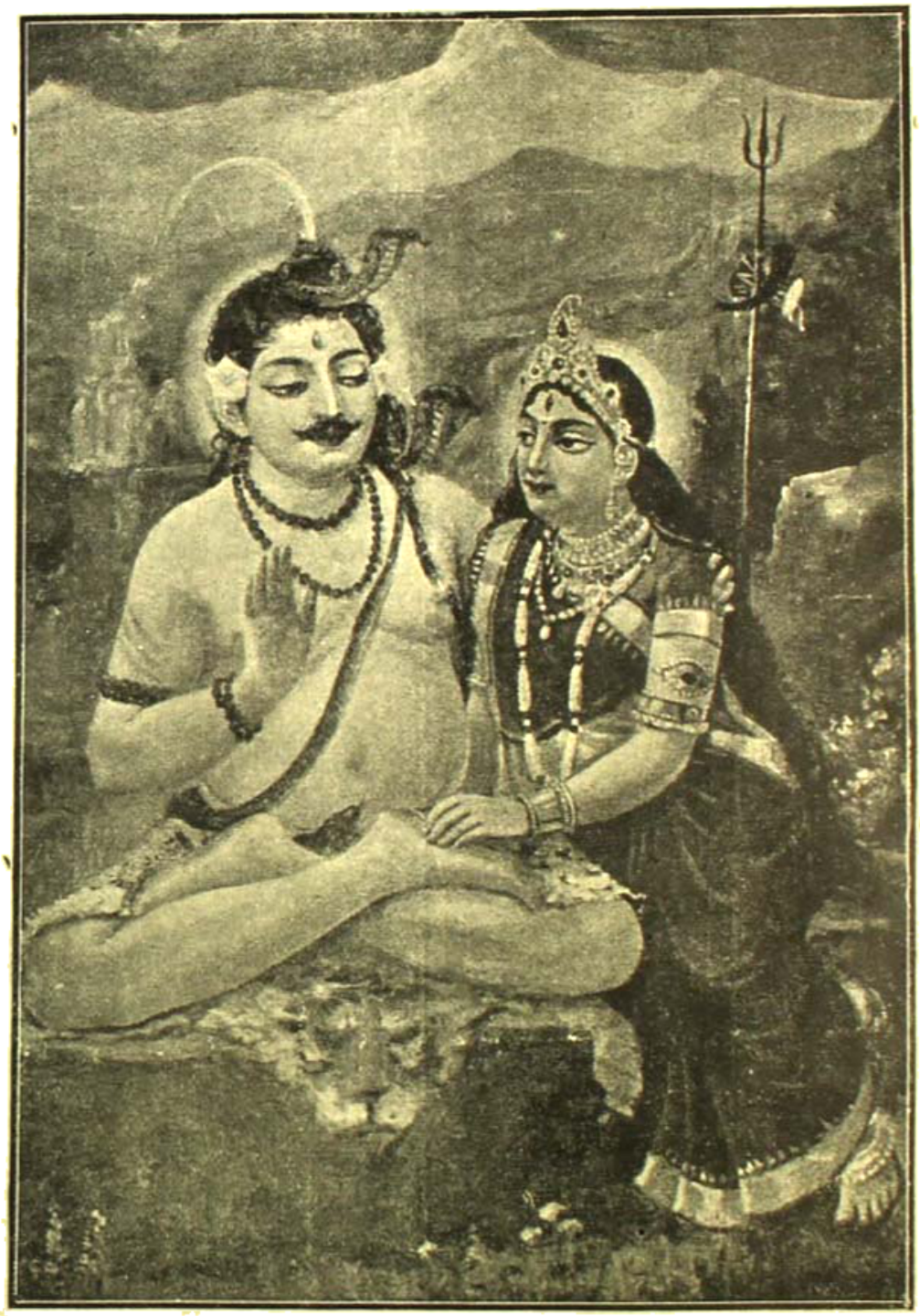

শিবরাত্রি

সংখ্যা-৩৫

আলোচনা

বর্ত্তমান—সকল দেশের সকল জাতিরই সমস্যাপূর্ণ। জগতের কোন দেশের স্বাধীন অধীন কোন জাতিই বর্ত্তমানকে সমস্যাহীন, নিষ্কণ্টকে ভোগ দখল করিতে পারিতেছে না। সমস্যা সকলেরই আছে তবে কাহারও কম কাহারও বেশী। এই কম বেশী লইয়াই এখন কথা। সম্পূর্ণ ভাবে পরবশ ও পর অধীন যাহারা তাহাদের সমস্যাও সেইরূপ সকল দিক দিয়াই বেশী হইবে—ইহা প্রমাণিত সত্য। সমস্যা মেটে তাহার সমাধান হইলে—সমাধানের উপায় যাহারা পরের হাতে সঁপিয়া রাখিয়া সমস্যা সমস্যা বলিয়া চীৎকার করিয়া মরে তাহাদের চীৎকার করিয়া মরাই সার হয়, কোন উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য লাভের জন্য যে ছাড়া মৃত্যু তাহা তাহাদের লাভ হয় না।

• • • •

ভারতীয়ের আজ সব দিক দিয়াই মহা সমস্যা। সকল সমস্যার উপরে সকল ভারতীয়ই তীব্র বেদনা ভোগ করিতেছে কি করিয়া যে বাঁচিবে, বাঁচিবার উপায় কি এই সমস্যা লইয়া। অন্ন ও বস্ত্র যাহা মানব সাধারণের নিত্য জীবন ধারণের পক্ষে অতি প্রয়োজনীয়, অপরিহার্য্য—তাহার অভাবেই ভারতবাসী অতিমাত্রায় কাতর। অন্ন ও বস্ত্রের অভাবে মূলতঃ এ দেশে যত মানুষ হত্যা ঘটে এমন আর কোথাও বোধ হয় ঘটে না। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর দেশে এই অভাব ক্রমশই বৃদ্ধি পাইতেছে। দেশের এই অভাব বৃদ্ধি যদি প্রমাণিত সত্য হয়—তবে দেশ শুশাসিত হইতেছে দেশের লোকের আয় ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে ইহাও কি সত্য হইতে পারে?

• • • •

জগতের অপর কোন দেশে এমন অন্নাভাব, বস্ত্রাভাব হইলে তেমন আশ্চর্য্যের কথা কিছু হইত না। কারণ অনেক অবস্থা সম্পন্ন দেশ জগতে এমন আছে যেখায় লক্ষ্মীর ধান শস্য সম্ভার-মোটেই বর্দ্ধিত হয় না—যেখাকার লোককে বিশ্ব ঘুঁড়িয়া নিজ দেশের খাদ্য শস্য আনিতে হয়। কিন্তু ভারতে অপর্য্যাপ্ত লক্ষ্মীর ধান, ভারতের শস্য সম্পদে বিশ্ব অন্ন পায়, পেটের জ্বালা মেটায়, অথচ ভারত অন্নপূর্ণা হইয়াও—তাহার সন্তানকে অন্নহীন থাকিতে হয় কেন? ইহাই ভারতীয়ের সমস্যা। বস্ত্র শিল্পে ভারত দেশ বিদেশের বস্ত্র সজ্জ নির্ব্বাহ করিতে পারিত আজ ভারত নিজের বস্ত্র নিজেই জোগাইতে পারিতেছে না কেন?

ইতিহাস, কার্য্য কারণ সম্বন্ধ ও ঘটনা পরম্পরা বিচার করিয়া দেখিতে গেলে ইহার কারণ যে ভারতীয়ের পরাধীনতা হইতেই উদ্ভব হইয়াছে তাহাতে সন্দেহের অবকাশ থাকিবে না। কিন্তু এই পরাধীনতা পরবশতার এই দুঃখ ইহা বহন করিবার জন্য দায়ী কে—এ প্রশ্ন যদি উঠে তবে অবশ্যই বলিতে হইবে এ জন্যও দায়ী একান্ত ভাবে ভারতীয়ই—অপর কেহই নাই। আজ দেশের সন্তানের বিচারহীন দায়ীত্বে দেশের অগণিত সন্তান অন্নাভাবে মরিতেছে, দেশের মুখ শান্তি লোপ পাইয়া—আজ কলহের দাবানলে দেশ দগ্ধ করিতেছে—তবু এ দেশে এমন একটা সমবেত ভারতীয় জাতীয় প্রশ্ন কি উঠিবে না—যে দেশের এই মরণমুখী অবস্থা আসিল কেন? কি ইহার প্রতিকারের উপায়—কি পথ?

• • • • •

যুদ্ধের পূর্ব্বে ভারতের অর্থ সম্পদের পরিমাণ ছিল ৩,৬০০ পাউণ্ড অথবা ৪,৩০০ কোটি মুদ্রা। প্রতিজন শিশু ভারতীয়ের সম্পত্তির মূল্য দাঁড়ায় ১৮০৲ মুদ্রা। এই স্থলে ক্যানাডাবাসীর আয় ৪,৪০০৲ এবং যুক্ত সাম্রাজ্যের অধিবাসীর আয় ৬০০০৲। বর্ত্তমানে টাকার মূল্য কমিয়া যাওয়া সত্বেও ভারতীয়ের আর্থিক অবস্থা আরও খারাপ হইয়াছে এবং আয় কমিয়া এখন ভারতীয়ের জন শিশুর বার্ষিক আয় দাঁড়াইয়াছে ৪৫৲ হইতে ৬০৲। খুব বেশী করিয়া ৬০৲ মাথা পিছু বার্ষিক ধরে আয় ধরিলেও মাসিক জন শিশু ভারতীয়ের আয় দাঁড়ায় ৫৲। এ স্থলে ক্যানাডা-বাসীর মাথা পিছু গড়ে বার্ষিক আয় ৫৪০৲ এবং যুক্ত সাম্রাজ্যের অধিবাসীর আয় ৭২০৲। সমগ্র ভারতের জন প্রতি ব্যবসায়গত আয় ২০৲ ২৫৲ মুদ্রা, যুক্ত সাম্রাজ্যের ও ক্যানাডার ব্যবসায়গত আয় এই স্থলে ৩৩০৲ ও ৫১০৲। হীন দরিদ্রভাবে থাকিবার জন্য ভারতীয়ের মৃত্যুর হার অত্যন্ত বেশী—হাজার করা ত্রিশ জনেরও বেশী, অথচ ক্যানাডা বা যুক্ত সাম্রাজ্যে মৃত্যুর হার ঐ স্থলে হাজার করা ১৪ জনেরও কম। ভারতীয়ের জীবনের সীমা সাধারণতঃ ২৭ বৎসর অথচ ইওরোপীয় দেশ সমূহের লোকের জীবনের সীমা ৫৫ বৎসর। শিক্ষা ভারতে নাই বলিলেই চলে ভারতীয়ের শতকরা ৬ জন লোকও শিক্ষিত নয়—এমন কি সাধারণ অক্ষর জ্ঞান পর্য্যন্ত নাই। সাধারণ সর্ব্ববিষয়েই যাহারা মানবতার এত নিম্নপর্য্যায়ে পড়িয়া আছে তাহাদের কর্ম্মক্ষমতা ও মনুষ্যত্বও যে কমিয়া যাইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি?

বাতায়ন

——— ——— ———(কলিকাতা রিভিউএর সৌজন্যে)'

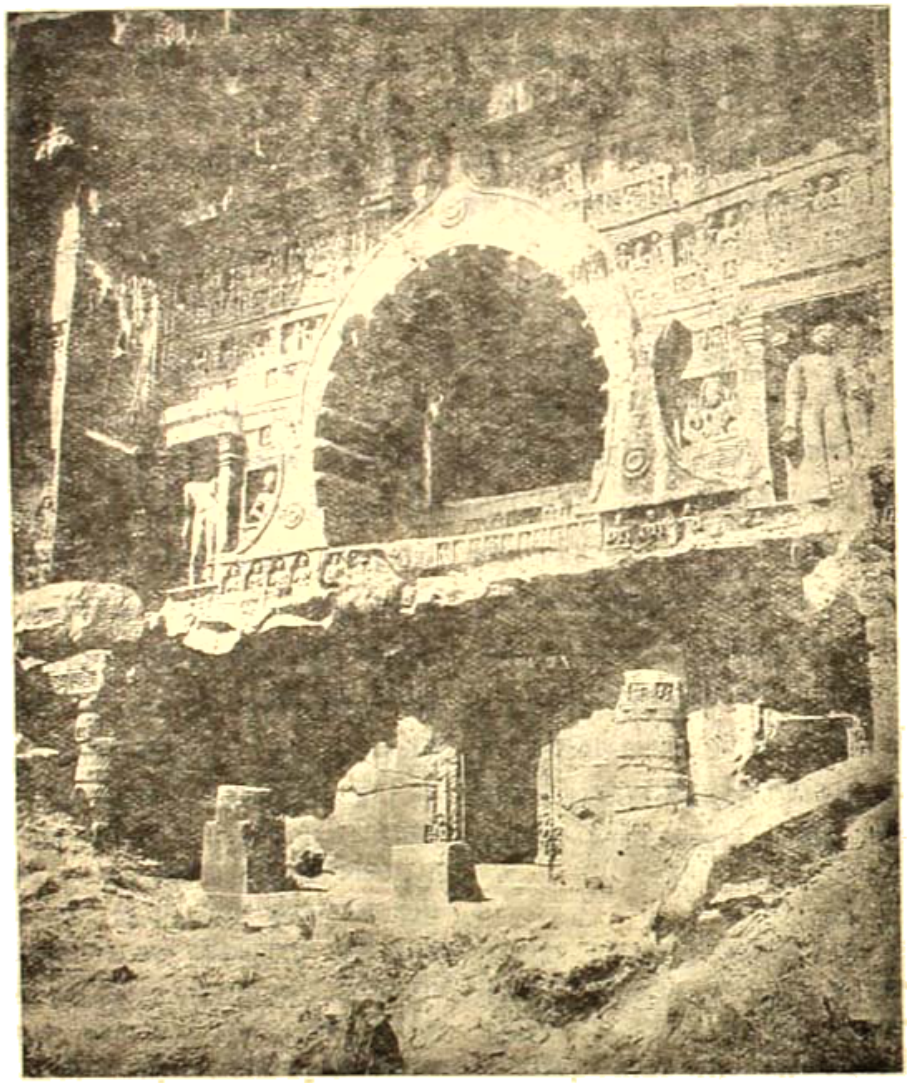

অজন্তার সম্মুখ দৃশ্য।

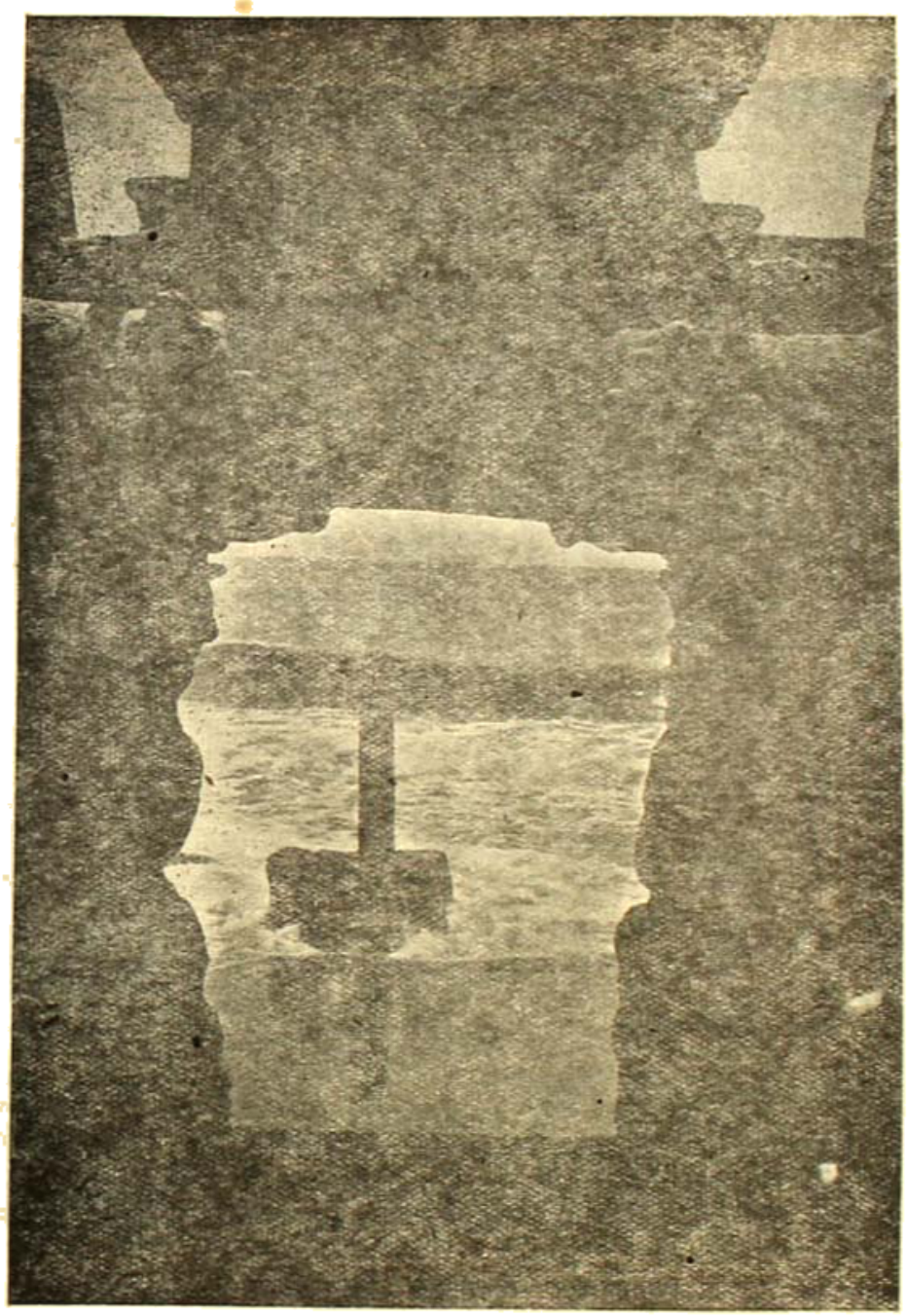

সমুদ্রতীরে মমল্লাপুরমের দৃশ্য।

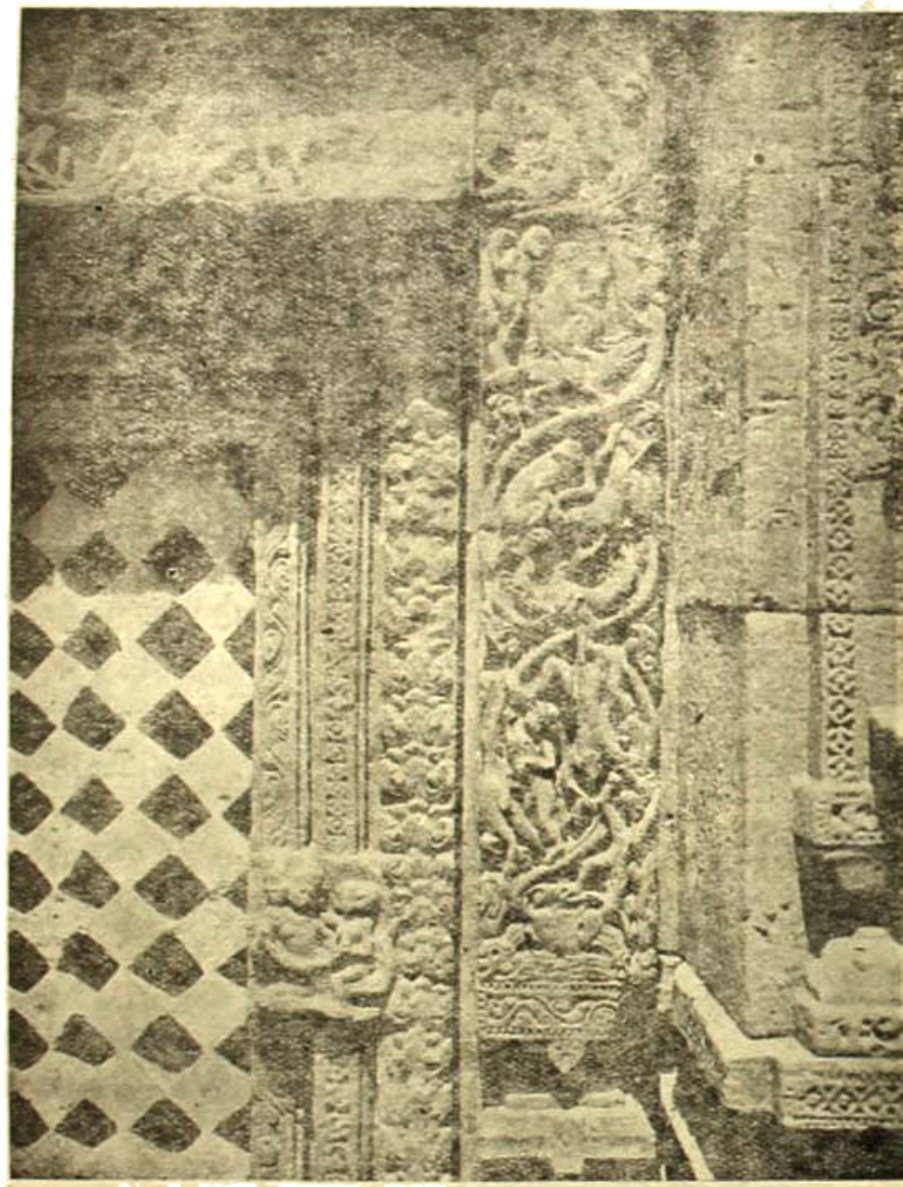

ভুবনেশ্বরে—মুক্তেশ্বর মন্দির হইতে।

পরীক্ষার পুরস্কার

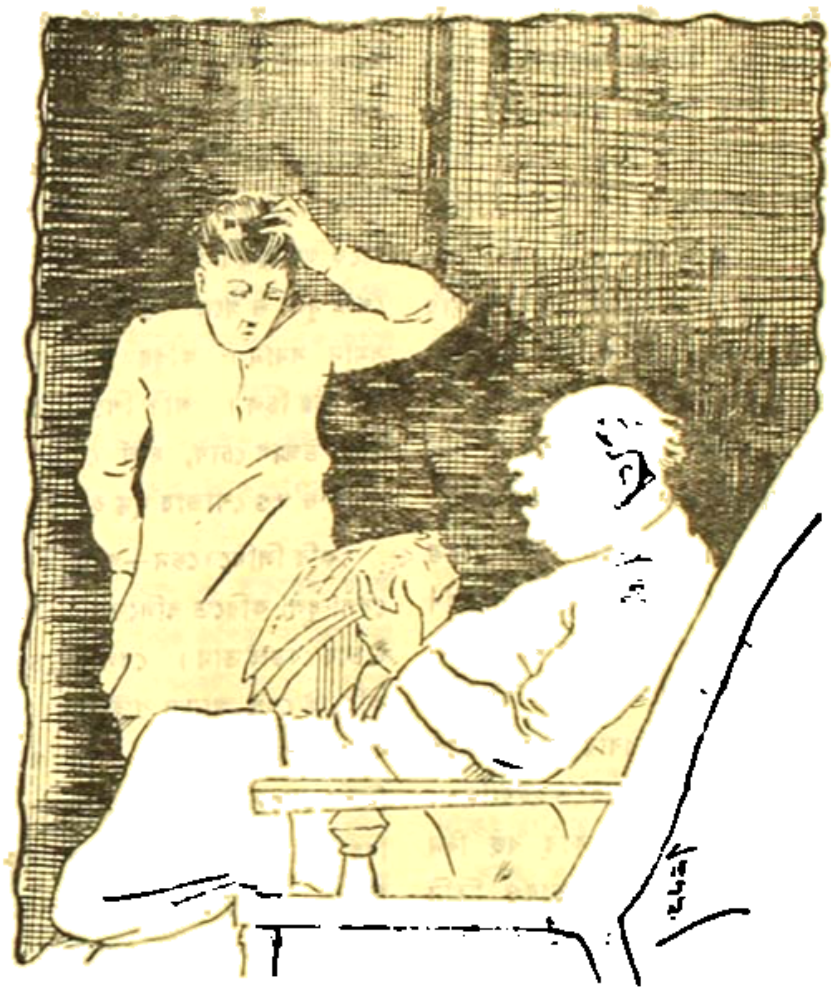

পিতা।—কিহে বাবু কাগজে যে তোমার নামই খুঁজে পেলেম না—এত করে বল্লুম যে ভালকরে পড় যি, এ পাশ করেই একখানা মোটর কিনে দেব—তা কি কর্লে বল দেখি—

পুত্র।—(বিনীত ভাবে) আজ্ঞে মোটরকার চালান প্রাক্টিশ কর্ছিলুম তাতেই ভাল রকম পড়া কর্বার সময় ফুলিয়ে উঠ্তে নি—

কবির প্রেম

ভিক্টর হুগো

[শ্রীমতী সুমতি দেবী]

প্রেম ভাবের একটা আতিশয্য। ইহা অনুভব করা যায়, দেহ মনের সমস্ত তন্ত্রী ইহাতে আন্দোলিত হইয়া উঠে। হৃদয়ে দহন জ্বালা জ্বলে। প্রেমিক কবিরা কাব্যের ছন্দে প্রেমের এই বিচিত্র সুর, বিচিত্র অনুভূতিময় ভাব প্রবাহ বহিতে পারেন। তাই কবির ভালবাসা—কবির প্রেম জীবন আমাদিগের জানিবার ইচ্ছা হয়। আজ আমরা জগতের একজন শ্রেষ্ঠ কবি ও সাহিত্যিকের প্রেম জীবনের পরিচয় দিব। এ প্রেমে বিশেষ বৈচিত্র্য কিম্বা অসাধারণ কিছু নাই। কিন্তু প্রেমই ছিল ভিক্টর হুগোর জীবন, প্রেম ভাবে ভরপুর অবস্থাতেই তাঁহার কলালক্ষ্মী পূর্ণ বিকশিত হইয়া উঠিয়া তাঁহাকে যশ ও কৃতকার্য্যতার অম্লান সুরভি গৌরব মাল্য পরাইয়া দিয়াছিলেন।

ভিক্টর হুগো তখন বালক মাত্র। তাঁহার কল্পনা সবে বিকশিত হইয়া উঠিতেছে। এই সময়ে কবির চিত্তে সুন্দরী এডেল ফাউচারের মোহিনী-মূর্ত্তির ছবি পড়িল। এই সুন্দরীকে কবি লাভ করিতে পারিবেন কি না জীবন-সঙ্গিনীরূপে তাঁহাকে পাইবেন কি না এ সন্দেহ বরাবরই তাঁহার মনে ছিল। ইহাকে লাভ করিবার জন্য কবিকে নানা ভাবে তাঁহার যোগ্যতা ও প্রেম জানাইতে হইয়াছিল। নারীর দিক হইতেও কোন সঠিক উত্তর কবি বহু দিন পর্য্যন্ত পান নাই। এই মোহিনীর চিত্তের ভাবও তিনি কিছুই স্থির বুঝিতে পারিতেন না। এই মোহিনী সুন্দরীকে কখনো এক ভাবে দেখা যাইত না—কবি হুগো তাঁহাকে যতবার দেখিতেন ততবারই নূতন ভাবে তাঁহার সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতেন এই জন্যই হুগো সে সৌন্দর্য্যকে শ্রদ্ধা করিতেন সম্ভ্রম করিতেন, সুন্দরীও এই গুণেই আজীবন কবির ভালবাসার পাত্রী হইয়া থাকিতে পারিয়াছিলেন। সকল পুরুষের চিত্তেই শিকার স্পৃহা প্রবল, সহজে যাহা ধরা যায় পাওয়া যায় পুরুষ চিত্ত তাহাতে, অধিক দিন আকৃষ্ট থাকে না।

যদিও এডেলকে লাভ করিবার জন্য তাঁহাকে এত কষ্ট সহ্য করিতে হইয়াছিল তবুও এডেল ও ভিক্টর অতি শিশুকাল হইতেই সঙ্গী-সাথী ছিলেন। তাঁহাদের পিতা মাতাও বহুকাল প্রতিবেশী ও বন্ধু ছিলেন। উভয়ের মাতা—শ্রীমতী হুগো ও শ্রীমতী ফাউচারও অবসর সময়ে ঘর সংসারের আলাপ করিতেন। উভয়ের পিতা—জেনারেল হুগো, ও মুঁসো হুগোও অবসর সময় বিশ্রম্ভালাপে যাপন করিতেন। বালক বালিকার পিতামাতারা এক-দিকে গল্প গুজব করিতেন বালক বালিকাও অন্য দিকে খেলা ধুলা ও গল্পে মত্ত হইত। তাঁহাদের বয়সও ছিল সমান সমান। কবির ও এডেলের উভয়ের প্রকৃতিই স্বপ্নাচ্ছন্ন ছিল। অতি শিশু কালেই কবি এডেলের 'ভাসা ভাসা উজ্জ্বল চোখ, দীর্ঘ কেশগুচ্ছ, সুন্দর রং, গোলাপী ঠোঁট ও গড় গোড়ার মুগ্ধ হইয়াছিলেন।

কবি লিখিতেছেন—আমাদের মা আমাদের একত্রে খেলা-ধুলা করিতে বলিতেন। আমরা খেলার পরিবর্ত্তে উভয়ে বেড়াইতাম। খেলার চেয়ে আমরা দু'জনে কথা কহিয়াই বেশী আনন্দ পাইতাম। আমরা দু'জনে একই বয়সের শিশু ছিলাম।.....বড় আপেলটিই আমি তাহার নিকট হইতে লইতাম, একদিন সে পাখীর ছানা আমায় দিয়াছিল না বলিয়া তাহাকে এক চপেটাঘাত করিয়া-ছিলাম। কিছু কাল পরে সে আমার বাহুতে ভর দিয়া চলিতে লাগিল, আমি যেন কেমন গর্ব্ব অনুভব করিলাম একটা নূতন ধরণের অনুভূতি যেন আমার প্রাণে জাগিল। আমরা ধীরে ধীরে চলিতাম—মৃদু স্বরে কথা কহিলাম। সে তাহার রুমাল ফেলিয়া দিলে আমি তাহা উঠাইয়া দিতাম। আমাদের দু'জনার হাতে হাত লাগিত—এবং কাঁপিয়া উঠিত। সে ছোট ছোট পাখীর কথা, আমাদের মাথার উপরকার তারার কথা,—অস্তকালে সূর্য্যের বর্ণের কথা, তাহার স্কুলের সঙ্গিনীদের কথা, ফ্রক, রিবনের কথা কহিত। অতি সাধারণ জিনিসের কথা কহিতে কহিতেও আমাদের মুখ লাল রাঙ্গা হইয়া উঠিত। কারণ ছোট বালিকা তরুণী বিদেশিনী হইয়া উঠিয়াছিল।'

কিছু কাল পর্য্যন্ত তরুণ তরুণীর জীবন এই প্রকার আনন্দেই অতিবাহিত হইতে লাগিল। কিন্তু ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে ভিক্টরের বয়স যখন ষোল ও এডেলের পনের তখন হুগোর গৃহে পারিবারিক অশান্তি আসিয়া উঠিল। হুগোর পিতা মাতা উভয়ে পৃথক ভাবে বাস করিতে লাগিলেন। দুই স্থানের খরচ চালানো সাধ্যাতীত বলিয়া তাঁহারা উভয়ে পূর্ব্বের বাসস্থান ত্যাগ করিয়া সাধ্যমত ভাড়ায় ঘুরে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন। কিন্তু ঘুরে গিয়াও শ্রীমতী হুগো প্রায় প্রতি সন্ধ্যায়ই শ্রীমতী কাউচারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন। শ্রীমতী হুগোর সঙ্গে তাঁহার দুই পুত্র ইউজেন ও ভিক্টরও আসিতেন। ইউজেনের কিন্তু এই পারিবারিক সম্মেলন বড় ভাল লাগিত না। নারীরা এক জায়গায় বসিয়া সেলাই করিতেন বা বুনিতেন মুলো কাউচার এককোণে পুস্তক পাঠে নিমগ্ন থাকিতেন। সব চুপ চাপ—এ যেন ঘুমন্ত রাজপুরীর নীরব অধিবাসীর দল। এই ভাবে নীরবে বসিয়া থাকিয়া মধুর সন্ধ্যা অতিবাহিত করা ইউজেনের আদৌ লাগিত না।

ভিক্টরের কাছে কিন্তু এই নীরবতা ও সকলের কর্ম্মে নিবিষ্টতাই ভাল লাগিত। কেহই মুখ তুলিয়া না চাহিয়া যার যার হাতের কাজে ব্যাপৃত থাকিলেই হুগোর পক্ষে সুবিধা হইত। হুগো ততক্ষণ প্রাণ ভরিয়া একদৃষ্টে এডেলের পানে চাহিয়া তাঁহার রূপ সুধা পান করিতেন। ভিক্টরের একাগ্র দৃষ্টি এডেলকে আনন্দ দিত। এডেল সে দৃষ্টির অর্থ জানিতে চাহিতেন। হুগো কিন্তু লজ্জায় তাঁহাকে কিছু বলিতে পারিতেন না। ভিক্টর নিজেও এই প্রাণ ভরিয়া দেখিবার ইচ্ছার কোন কারণ নির্ণয় করিতে পারিতেন না—শুধু তাঁহার মনে হইত এ কি পরিবর্ত্তন—সব সময় নিকটে পাইবার জন্য অন্তরের এ কি ব্যাকুলতা!

কিন্তু অধিক দিন আর এই নীরব পূজায় প্রণয়ীরা তৃপ্ত থাকিতে পারিলেন না। এডেলও এখন কবির দৃষ্টির সঙ্গে দৃষ্টি মেলান, চারি চক্ষু একত্র হয়। কবির চিত্ত পুলকে মাতিয়া উঠে। এই নীরব ব্যাকুলতা তাঁহার প্রকাশিত হইবার জন্য দুই জনের প্রাণেই গুমরিয়া মরিতে লাগিল। ১৮১৯ খৃষ্টাব্দের এপ্রেল মাসে হুগোকে নিরালায় পাইয়া এডেল জিজ্ঞাসা করিলেন 'তোমার প্রাণের সব চেয়ে বড় গোপন কথাটি কি আমায় বল—আমিও তোমায় আমার তা বলবো।'

হুগো হঠাৎ বলিয়া ফেলিলেন—আমি তোমায় ভালবাসি!'

প্রতিধ্বনির মত শোনা গেল, 'আমিও তোমায় ভালবাসি।'

এই সব—আর শুধু মাত্র একটি মধুর মৃদু চুম্বন। বালক বালিকার ভাবেই এই প্রেমের অভিনয় চলিল। ইহা তাহাদের মধ্যে একরকম গোপনই রহিল। এর পরে একবার নির্জ্জনে নিভৃতে গোপন সাক্ষাৎ, একটি লুকান চুম্বন ইহাই হইল প্রেমের খোরাক। ধীরে ধীরে এই ভাবে ভালবাসার সত্য মাধুর্য্য তাঁহাদের প্রাণে উজ্জ্বল হইয়া উঠিতে লাগিল।

শীতের অবসানে গ্রীষ্ম আসিলে কোচার পরিবার প্যারী ছাড়িয়া ইনের পল্লি ভবনে গেলেন। যার সঙ্গে এখন আর নিত্য নিত্য এডেলের গৃহে যাওয়া হয় না। ভিক্টরের একা সেথায় যাইবার সাহস হয় না। একাকী প্যারীতে থাকিয়া ভিক্টর বিষণ্ণ ভাবে দিবা নিশি এডেলের কথা ভাবিতে লাগিলেন। এডেলও তাঁহার কথা কি এমনি ভাবিতেছে? সে কি করিতেছে, কি খাইতেছে, কোন পোষাকটি পরিতেছে—এমনি শত চিন্তায় ভিক্টরকে সর্ব্বদা আচ্ছন্ন রাখিত।

শরৎ কালে এডেল প্যারীতে ফিরিয়া আসিলেন। এবার আর তাঁহারা বালক বালিকা ভাবে উভয়ের সঙ্গে মিশিতে পারিলেন না, এবার তাহারা পুরুষ ও নারী ভাবেই মিশিলেন। প্রেমের রহস্যময় বাঁধনে দুইজনে বদ্ধ হইয়া গেলেন। কখনো বাগানে গাছের নীচে কখনো পথের পাশে নিরালায় দুই জনে সাক্ষাৎ করিতে লাগিলেন। দিনান্তে একবার কি দুইবার দেখা, দীর্ঘ কাল কথোপকথন—কিন্তু এ সময় যেন দেখিতে দেখিতেই ফুরাইয়া যায়। কথা বলিয়া কথার আর শেষ হয় না। দেখিয়া দেখিয়া আর দেখার পিপাসা মেটে না। তাঁহারা নিত্যই এ উহার কাছে পত্র লিখিতে লাগিলেন।

ভালবাসার এই গোপনতা কিন্তু এডেলকে পীড়া দিতে লাগিল। ভালবাসার এই গোপন কথাটি যাকে বলিবার জন্য তাঁহার চিত্ত অনেক দিন অধীর হইয়াছে, কিন্তু বলিলে পরিণাম কি হইবে এই ভাবিয়া তাঁহার বলিবার সাহস হইত না। একবার ডিউক এডেলকে একখানি কবিতা পুস্তক উপহার দিয়াছিলেন, তাহাতে শ্রীমতী কাউন্টার কন্যাকে সাবধান করিয়া বলিয়াছিলেন, 'পুরুষের উপহার মেয়েদের অমন ভাবে নিতে নাই, তাতে নারীর উপর পুরুষের শ্রদ্ধা কমে যায়। শ্রদ্ধা হারালে আর তার ভালবাসা জয় করা যায় না।'

এডেলের মনে এ কথার ভয় ছিল। ডিউক তাঁহাকে লিখিলেন—কি আর তোমায় বোঝাবো আমি—হাজার হাজার বার কি তোমায় এ কথা বলি নাই? আমার জীবনের চেয়েও আমি তোমায় বেশী ভালবাসি—এ কথা বললে অতি সামান্যই বলা হবে—কারণ তুমি জান; তোমায় ঘৃণা করি তোমায় শ্রদ্ধা করি না একথা তুমি যেন আর বোলো না। তুমি যদি আবার আমায় এ কথা বল তবে আমি বড় রাগবো। জীবনকে আমি অতি অল্পই গ্রাহ্য করি।.....আমি তোমার শ্রদ্ধা করতে না জানলে তো তোমায় ভালবাসতে পারতেম না। আমার প্রেমের গভীরতা তোমার অজানা নাই। আমি তোমার স্বামী—অন্তত আমি তো তাই মনে করি। তুমি শুধু ঐ নামটা আমার ছাড়াতে পার.....

জান কি তোমার চিন্তায় আমার কত সুখ হয়—কত অধীর করে তোলে। মনে ভাবি সমস্ত বাধা বিঘ্ন সত্ত্বেও যদি শুধু এক দিনের জন্যও আমি তোমার স্বামী হতে পারি! মন যদি কাল আমাদের বিয়ে হয় আর পরশু দিন আমি মরে যাই—তবে এক দিনের জন্যও আমি সুখী হতে পারি, তোমার তো তাতে কেউ কিছু বলবে না। তুমি আমার বিধবা পত্নী হবে। এডেল আমার—এ ভাবে ব্যবস্থা করা তাও কি সম্ভব হবে? সমস্ত জীবন ভরা দুঃখের চেয়ে একদিনের সুখও যে সহস্র গুণে ভাল।

কিন্তু কবির এই এক দিনের জন্য বিবাহের আশাও আর বর্তমানে সফল হইল না। কারণ শ্রীমতী কাউন্টারের সন্দেহ জাগিয়া উঠিয়াছিল। শ্রীমতী কাউন্টার শ্রীমতী হুগোকে এ ব্যাপার জিজ্ঞাসা করিলেন। কিন্তু শ্রীমতী হুগো তো বালক ডিউকের প্রেমের কথা শুনিয়া হাসিয়াই আকুল। ডিউক বালক মাত্র সে প্রেমে পড়িবে এ কি রকম কথা। শ্রীমতী কাউন্টার মুঁসো কাউন্টারকে এ কথা বলিলেন—মুঁসো একথা শুনিয়া খুব আনন্দিতই হইলেন। ডিউককে তিনি ভালবাসিতেন ও বিশ্বাস করিতেন ডিউক তাঁহার জামাতা হইবে এ সুখের কথা। স্বামী-স্ত্রী উভয়ে কথা পাকা করিবার জন্য শ্রীমতী হুগোর কাছে গেলেন।

শ্রীমতী হুগো কিন্তু পুত্রের প্রেমের কথা শুনিয়া বিস্মিত হইলেন। তাঁহার স্নেহের পুত্র ডিউক এ ভাবে তাঁহাকে একবার না জানাইয়া একটা বালিকার প্রেমে পড়িবেন, না আছে বালিকার সহায় না আছে সম্পদ—এ চিন্তাও তাঁহার অসহ্য বোধ হইতে লাগিল। তিনি স্পষ্ট ভাষায় জানাইলেন এ বিবাহ অসম্ভব—ইহা হইতে পারে না। মুঁসো কাউন্টার ও শ্রীমতী কাউন্টার বড় আশা করিয়া আসিয়াছিলেন আশা ভঙ্গে নিরাশ হইয়া তাঁহারা গৃহে ফিরিলেন। বোধা গেল ইহার পর হইতে দুই পরিবারে আর কোনরূপ বন্ধুত্ব ও আত্মীয়তা থাকিতে পারে না।

ডিউক সব শুনিলেন। ঘাড়হেঁট করিয়া মায়ের কোন প্রতিবাদ করিলেন না। মায়ের নিকট হইতে ধীরে উঠিয়া আসিয়া তিনি নিজ কক্ষের দ্বার রুদ্ধ করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। হায় এডেলকে তাঁহার হারাইতে হইল—এডেল-হারা জীবনের চেয়ে মরণও ভাল। আজ ডিউক ভাল করিয়া বুঝিলেন এডেলকে তিনি কত ভাল বাসেন। এডেল কিন্তু এ সব ব্যাপারের কিছুই জানিতেন না, শুধু তাঁহার মনে কেমন যেন একটা ভয় ও সন্দেহ জানিতে লাগিল। তাঁহার পিতা মাতা তাঁহাকে আর কিছুই বলিলেন না—শুধু ডিউকের কাছে আর কোনরূপ পত্রাদি লিখিতে নিষেধ করিলেন। তাঁহারা আশিলেন কয়া দু'দিনেই ডিউকের কথা ভুলিয়া যাইবে তাঁহারা স্নেহের অন্য বিবাহের সম্বন্ধও করিতে লাগিলেন। এডেল কিন্তু ভোলেন নাই—তিনি ভুলিতে পারেন না। জীবন তাঁহার কাছে শূন্য মনে হইতে লাগিল। থিয়েটার, আনন্দ-সম্মেলন, নৃত্য কিছুতেই আর তাঁহাকে আনন্দ

দিতে পারে না। শুধু নিরাশায় থাকিয়াই তিনি সুখী। একাকিনী বসিয়া তিনি ভিক্টরের কথা ভাবিতেন বা তাঁহার চিঠি গুলি বার বার পড়িতেন। শেষ চিঠি খানিতে ভিক্টর নিজ নাম স্বাক্ষর করিয়া লিখিয়াছিলেন—

'আমার অখণ্ড প্রতিজ্ঞা, যে আমি তোমা ভিন্ন অন্য পত্নী গ্রহণ করিব না।.....তাহারা সম্ভবতঃ আমাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিতে পারে—কিন্তু আমি তোমার—চিরকাল তোমারই।—ভি, এম, হুগো।'

সুন্দরীর স্বপনও আশা ছিল।

ভিক্টরেরও তাই। অশান্ত মনকে কর্মে নিয়োজিত করিয়া তিনি শান্তি পাইতে চাহিলেন। এমন ভাবে তিনি কর্ম করিতে লাগিলেন, যে সুন্দরের আরাধ্যা দেবীকে পুরস্কার রূপে পাইবার জন্যই লোকে তেমন করিয়া আপন ভুলিয়া কর্ম করিতে পারে। এই সময়েই তাঁহার সাহিত্য প্রতিভা বিকশিত হইতে থাকে।

মুঁসো কাউচার এই সময়ে নৈস সংগ্রহ বিষয়ে এক খানি পুস্তিকা প্রকাশ করেন। হুগো কিন্তু এই সামান্য পুস্তিকাখানার এক পৃষ্ঠা ব্যাপী সমালোচনা প্যারীর এক বিখ্যাত পত্রে বাহির করিলেন। যেন পুস্তিকাখানি সাহিত্যের রত্ন বিশেষ। কবি গ্রন্থকারকে সেই পত্রিকার এক খণ্ড নিজেই পাঠাইয়া দিলেন। কাউচার হুগোর এই সমালোচনায় অপরিসীম আনন্দ উপভোগ করিলেন। কিন্তু ভিক্টরের প্রতি ইহাতেও তাঁহার মন টলিল না—এমন কি পত্রিকাখানির প্রাপ্তি স্বীকার পর্যন্ত তিনি করিলেন না। কবি কিন্তু ইহাতেও নিরাশ হইলেন না। পরে রাজ কুমারের জন্ম হইলে একখানি গাথা পুস্তক লিখিয়া ভিক্টর তাহা মুঁসো কাউচারকেই উৎসর্গ করিলেন।

এবার আর মুঁসো কাউচার কবির স্তুতিকে অস্বীকার করিতে পারিলেন না। কবিকে কিছু না লিখিয়া কবির ভ্রাতাকে তিনি লিখিলেন 'আমার Manuel de Recrutment সম্বন্ধে ভি, এম, হুগোর সুন্দর প্রবন্ধ ও Duc de Bordeauxর জন্মে যে সুন্দর গাথা লিখিয়া আমাকে উৎসর্গ করিয়াছে তাহার জন্য তাহাকে আমি ধন্যবাদ দিতেছি। আমার পত্নীও এখন খুব আনন্দিত:..

এই ব্যাপারের পর দুই পরিবারের মধ্যে বন্ধুত্ব সম্বন্ধ আবার কতকটা স্থাপিত হইল। ভিক্টর ও এডেলকে কিন্তু মিশিতে দেওয়া হইত না। তবু এখন উভয়ের সংবাদ উভয়ে পাইতেন। ভিক্টর শুনিলেন এডেল অঙ্কন বিদ্যা শিখিতেছেন—কোথায় শিখিতেছেন তাহাও জানিলেন—কবি ও প্রেমিকের সেই যথেষ্ট। একদিন কবি পথের পাশে এডেলের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। যেমনি এডেল আসিতেছেন, তিনি সম্মুখে যাইয়া দাঁড়াইলেন—দু'জনার বহুদিন পরে আবার কথা হইল। ভবিষ্যতে এই ভাবেই পথের মাঝে দুই জনের সাক্ষাৎ হইতে লাগিল। কবির জীবন আবার মধুময় বোধ হইতে লাগিল।

এই ভাবে আরও এক বৎসর অতিবাহিত হইল।

১৮২০ খৃষ্টাব্দের ১৬ই এপ্রেল তারিখে হুগো এডেলকে লিখিলেন এডেল—আজ কি তোমার সেই দিনের কথা মনে আছে। সেই দিনের কথার উপরেই আমার জীবনের সুখ দুঃখ সব নির্ভর করিতেছে...সেই দিন হইতে আমি নিঃশ্বাস ফেলি, কথা কহি, কার্য্য করি সব তোমার কথা ভাবিয়া.....

এই সময়ে শ্রীমতী হুগো অত্যন্ত অসুস্থ হইয়া পড়িলেন। দু'মাস সব সময় মাতার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া ভিক্টর মাতার সেবা করিলেন। এই দুই মাস তিনি এডেলের সঙ্গেও সাক্ষাৎ করেন নাই বা পত্রাদিও লেখেন নাই। কিন্তু পুত্রের এত সেবা শুশ্রূষাও মাতা বাঁচিলেন না।

কবির জীবনে আর গৃহ বা পরিবারের কোন বন্ধন রহিল না। পিতা গৃহত্যাগী, ভ্রাতারাও তাঁহার প্রতি উদাসীন, এডেল ও দূরে! মাতার মৃতদেহ সমাধিস্থ করিয়া আসিয়া গৃহে আর কবির চিত্ত স্থিতিতে চাহিল না। সন্ধ্যার অন্ধকারে কবি বাহিরে বাহির হইয়া পড়িলেন। কবি আপনার অজ্ঞাত সারে এডেলের গৃহে পৌঁছিলেন। উঠান হইতে শুনিতে পাইলেন গৃহে নৃত্য-গীত চলিতেছে। উপরে উঠিয়া তিনি দেখিলেন নাচ ঘরে এডেলও রহিয়াছেন। কিছু দিন পরে ভিক্টর এডেলকে সে দিনের ঘটনার লিখিয়াছিলেন, অনেকক্ষণ তোমার ভিক্টর নির্বাক নিষ্পন্দ ভাবে শোক চিহ্ন ধারণ করিয়া দাঁড়াইয়া নাচের

পোষাকে সজ্জিতা তাহার,এডেলের পানে চাহিয়াছিল... প্রিয়তমে আমার চিত্ত ভাসিয়া যাইতেছিল !

এডেল কিন্তু হুগোর মাতার মৃত্যু সংবাদ কিছুই জানিতেন না জানিলে তিনি এ বেশে সজ্জিতা হইয়া কখনই নৃত্যে যোগ দিতেন না। এডেল জানিলে তখনই শত বাধা সত্ত্বেও প্রেমিককে সান্ত্বনা দিতে যাইতেন। একথা শুনিয়া শত দুঃখের মধ্যেও হুগোর মনে আনন্দ হইল। ফাউচার পরিবার ইহার কিছু দিন পরে প্যারীর বাহিরে গেলেন। হুগোও আর একাকী প্যারীতে থাকিতে পারিলেন না, তিনিও তাহাদিগকে দেখিবার জন্য তথায় রওনা হইলেন। কবির হাতে পয়সা নাই—পথব্রজে তিন দিন চলিয়া কবি সেথায় পৌঁছিলেন। এত কষ্ট সহিয়া কবির পুরস্কার মিলিল, এডেলের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল।

এই খানে কবির সঙ্গে এডেলের নিত্যই সাক্ষাৎ হইত। মুঁসো ফাউচারের মনও ঘুরিল। তিনি হুগোকে বারবারই ভাল বাসিতেন। হুগোর আর্থিক অবস্থা ভাল হইলে তিনি তাঁহাকে কন্যাদান করিতে সম্মত হইলেন। তবে যে পর্য্যন্ত তাহা না হয়, ততদিন পত্র ব্যবহার চলিতে পারে না, বলিয়া দিলেন। কিন্তু ফাউচার ইহাও বেশী দিন স্থির রাখিতে পারিলেন না কারণ কবি তাঁহার কন্যাকে পত্র না লিখিলেও কন্যার পিতাকেই সুদীর্ঘ উচ্ছ্বাস পূর্ণ পত্র লিখিতে লাগিলেন। সে পত্র লেখা কিছুতেই বন্ধ হয় না—ব্যাপার হাস্যকর হইয়া দাঁড়াইল। মুঁসো ফাউচার বুদ্ধিমানের মত কবিকে তাঁহার কন্যার নিকট পত্র লিখিবার অনুমতি দিলেন।

হুগোর তখন স্ফূর্তির অন্ত নাই। তিনি আর্থিক অবস্থার সুব্যবস্থা করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। বিবাহ যত শীঘ্র হয় তাই ভাল। হুগো এডেলকে লিখিলেন——

আমার এ উৎসাহ দেখে—কোথা না প্রিয়তমে। তুমি ভিন্ন কে আর আমার এ উৎসাহ ইচ্ছাশক্তিকে জাগিয়ে তুলতে পারে ? তোমার ভিক্টরের কাছে তুমি স্বর্গের দেবী, একটা সঙ্গীতের মত।'

বিবাহের সব তো ঠিক। এখন শুধু পিতার সম্মতি —আর একটা নিয়মিত আয়ের উপায়। এই সময়ে ভিক্টর একটা নিয়মিত বৃত্তি পাইলেন সামান্য হইলেও তাহা নিয়মিত পাওয়া যাইবে এ একটা বড় আশার কথা! এখন পিতার সম্মতি—ভিক্টর ভয়ে ভয়ে পিতার সম্মতি চাহিলেন। কিন্তু তাঁহার পিতাও পুত্রের নিকট অপরাধী হইয়া পড়িয়াছিলেন। পুত্র অনুমতি চাহিবার তিন সপ্তাহ পূর্ব্বে পিতা নিজেই দ্বিতীয়বার বিবাহ করিয়াছিলেন। পিতা পুত্রের ক্ষমা চাহিয়া পুত্রের বিবাহিত জীবনের সুখ শান্তি কামনা করিলেন।

ভিক্টরের জীবন এতদিনে আনন্দ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। ১৮২২ খৃষ্টাব্দের ১২ই অক্টোবর ভিক্টরের সঙ্গে এডেলের বিবাহ হইল। বিবাহের কয় দিন পূর্ব্বে কবি কবি-প্রিয়াকে লিখিয়াছিলেন 'প্রিয়তমে সন্দেহ কোরো না—আমাদের জীবনের নিশ্চয়ই কোন বিশেষ উদ্দেশ্য আছে। আত্মায় আত্মায় আমাদের এরূপ সম্মিলন হয়েছে যাতে স্বর্গ ও মর্ত্তের সুখ একত্রিত হয়ে আমাদের জীবনে আসবে।

এডেল চিরকাল স্বামীর অনুরাগিনী ছিলেন। কিন্তু ভিক্টর তাহা পারেন নাই। কিন্তু এডেল কখনও তাহা লইয়া স্বামীকে গঞ্জনা দেন নাই। প্রতিভার বর-পুত্রকে তিনি স্বামীরূপে লাভ করিয়াছেন এই ছিল তাঁর বড় সান্ত্বনা। বিশেষতঃ বিবাহের পূর্ব্ব কালে ভিক্টর প্রেমের যে একাগ্রতা ও নিষ্ঠা দেখাইয়াছেন প্রেমের ইতিহাসে তাহাও বিরল।

ইণ্ডিয়ান সোপ কোম্পানীর
মেসিনে প্রস্তুত
চন্দন, রয়েলবকুল, মাস্ক ও ভেলভেট সাবান
ব্যবহার করুন। টেলিফোন, ২৪১৬

মাতৃ-হৃদয়

[শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী]

(২)

পাশের বাড়ীতে হার্মোনিয়াম বাজাইয়া কে গাহিতেছিল—

সারা দিনটা করে খেলা
ফিরেছি এই শাঁঝের বেলা,

আমার খেলার সাথী যে সে ছিল, গিয়েছে চলে।

মনীষা চুপ করিয়া খোলা জানালার ধারে বসিয়া এই গানটী শুনিতেছিল।

বাহিরে তখন ফুট চাঁদের আলো। অগ্রহায়ণের প্রথম শীত এখনও ভাল করিয়া জমাট বাঁধিয়া আসিতে পারে নাই। পূর্ণিমার চাঁদ নির্মল আকাশে হাসিতেছে, তাহার অনাবিল রজত-কিরণ ধারায় সারাদিক ভাসিয়া গিয়াছে। গানটা শুনিতে শুনিতে মনীষার দুইটী চোখ অশ্রুতে ঝাপসা হইয়া উঠিয়াছিল। চাঁদের আলো তাহার চোখের সম্মুখ হইতে বিলুপ্ত হইয়া গেল, আসিয়া উঠিল নিকষ কালো অন্ধকার পূর্ণ সন্ধ্যা। আকাশে তেমনি যেন নিবিড় মেঘ, পশ্চিমের আকাশেও আলোর রেখা নাই, একটী তারাও আজ যেন জাগে নাই।

এই নিবিড় অন্ধকারের মধ্যে সেই যেন পথ-হারা একটী পথিক। অন্ধকারে কোথা হইতে কোথায় তাহার পা পড়িতেছে তাহার ঠিক নাই। সে আকাশ পানে চাহিয়া চলিবে—কিন্তু কোথায় আসিয়াছে ধ্রুবতারা যাহা দেখিয়া সে আপনার গতিনির্ণয় করিবে?

এই নিবিড় অন্ধকারের মধ্যে আলো ধরিয়া দাঁড়াইতে সে ডাকিবে কাহাকে? তাহার যে ডাকিবার কেহ নাই। তাহার খেলারসাথীরা—যাহারা তাহার সঙ্গে খেলিতে আসিয়াছিল, সন্ধ্যা লাগিয়েই নিশার অন্ধকার কল্পনা করিয়া ধরিয়া পড়িয়াছে, এ অন্ধকারের মধ্যে আলো দেখাইতে তার আজ কেহ নাই।

পতিতা অভাগিনী নারী, কখনও সে নিজের জীবনে এমন অন্ধকার দেখিতে পায় নাই। আজ সে প্রথম নিজেকে উপলব্ধি করিয়া একেবারে জ্ঞান হারাইয়া ফেলিল।

নারায়ণ—না, তুচ্ছ হও বলনা, এ পবিত্র নাম উচ্চারণে কি ক্ষমতা আছে তোমার? অবশ্য—দেওয়া যে হয় নাই এমন কথা বলা যায় না, তোমায় সবই তো দেওয়া হইয়াছিল। নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছ তুমি নিজেই তো। তুমি নারী সীতা সাবিত্রী ও তো নারী ছিলেন। একই রূপে তুমি আসিয়াছ, যথেষ্ট জ্ঞানও ছিল তোমার, কেন তবে নিজেকে উন্নত করিতে পারিলে না, যথার্থ নারী রূপে পরিচিতা হইতে পারিলে না, কেন তুমি আজ অধঃপতিতা?

মনীষা কাঠের মত জানালায় দাঁড়াইয়া রহিল। হ্যাঁ, সত্যই তো তাহার সবই ছিল, তবে সে কেন এ পথে আসিল। এই যে হৃদয় জয় করার উৎকট বাসনা, ভাবিয়া দেখিলে এ যে তাহার পরাজয়ই মাত্র, এ তো জয় নয়, জয়ীর গৌরব সে তো লাভ করিতে পারে নাই। নিজেকে সে নিজেই যে বিলাইয়া দিয়াছে, তাহার আপনার বলিতে আছে কি, যাহাতে সে নিজেকে বিজিতা ভাবিয়া আত্ম-গৌরব অনুভব করিবে?

কিছু নাই, কিছু নাই, আছে শুধু অনুতপ্ত দহন। একটী একটী কথা মনে হয়, আর সারা বুকটা তখন হু হু করিয়া জ্বলে। সে আগুন তো কিছুতেই নিভে না। নানাপ্রকার বাহ্যিক আনন্দের অনুষ্ঠান করিয়া সে চাপা দিতে চায়, কিন্তু খানিক বাদে যে বেশী অবসাদই আসে।

"মনীষা—"

মনীষার কানে এ আহ্বান গেল না, আত্মভাবে বিভোরা সে—এ কূল ও কূল দুকূল হারাইয়া ফেলিয়া দাঁড়াইয়াছে।

অতুল আস্তে আস্তে অগ্রসর হইয়া তাহার পিছনটা ধরিয়া একটা ঝাঁকানি দিল—'এত ভাবনা কিসের মনীষা?"

চমকাইয়া উঠিয়া মনীষা মুখ ফিরাইল। এই পাশের সঙ্গীর পানে চাহিয়াই তাহার মুখখানা বিবর্ণ হইয়া উঠিল, সে আবার বাহ্য-জগতে ফিরিয়া আসিল।

"অতুল বাবু—আপনার স্ত্রী আছে?"

অতুল হাসিয়া উঠিল, "হঠাৎ এ প্রশ্ন যে মনীষা?"

রুঢ় স্বরে মনীষা বলিল' দরকার না থাকলে জানতে চাইব কেন?"

তাহার কণ্ঠের রুঢ়তা আর মুখের ভাব দেখিয়া অতুল ব্যস্তসমস্ত হইয়া বলিল "আছে।"

"আর ছেলে মেয়ে?" মনীষার কণ্ঠ জড়াইয়া আসিল।

অতুল বিস্মিত হইয়া বলিল, "এতকাল আছ, একদিনও তো এ সব কথা জানতে চাওনি মনীষা।"

মনীষা উত্তর দিল আর না হয় জানতে চাচ্ছি, বলতে আপনার কোনও আপত্তি হবে না বোধ হয়।

অতুল বলিল "দুটি ছেলে মেয়ে আছে।"

মনীষা আবার খানিক বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিল, তাহার পর বলিল "তারা তাদের মায়ের সঙ্গে এক ঘরে আছে?"

অতুল বলিল "হাঁ। আছে।"

মনীষা বলিল "এই সময় আপনার স্ত্রী যদি গৃহত্যাগ করে চলে যায়—"

অতুল হাঁ করিয়া মনীষার মুখের পানে তাকাইয়া রহিল, তাহার পর হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, "তা—কি হতে পারে মনীষা, তুমি ক্ষেপেছ?"

মনীষা কঠোর স্বরে জোর দিয়া বলিল, "কেন হতে পারে না অতুল বাবু, এ রকম তো হয়—ও। স্বামী অপরা নারী নিয়ে আত্মহারা, স্ত্রী শুধু তারপরে অভিমান করে তাকে শুধু জব্দ করবার জন্যেই চলে যায়। বুকের সন্তান বুক ছাড়া হয়ে বিছানায় পড়ে থাকে, মা তার—স্বামীকে জব্দ করতে —"

ত্বরিতস্বরে অতুল বলিল "এ রকম কখনও হতে পারে না।"

রুদ্ধ কণ্ঠ পরিষ্কার করিয়া মনীষা বলিল, "হতে পারে, এ রকম ঘটনা ঘটেছে অতুল বাবু।"

অতুল বলিল "যদি হয়ে থাকে, তবে সে নারীর দ্বারা হয় নি মনীষা। যে নারী তার আকাঙ্ক্ষিত,—তার নারী জীবনের বাঞ্ছিত যা হতে পেরেছে—সে তো আর কিছু নয়। সে তখন বউ নয়, স্ত্রী নয়, সে তখন পরিপূর্ণা মা। এ মাতৃত্ব পদ হতে সে কি নিজেকে নিজে বঞ্চিতা করতে পারে মনীষা? না তুমি আর যা খুশি তাই বলো, স্ত্রীর অবিশ্বাসী হওয়ার কথা বলতে পার, কিন্তু মায়ের কথা বলো না।"

"কিন্তু—তাই যে হয়েছে অতুল বাবু, প্রমাণ যে আমিই নিজে—"

হাহাকার করিয়া কাঁদিয়া মনীষা মাটিতে লুটাইয়া পড়িল, "ভাবলুম—বড় জব্দ করেছি, কিন্তু জব্দ হয়েছি যে নিজে।" অতুলের বুকের মধ্যে শিশুর ক্রন্দন শুনছি—সে ডাকছে—মা আয় মা আয়! আমি আনন্দ করতে করতে খেমে যাই, হাসতে হাসতে কেঁদে ফেলি, আমার বুকের মাঝে সর্ব্বদাই যে সে কেঁদে ফিরছে। সেই যে তাকে বুক ছিঁড়ে রেখে এসুম, সে যে তখন ঘর শান্তিতে তার মায়ের বুকে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েছিল। আমার বাছা—আমার যাদু—"

উচ্ছ্বসিত হইয়া সে কাঁদিতে লাগিল।

(২)

অন্ধকার? হাঁ, দণ্ডায়িক অন্ধকার। রুদ্ধ—রোষন মূর্ত্ত হইয়া ফুটিয়া উঠিতে চায়। শান্তি? কোথা শান্তি? অশান্তি, কেবল অশান্তি। পৃথিবীর বুকের উপর দিয়া অশান্তি পবন বহিয়া যাইতেছে যে, শান্তির আশা বৃথা।

মনীষা আর কিছুতেই চিঁকিতে পারিল না। বুকের মধ্যে আকুলি বিকুলী কান্নার তরঙ্গ মা আয় মা আয়।

বাছা যে—

কোথায় সে ডাকিতেছে, সে ডাক মর্ম্মার অন্তরে বাজিয়া বাজিয়া উঠিতেছে যে। হায় রে হায়, সে যে জব্দ করিতে গিয়া নিজেই জব্দ হইল, নিজেই প্রতারিতা, বঞ্চিতা হইল।

অস্থির হইয়া সে একদিন বাহির হইয়া পড়িল।

চুয়াডাঙ্গায় নামিয়া পড়িয়াই হঠাৎ তাহার মনে হইল কোথায় যাইতেছে সে, এখানে তাহার কে আছে।

দূরে বনানীবৃত গ্রামখানা, খানিকটা মাঠ পার হইয়া সেই বনানীবৃত গ্রামে পৌঁছিতে হইবে। ওই যে সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ নারিকেল

গাছটী এখান হইতে দেখা যাইতেছে, ওটী তাহাদেরই বাগানে আছে।

আজ দুই বৎসর সে গ্রাম ছাড়িয়া গিয়াছে। গ্রামের বুকে এখনও তাহার কলঙ্ক গাথা জাগিয়া। পা বাড়াইতে মনীষার সারা বুক সারা দেহ থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। না কোথায় যাইতেছে সে? যেখানে সে কলঙ্কের নিশ্বাস প্রোথিত করিয়া গিয়াছে, আবার সেই খানে গিয়া সেই নিশানের নিচে দাঁড়াইবে সে? না, সে ফিরিবে—সে যাইবে না।

মনীষা ফিরিয়া দাঁড়াইল।

হায় রে অবোধ নারী, তুই ফিরিবি কেমন করিয়া? তুই তো এখন কন্যা নহিস, স্ত্রী নহিস, তুই যে মা। তোর সন্তানের রোদন ওই যে বায়ুস্তরে ভাসিয়া আসিতেছে। সে রোদন তোর কানে বাজিতেছে না, সে যে বুকের মধ্যে গিয়া বাজিতেছে। তুই ফিরিবি কি করিয়া, তুই যে মা।

হাঁ, এই মাতৃত্বই তাহাকে সম্মুখে ঠেলিয়া লইয়া যাইবে, তাহাকে কিছুতেই ফিরতে দিবে না।

জীবনের যত বড় ভুলটা সে ঘটিয়া মুছিয়া আবার পুরাতন স্থানে ফিরিয়া আসিতেছে, তাহাকে আসিতেই হইবে যে। অতুল যথার্থ কথাই বলিয়াছে। স্ত্রী ও বিশ্বাস ঘাতকতা করিতে পারে, কিন্তু মা কখনও বিশ্বাস ঘাতকতা করিতে পারে না। জগৎ হইতে এককালে সব সম্পর্কই উঠিয়া যাইলেও যাইতে পারে, কিন্তু মধুর মাতৃ-সম্পর্ক কখনও উঠিবে না। সন্তই মলিন হইতে পারে কেবল মায়ের স্মৃতি কিছুতেই মলিন হইতে পারে না।

গায়ে মোটা কাপড় খানা জড়াইয়া মনীষা কম্পিত বক্ষে অগ্রসর হইয়া পড়িল।

সন্ধ্যার আঁধার ধীরে ধীরে তখন গ্রামের বুক ছড়াইয়া পড়িতেছে, ধীরে ধীরে তাহার পূর্ব্ব পরিচিত বাঁশের ঝোপ, জঙ্গল গুলি আঁধারে পূর্ণ হইয়া উঠিতেছে। ঘাটের পথে দুই একটী ত্রস্তা গৃহে প্রত্যাগত নারী মূর্ত্তিকেও দেখা গেল, মনীষা তাড়াতাড়ি পাশ কাটাইয়া দাঁড়াইল।

একজন তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল—কে গো তুমি?"

ইহার উত্তর কেমন করিয়া দিবে সে? অবগুণ্ঠন আরও বেশী করিয়া সে টানিয়া দিল।

প্রশ্নকারিণীর সঙ্গিনী একজন বলিয়া উঠিল, 'আবার কে নিশ্চয়ই কোন পতিতা মেয়ে টেয়ে হবে। ওর সঙ্গে আবার বেচে কথা বলা কেন, ছিঃ। ওদের মুখ দেখলেও পাপ, চলে আয়।"

সত্য এ কথা, পতিতার মুখ দেখিলেও পাপ। মনীষার বুকের রক্ত চন্ চন্ করিয়া উঠিল—হাঁ, যথার্থই সে পতিতা। এক দিন এমন দিন তাহারও ছিল—আঃ কোথা গেল সে দিন? আজ যে তাহার সেখানে কাঁদিয়া লুটাইয়া পড়িতে ইচ্ছা হইতেছে। এই তীর্থ সে ছাড়িয়া গিয়াছিল কোথায়?

এক দিন সে ও এই ঘাটে অমনি গর্ব্বপূর্ণ বুকে আসিয়াছিল, এক দিন সে এই সতী নারীদেরই একজন ছিল। আজ সে সব হারাইয়াছে, আজ সে পতিতা।

ওই যে স্বামীর গৃহ দেখা যায়। তুলসী তলায় কে দীপ দিতে আসিল। ওই তুলসী তলায় দুই বছর আগে সে ও দীপ দিত, গলায় আঁচল জড়াইয়া স্বামী পুত্রের মঙ্গল কামনা করিত। আজ সে নিশ্চল প্রতিমার মত দেখিতেছে কার স্থান কে অধিকার করিল।

সব ফুরায় স্মৃতি ফুরায় না কেন? আঃ, সঙ্গে সঙ্গে যদি স্মৃতিটাও ফুরাইত তাহা হইলে তো এত জ্বালা পাইতে হয় না।

মনীষা চোরের মত ঘরের পাশে দাঁড়াইয়া রহিল, একবার সে তাহার ছেলেটীকে দেখিবে। তার বাছা কত বড় হইয়াছে, কি রকম হইয়াছে, তাহা সে দেখিবে। তাহার পর তাহার অদৃষ্টে যাহা হয় হইবে।

একটী তরুণী যুবতীকে সে রন্ধন গৃহে দেখিতে পাইলে—স্বামী আবার বিবাহ করিয়াছেন—একটা শান্তিপূর্ণ নিশ্বাস সে ফেলিল। তিনি অসুখী নহেন, সুখী হইয়াছেন—কিন্তু তাহার ছেলে, তাহার বাছা?

সে যখন গৃহ ত্যাগ করিয়া গিয়াছে তখন সে ছিল তিন বছরের, দুই চারটা কথা কহিত। আজ সে পাঁচ

বছরেরটী হইয়াছে, না জানি কত কথা কহিতে শিখিয়াছে।

রাখাল, ভাত দিয়েছি যে, খাবি আয়।"

জননীর বুকের মধ্যে জোরে স্পন্দন হইতে লাগিল। এইবার সে বড় ঘর হইতে বাহির হইবে, রন্ধন গৃহে যাইবে সে তাহার রাখালকে দেখিতে পাইবে।

"মা, আলো নেই যে, কেমন করে যাব?"

যুবতী ঝঙ্কার দিয়া বলিয়া উঠিল অমনি আসবি। ওঃ আমার নবাব-জাদা-রে, ওকে আবার আলো ধরতে হবে? কিসে থাকে অন্ধকারে, খেতে আসবি।"

অব্যক্ত বেদনায় অন্তরাসন্থিতা মায়ের হৃদয় কাটিয়া যাইতেছিল।

রাখাল অন্ধকারেই বারান্দা হইতে গিয়া হুড়মুড় করিয়া নিচে পড়িয়া গেল, আর্ত্ত কণ্ঠে কাঁদিয়া উঠিল।

"আহা, বাছারে,"

অগ্রসর হইতে গিয়া মনীষী থামিয়া গেল। এ কি, আত্মভোলা পাগলিনী সে—যায় কোথায়? পুত্রের উপর দাবী করিবার ক্ষমতা তাহার কোথায়?

আলো হাতে যুবতী বাহিরে আসিল, ছেলেটী তখনও উঠিতে পারে নাই, যুবতী তাহার হাত ধরিয়া এক ঝাঁকানী দিয়া উঠাইল—"পোড়ামুখো ছোঁড়া, দু বেলা যে গিলছেন এক কাঁড়ি করে, সে গুলো সব যাচ্ছে কোথায়? গায়ে এক রত্তি যদি জোর থাকে। এর নাম ইচ্ছে করে পড়া—যাতে না তাতে আবার উঠানো। সতীন গো কত আর জ্বাল হবে? সতীন গো জ্বালাবে না তো কি জ্বালাবে যমে? আঃ, মুখপোড়া, তোর মরণ ও তো হয় না, তাতে তুই ও বাঁচিস আমিও বাঁচি!

হা ভগবান, এই কি রাখাল? সে দুই বছর আগে যে রাখালকে রাখিয়া গিয়াছিল, সে রাখাল কই? এই অহি চর্ম্মসার, জীবন্ত দুঃখের প্রতিমূর্ত্তি, এই কি তাহার রাখাল?

মনীষা ললাটে করাঘাত করিয়া বসিয়া পড়িল।

(৩)

সমস্ত রাত্রি সেই ঘরের পিছনে মনীষার কোথা দিয়া কাটিয়া গেল তাহা সে জানে না। ভোরের আলো যখন পূব আকাশের গায়ে ধীরে ধীরে ফুটিয়া উঠিল, তাহার একটু আলো যখন নিকষকালো আঁধারের বুক চিরিয়া ধরার গায়ে আসিয়া পড়িল তখন মনিষা ধড়ফড় করিয়া উঠিল। আর এখানে থাকা তো চলিবে না, তাহাকে যে যাইতে হইবে। এখানে থাকিলে সবাই তাহাকে দেখিতে পাইবে, দিনের আলো তাহাকে প্রকাশ করিয়া দিবে যে। হায় রজনী, এত শীঘ্র কেমন করিয়া তুমি আজ ফুরাইয়া গেলে? কোনও দিন তুমি তো এই শীঘ্র যাও নাই। আজ মনিষাকে প্রকাশ করিয়া দিবার জন্যই কি তুমি তাড়াতাড়ি করিয়া গিয়া দিবাকে পাঠাইয়া দিতেছ? মানুষগুলোর অবর্ণনীয় যাতনা—ওগো অন্ধকারময়ী তামসী নিশা—তুমিও বুঝিতে পারিলেনা? চোখের জল মুছিতে মুছিতে মনিষা বাহির হইল। এখন সে সারাদিন লুকাইয়া থাকার মত নিভৃত স্থান পায় কোথায়?

ঘাটের ধারে বাঁধানো বকুলগাছের নিচে সে বসিয়া রহিল। সারাদিন তাহাকে এইখানে অবগুণ্ঠনের মধ্যে কাটাইতে হইবে—সন্ধ্যার আঁধার যখন নামিয়া আসিবে, সে গিয়া তাহার স্থানটীতে দাঁড়াইতে পারিবে।

কত মেয়ে কত ছেলে স্নান করিতে আসিল। গুণ্ঠনবৃতা নারীমূর্ত্তিকে দেখিয়া অনেকেই অনেক কথা বলিল। গ্রামে একটা সাড়া পড়িয়া গেল ছেলেধরা আসিয়াছে, সব ছেলে মেয়ে সাবধান।

মনিষার স্বামী স্নান করিতে আসিলেন, মনিষা ঘুরিয়া বসিল।

একটি ছোটমেয়ে সে এই আশ্চার্য্য ছেলেধরাকে ভাল করিয়া দেখার প্রলোভন এড়াইতে পারে নাই। সুধা মেয়ে হইলেও দুষ্টামীতে গ্রামের ছেলেদেরও শীর্ষস্থানীয় ছিল। তাহাকে যাহা বারণ করা হইত, সে তাহা করিবেই, প্রকাশ্যে না হোক, গোপনেও করা চাই।

দুপুর বেলা যখন গ্রামখানা নীরব হইয়া গিয়াছে, যাহারা গ্রীষ্মের জন্য অতিরিক্ত অতিভাবিকারা ছেলে মেয়েদের গৃহাবদ্ধ করিয়া নিদ্রাসুখ উপভোগ করিতেছেন সেই সময় সুধা এই আশ্চর্য্য ছেলেধরাকে দেখিবার জন্য ছুটিয়াছিল। ছেলেধরা তখন অবগুণ্ঠন খুলিয়া ফেলিয়া উদাস নেত্রে কোন দিকে চাহিয়া আছে, আর

তাহার চোখ বহিয়া ঝর ঝর ধারায় অশ্রু ঝরিতেছে। ছেলেরা আসার কাঁদে, সুধা বিস্ময় দমন করিতে পারিল না, একেবারে সামনে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল "ইঁ্যা গা, তুমি কাঁদছ কেন, তোমার কি হয়েছে?

তাহার কথায় চমকাইয়া উঠিয়া মনীষা চাহিয়া দেখিল ছোট একটি মেয়ে। চোখের জল মুছিয়া ফেলিয়া বলিল "তুমি কে গা?"

অচিরেই উত্তরের মধ্যে সৌহৃদ্য স্থাপিত হইয়া গেল। মনীষা জানিতে পারিল সে তাহারই আবাল্য সখী লীলার মেয়ে। এই মেয়েটিকে সে ছয় বছরেরটী দেখিয়া গিয়াছিল। ইহার মত সাহস করিয়া যদি তাহার রাখাল একটী বারের জন্যও তাহার কাছে আসিত?

সুধাকে সে কথায় কথায় রাখালের কথা জিজ্ঞাসা করিল। এমন ভাবে জিজ্ঞাসা করিল—যেন তাহার মনে একটুও সন্দেহ না হইতে পারে।

আচ্ছা মা, রাখালের মা রাখালকে বুঝি মারে? তোমার মা তোমাদের অমনি করে মারেন?

চোখ ঘুরাইয়া সুধা বলিল "দূর আমাদের মা মারবে কেন? রাখালের যে মা নেই, একে ওর বাবা দু'বছর হল বিয়ে করে এনেছে। রাখালের মা এই পুকুরে ডুবে মরে গেছে তা বুঝি জানোনা?

মনীষা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল "কেমন করে জানব মা, রাখাল বুঝি তার মার জন্য কাঁদে?"

সুধা বলিল "কাঁদে না আবার? যখনি তাকে তার মা কি বাপ মারে, সে তখন এইখানে এসে মা'গো মা'গো করে কাঁদে। আমরা কেউ তাকে টেনে নিয়ে যেতে পারি নে, সে বলে—আমার মা জল থেকে উঠে এসে আমায় নিয়ে যাবে।

ওঃ, এই ভাবই মনীষার বুকের মধ্যে দিন রাত বাজিয়া উঠিত যে। সে আনন্দ করিতে গিয়া কাঁদিয়া ফেলিত—কে যেন ডাকিত মাগো আর। সে যে সত্যই কাঁদে, সত্যই তার ছোট মনে জাগিয়া আছে তার মা আসিয়া তাহাকে লইয়া যাইবে। যাহারে—মানিক আমার।

মনীষার দুটি চোখ সজল হইয়া উঠিল। সে একটু পরে জিজ্ঞাসা করিল "তার বাপও তেমনি মারে?"

সুধা বলিল "খুব মারে, তার গা কেটে রক্ত বার হয়। এই মা এক একদিন খেতে দেয় না, আমরা তখন তাকে ডেকে নিয়ে গিয়ে খাওয়াই সে দিন তার বাপ গাঁদা কিনতে বলেছিল, সে একটা পয়সা তার থেকে নিয়ে বিস্কুট কিনে খেয়েছিল, এতে তার বাবা তাকে এমন লাথি মেরেছিল যে—ও কি, তুমি ও রকম করছ কেন?

মনীষার দুই চোখ ঠেলিয়া জল বাহির হইতেছিল, সে দুই হাতে বুকটাকে সজোরে চাপিয়া ধরিয়াছিল যেন একটা আর্ত্ত রব না বাহির হইতে পারে।

তখনি সামলাইয়া লইয়া সে মলিন হাসিয়া বলিল 'ও কিছু নয় মা, ওমনি মাঝে মাঝে আমার হয়, তখুনি সেরে যায়। তার পর কি হল রাখালের?"

সে কথা আর না বলিয়া সুধা বলিল "এমনি তো প্রায়ই হয়। আজ সে দুধ আনতে গিয়ে হঠাৎ ফেলে দেছে, তাই তাকে বন্ধ করে রেখেছে, সন্ধ্যাবেলা ছেড়ে দেবে, তখন খেতে দেবে। তার বাবা বলে—তুই মরে যা আপদ সব কলঙ্ক চুকে যাক। তা—সে মরেই যাবে বেশী দিন আর বাঁচবেনা। যে রকম চেহারা হয়েছে তার।'—

সে চলিয়া গেল, কিন্তু কথাটা তাহার রহিয়া গেল। সে মরেই যাবে, বেশী দিন বাঁচবে না, এই কথাটা ঘুরিয়া ফিরিয়া মনীষার বুকের মধ্যে বাজিতে লাগিল।

কাঁদিয়া উঠিয়া অভাগিনী দুইহাত জোড় করিয়া সূর্য্যের দিকে চাহিয়া মুক্ত কণ্ঠে বলিল "বলে দাও ভগবান, শুধু আমার গর্ভে জন্মেছে বলেই কি তাকে এই কঠোর শাস্তি বহন করিতে হচ্ছে, আমি একটা ভুলে যে মহাপাপ করেছি, তার শাস্তি তোমার রাজ্যের শ্রেষ্ঠজীব মানুষ হয়ে তারা ছোট একটা শিশুকে দিচ্ছে? শক্তি দাও প্রভু, পতিব্রতার বুকে যদি আলোর জ্যোতি দিয়েছ, সে আলো জ্বালিয়ে রাখবার শক্তি দাও। আমার তো একেবারে এখনও মৃত্যু হয়নি, আমার মধ্যে কিছু যে এখনও অবশিষ্ট রেখেছ। আমি তার মা—আমি যে এখনও বেঁচে আছি। ভগবান—আমায় শক্তি দাও, আমার আমার ছেলেকে বুকে টেনে নেবার সাহস দাও। আমায় একেবারেই বৃথা করেছ, তার

জীবনটা এমন করে ভিজে ঢিলে হয়ে করে প্রশ্রয় কোরো না। সে তো জানে না—সে জানে তার মা চিরবিশ্রাম লাভ করছে। তাকে তার মায়ের অস্তিত্ব জানাতে আমার সাহস হয় প্রভু।

(৮)

"এই ছোঁড়া—ওঠ, ভাত খা বলছি।"

উপুড় হইয়া দুই হাতে মাটী আঁকড়াইয়া ধরিয়া ক্ষুব্ধ রাখাল পড়িয়া রহিল। অভিমানে দুঃখে—সমস্ত দিনের অনাহার জনিত ক্লেশে সে উঠিল না।

সগর্জ্জনে নির্ম্মল বলিলেন "হবে থাক, আজ আর একেবারে খেতেই পাবি নে।"

রন্ধন গৃহের পানে চাহিয়া বলিলেন "ও ছোঁড়া আজ খাবে না গো, ভাত তুলে রাখ।"

তিনি তাঁহার সন্ধ্যা ভ্রমণে বাহির হইয়া গেলেন।

ধীরে ধীরে রাখাল উঠিল। ক্ষুধায় তাহার পেট জ্বলিতেছিল, দুঃখে হৃদয় জ্বলিতেছিল। পায় পায় সে সেই সন্ধ্যার আঁধারের বুক বাহিয়া অগ্রসর হইল পুষ্করিণীর দিকে। মনীষা ও নিঃশব্দে তাহার পিছনে পিছনে চলিল।

ঘাটের উপর গিয়া রাখাল আছড়াইয়া পড়িল—মাগো মা—"

ক্ষুব্ধ শিশুর কাতর রোদনে নিস্তব্ধ সন্ধ্যার বুক চিরিয়া রোদন বাহির হইয়া পড়িল, গাছের পাতায় পাতায় রোদনের সুর বহিয়া গেল, পুষ্করিণীর কালো জলের ছোট ঢেউয়ের বুকে বুকে রোদনে সুর করুণ হইয়া উঠিল, অদূরে দাঁড়াইয়া অভাগিনী মা মনীষাও হাহাকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

"বাবা আমার—কাঁদছিস কেন বাবা—"

এই স্নেহের পরশ পাইয়া রাখাল ধড়ফড় করিয়া উঠিল, কে এ? এই কি তার মা? এতকাল পরে, আজ কি তার রোদন মায়ের বুকে বাজিয়াছে, তাই কি মা জন্মান্তর ছাড়িয়া উঠিয়া আসিয়াছেন?

সেই ক্ষুব্ধ স্নেহখানা আবেগে বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া রুদ্ধ কণ্ঠে মা ডাকিল—রাখাল—বাবা—!"

রাখাল হঠাৎ উচ্ছ্বসিত হইয়া কাঁদিয়া উঠিল, তাহার আর সন্দেহ রহিল না এই তাহার মা। অনেক কালের অভিমান আজ তাহার মনে জাগিয়া উঠিল, সে মায়ের বুকের মধ্যে মুখ লুকাইয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

বড় দুঃখে ও বড় সুখে মনীষাও কাঁদিতেছিল। কেন বাবা? আমি তো এসেছি—আর কাঁদিস নে।"

রাখাল চোখ মুছিয়া বলিল, "আবার চলে যাবে তো?"

মনীষা বলিল, কোথা যাব বাবা?"

রাখাল বলিল "ওই জলের মধ্যে। কিন্তু এবার আমাকে নিয়ে যেতে হবে মা, আমি আর কখনো বাবার কাছে যাব না।"

আবার সে কাঁদিয়া উঠিল।

সেই অন্ধকারেই মনীষা গভীর আবেগে শিশুর মুখে একটা চুম্বন দিল, "না বাবা, তোমায় আমার সঙ্গে নিয়ে যাব। আর জলে যাব না বাবা, এবার দেবতাদের দেশ কাশীতে তোকে নিয়ে যাব। সেখানে পথে পথে ভিক্ষে করে তোকে মানুষ করব, আর নরকে যাব না।"

উৎসাহিত রাখাল বলিল, "চল মা, এখনি যাব। বাবা জানতে পারলে এর পরে আর যেতে দেবে না।"

মনীষা বলিল, "আমার কোলে উঠে চল বাবা, এই অন্ধকার রাত, ষ্টেশনে পর্য্যন্ত তুই হেঁটে যেতে পারবিনে। আজ সারা দিন কিছু খাস নি. ষ্টেশনে কিছু খাবার খেয়ে এই রাত্রেই আমরা রওনা হব।"

রাখাল মায়ের কোলে উঠিল। সেই গভীর অন্ধকারে পথ চিনিয়া মনীষা ষ্টেশনে চলিল।

পরদিন হইতে রাখালকে আর গ্রামে দেখা গেল না। সকলেই বলিল, সে ওই পুষ্করিণীতে ডুবিয়া মরিয়াছে। অনেকে সন্দেহ করিল ছেলেধরাকেও যখন দেখা যাইতেছে না তখন সেই লইয়া গিয়াছে।

নির্ম্মল কোনও উচ্চবাচ্য করিলেন না।" যার ফল পরে পরে—"এই নীতি কথাটির তিনি পক্ষপাতী ছিলেন, কাজেই ইহার উপর কথা বলা আর সাজে না।

চাট্‌নী

[শ্রী যতীশ মিত্র।]

পয়লা নম্বর।

অনুসন্ধিৎসু পুত্র।

পিতা। বিশু, বই নিয়ে এস তো বাবা!

বিশু। (বই লইয়া যাইয়া) এই যে এনেছি! আমি তোমার খুব কথা শুনি,—না বাবা?

পিতা। হুঁ।

পুত্র। বাবার কথা না শুনলে তাকে কি বলে বাবা?

পিতা। তাকে গাধা বলে।

পুত্র। তুমি আমাকে 'বাবা' বল কেন বাবা?

পিতা। (হাসিয়া) ছেলেকে 'বাবা' বলা হয়।

পুত্র। তবে তুমি আমার কথা শোন না কেন—আমাকে ঘোড়া কিনে দিলে না যে?

পিতা। 'না শুনি' 'না শুনি' করিয়া—গম্ভীর কণ্ঠে ছেলেকে বই লইয়া বসিতে বলিলেন। ছেলে সহসা পিতাকে গম্ভীর হইতে দেখিয়া—তাড়াতাড়ি বই খুলিয়া বসিল। 'শৃগাল ও ছাগ শিশুর' গল্প পড়া ছিল;—বাবার মনস্তুষ্টির জন্য—ছবির দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"বাবা এটাকে পাঠা' বলে কেন?"

পিতা। পাঠার বাচ্চা বলে—তাকে পাঠা বলে।

পুত্র। পড়া বলতে না পার্লে আমাকেও ত তুমি পাঠা বল!

পিতা। 'হারামজাদা' বলিয়া ছেলের গালে কসে এক চড় মারিলেন। অবশ্য ইচ্ছা হইলেও—ছেলে পিতার কাছে—'হারামজাদা' কথাটার অর্থ জিজ্ঞাসা করিতে সাহসী হইল না।

দুইএর নম্বর।

বিদেশী বর্জ্জন।

অসহযোগ আন্দোলনে দেশ ভরপুর। ভবেন্দ্র বাবু 'প্রিন্স মহারাজ কি জয়' করিতে যাইয়া ছয় মাসের জন্য কারাবাসের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ছাড়া পাইয়াই—সভা বীথিতে সভা করিয়া তুমুল হাত তালির মধ্যে স্তূপীকৃত বিলাতী কাপড়ে অগ্নি সংযোগ করিয়াছিলেন। দিন দুই অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া,—ছেঁড়া 'ব্যবহারের অযোগ্য' ইত্যাদি সমেত প্রায় ৫৩ খানা বিলাতী কাপড় পুড়িবার পর দেশে আর বিলাতী বস্ত্র না থাকা সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইয়া,—বাজারের অন্যান্য বিদেশী পণ্য বর্জ্জনের উদ্যোগ করা দরকার মনে করিতেছেন। সর্ব্ব প্রথমেই নজর পড়িয়াছে চুরুটের উপর। তাহার মতে এইটাই সব চেয়ে বেশী নির্ম্মম ভাবে দেশবাসীর মাথা চিবাইয়া খাইতেছে।

ভবেন্দ্র বাবু প্রতিজ্ঞা করিলেন,—প্রতিদিন অন্ততঃ ৫ প্যাকেট করিয়া বিদেশী চুরুট ভস্মীভূত করিবেন।

—'প্রিন্স মহারাজের জয়' করার আগে তাঁর এক প্যাকেটেই দিন চলিত।

তিনের নম্বর।

দেশ-হিতে স্বার্থত্যাগ।

বিরাট জন সভা। ঘন ঘন হাত তালি ও বিকট জয়-ধ্বনির ভিতরে বক্তার মঞ্চে দাঁড়াইয়া—প্রধান নেতা জনতাকে শুনাইয়া দিয়াছেন—'বড় বড় স্বার্থত্যাগ করিতে না পারিলে স্বরাজ আসিবে না।' পরবর্ত্তী বক্তা—জ্বালাময়ী ভাষায় তাহার প্রতিবাদ করিয়া বলিতেছেন,—

"আমরা যথেষ্ট ত্যাগ স্বীকার করিয়াছি। অধীনতা পাশে বদ্ধ হইবার আগে হইতেই—আমাদের স্বার্থত্যাগ আরম্ভ হইয়াছে। তখন হইতেই আমরা—সুখ, শান্তি,—স্বাবলম্বন, আধিক সাচ্ছন্দ্য, আত্মসম্মান-জ্ঞান—মানুষের যা কিছু বড় বড় কল্যাণ—সব অবলীলা ক্রমে বিনা বাক্যব্যয়ে ত্যাগ করিয়া আসিয়াছি। কই তা তে ত স্বরাজ আসিল না? না—তা আসিতে পারে না।

"আসুন আমরা সকলে বিদেশী কাপড় পরিতে বদ্ধপরিকর হই। বিলাতী কল ওয়ালারা আমাদের চাহিদা মিটাইয়া উঠিতে না পারিলে—তারাই লজ্জায় কল বন্ধ করিয়া দিবে। তখন আর বিদেশী কাপড় এদেশে আসিবে না।

"আসুন সকল গোলামীর পথ,—তাহা যতই হীন, যতই ঘৃণ্য হউক,—আমরা একচেটিয়া করিয়া লই। তাহাতে দেশের টাকা দেশেই থাকিয়া যাইবে। গোলামী করিয়া আমাদের দারিদ্র দূর হইতেছে দেখিলে—কর্ত্তারা আপনা হইতেই সে উপায়ের—সিংহদ্বার বন্ধ করিয়া দিবেন।" (হিয়ার—হিয়ার)

ব্যতিক্রম

[শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ]

সপ্তপঞ্চাশত্তম পরিচ্ছেদ

বিনয় চলিয়া যাইবার দুই দিন পরে হরসুন্দর লক্ষ্ণৌ হইতে একটা তার পাইলেন। বিনয় লিখিয়াছে যে সে ভাল আছে—কিন্তু তাহার চিত্ত অত্যন্ত অশান্ত বলিয়া সে কিছু দিন দেশে ফিরিবে না। সে একটা চাকরী লইয়া বিদেশেই থাকিবে, এবং মধ্যে মধ্যে সংবাদ দিবে কিন্তু শ্রীকৃষ্ণপুরের উৎপীড়নের আশঙ্কায় সে নিজের ঠিকানা পাঠাইবে না। সারদাকে শ্রীকৃষ্ণপুরে পাঠাইয়া দিয়া হরসুন্দর হরিহরপুরে চলিয়া আসিলেন। বিনয়ের মাতা কলিকাতার বাসা উঠাইতে দিলেন না।

এই ঘটনার একমাস পরে বিনয় আগ্রার নিকটে বিলুচপুরা ষ্টেশনে মথুরার গাড়ীতে উঠিতেছিল হঠাৎ সে দেখিতে পাইল যে তৃতীয় শ্রেণীর একটি কামরায় ইন্দু বসিয়া আছে। দেখিয়াই সে কুলীদের জিনিস পত্র উঠাইতে নিষেধ করিল এবং ঘোড়ার গাড়ী করিয়া আগ্রা ফোর্ট ষ্টেশনে চলিয়া গেল। যথা সময়েই সে ছোট গাড়ীতে করিয়া মথুরা জংসন ষ্টেশনে নামিল। নামিয়া সে দেখিতে পাইল যে ইন্দুর হাত ধরিয়া নৃত্য ঠাকুরাণী দাঁড়াইয়া আছে, ঠান্‌দিদিকে দেখিয়া সে প্রথমে বিস্মিত হইয়াছিল কিন্তু পরেই বুঝিতে পারিল যে বিলুচপুরা ষ্টেশনে সে কেবল ইন্দুকেই দেখিতে পাইয়াছিল।

নৃত্যঠাকুরাণী জিজ্ঞাসা করিল, "বিনু, তুই এখানে কেন ভাই?" বিনয় মুখ ফিরাইয়া বলিল, "আমি তোমাদের সন্ধানে আসি নি ঠান্‌দি', মনিবের কাজে এসেছি। আমি এখন এক করলা ওয়ালার চাকর,—তার হুকুম মত করলা ঠেকে বেড়াই।" বিস্ময়ের অপ্রতিভ না হইয়া নৃত্য ঠাকুরাণী বলিলেন, "বিনু, আমাদের একখানা গাড়ী ঠিক করে দেনা ভাই? এখান থেকে মথুরা সহর অনেকটা দূর, গাড়ী ঘোড়াও বেশী পাওয়া যায় না।" বিনয় আর কোন কথা না কহিয়া গাড়ী ঠিক করিতে গেল, এবং যথা সময়ে গাড়ী আনিয়া ঠান্‌দিদিকে ও ইন্দুকে উঠাইয়া দিল। বিনয় উঠিল না দেখিয়া নৃত্যঠাকুরাণী জিজ্ঞাসা করিল "তুই উঠ্‌লি না?" বিনয় বলিল, "আমার জিনিষ পত্র অন্য গাড়ীতে তুলে দিয়েছি।" "তুই কিন্তু আমাদের সঙ্গে আয়, এখানটায় বেশী গোল। গোরাদের বারিকটা পার হ'য়ে গিয়ে তারপর তুই যেখানে ইচ্ছা হয় যাস্।" বিনয় বলিল, "বেশ ত, আপনার এ গাড়ীতে চলুন, আমি অন্য গাড়ীতে আপনাদের পিছন পিছন যাচ্ছি।"

গাড়ীর দরওয়াজা বন্ধ করিয়া বিনয় গাড়োয়ানকে চালাইতে বলিল, এবং নিজে অন্য গাড়ীতে উঠিয়া দুই গাড়ী এক সঙ্গে চালাইতে বলিল। ক্যান্টনমেণ্ট গোরা বারিক্ ছাড়াইয়া গাড়ী মথুরা সহরের মধ্যে প্রবেশ করিল, তখন বিনয় গাড়ী থামাইয়া ঠান্‌দিদিকে জিজ্ঞাসা করিল, "ঠান্‌দি', এইবার তো সহরে এসে পৌঁছেচেন, এখন আমি যাই?" ঠান্‌দিদি বলিলেন, "আর একটু সঙ্গে আয় ভাই, আমাদের বাসাটা ঠিক করে দিয়ে যা।" বিনয় এবং ইন্দু দুই জনেই বুঝিল যে মথুরায় যাহাতে তাহাদের পরস্পরের সাক্ষাৎ হয় তাহার সুবিধার জন্য ঠান্‌দিদি বিনয়কে বাসাটা চিনাইয়া রাখিতেছেন। সুতরাং দুই জনেই অত্যন্ত চটিল। যমুনার তীরে গাড়ী রাখিয়া বিনয় একটা বাসা ভাড়া করিয়া দিল এবং সে বাসায় নিজে প্রবেশ না করিয়া চলিয়া আসিল।

সেই দিন সন্ধ্যাবেলায় ইন্দু বলিল, "ঠানদি' এই বার চলুন বাড়ী যাই।" নৃত্যঠাকুরাণী হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই যে সকাল বেলায় বল্‌ছিলি পুষ্কর যাব, উজ্জয়িনী যাব, দ্বারকা যাব। এর মধ্যে আবার বাড়ী ফিরবার সাধ হোল কেন দিদি?" ইন্দু মাটির দিকে চাহিয়া বলিল, "কখনও তো বাড়ী ছেড়ে আসিনি দিদি, এইবার মার জন্য মন কেমন কচ্ছে।"

নৃত্যঠাকুরাণী বুঝিল যে ইন্দু তাহাকে সন্দেহ করিতে আরম্ভ করিয়াছে বিনয়কে দেখিয়াই তাহার মনে হইয়াছে যে তাহারই কথা মত বিনয় মথুরায় আসিয়াছে। তিনি মুখখানা ভার করিয়া বলিলেন, "এই ক'দিন বেরিয়েছি

দিদি? এর মধ্যেই দেশে ফিরে যাব? তোর যখন মন কেমন করছে তখন আর কি বলব? চল দেশেই যাই।"

অন্ত অন্ত রাত্রিতে ইন্দু অনেক ক্ষণ ধরিয়া ঠানদিদির সহিত গল্প করিত কিন্তু সে দিন সে বিছানার এক পার্শ্বে পড়িয়া রহিল। সকাল বেলায় উঠিয়া কোন মতে বৃন্দাবন দর্শন সারিয়া সন্ধ্যার গাড়ীতে বৃত্যঠাকুরাণী ইন্দুকে লইয়া দেশে ফিরিলেন। আর দিনের কোনও মতে বেলা দশটার মধ্যে নিজের কাজ সারিয়া আগ্রায় ফিরিয়া গেল। সেই দিন সন্ধ্যা বেলা আগ্রায় পৌঁছিয়া বিনয় একখানা তার পাইল, তাহাতে লেখা ছিল, "তোমার মা আসিয়াছেন, ফিরিয়া এস।'

তার পাইয়া বিনয় তখনই লক্ষ্ণৌ চলিয়া গেল।

অষ্টপঞ্চাশত্তম পরিচ্ছেদ

বৃত্যঠাকুরাণীর সহিত ইন্দু কলিকাতা ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলে গৌরমোহন স্থির থাকিতে পারিলেন না, তিনি পুত্র, পুত্র বধূ ও পত্নী লইয়া কলিকাতা ফিরিলেন। হরসুন্দর বিনয়ের মাতাকে লইয়া হরিহরপুরে ফিরিয়া গেলেন বটে কিন্তু দেশে ফিরিয়াই পত্নীর একটা পরিবর্ত্তন দেখিতে পাইলেন। প্রথমে অন্যমনস্ক থাকিয়া দুই চারি দিন পরে বিনয়ের মাতা শয্যা গ্রহণ করিলেন। ক্রমে জ্বর দেখা দিল, গ্রামের ডাক্তার আসিয়া প্রচুর পরিমাণে, কুইনাইন সেবন করাইয়াও কোন উপকার দেখাইতে পারিল না। বিনয়ের মাতা ক্রমশঃ অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িলেন, মহকুমা হইতে ডাক্তার আসিল কিন্তু রোগের উপশম হইল না। হরসুন্দর ক্রমে ঘাম, পাশা ও বিষয় কর্ম্ম পরিত্যাগ করিলেন। পরে গ্রামের পাঁচ জনের পরামর্শ অনুসারে রোগিনীকে কলিকাতা লইয়া যাওয়াই স্থির হইল।

হরসুন্দর সদানন্দ চক্রবর্ত্তীকে সঙ্গে লইয়া বিনয়ের মাতাকে কলিকাতায় আনিলেন। বাসা খালি পড়িয়াছিল সুতরাং থাকিবার কোনই অসুবিধা হইল না, সাদা সাহেব এবং কালা সাহেব উভয় প্রকার ডাক্তার আসিয়াই বলিয়া গেল, যে রোগ দুশ্চিকিৎস্য কারণ তাহা স্থির হইতেছে না সুতরাং রোগিনীকে বায়ু-পরিবর্ত্তনে লইয়া যাওয়াই উচিত।

এক দিন সন্ধ্যাবেলায় বৃদ্ধ সদানন্দ চক্রবর্ত্তী ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, "হরু, বেয়াই বাড়ী গিয়েছিলাম।" হরসুন্দর বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বল কি দাদা? গ্রামের লোকে শুনলে কি বোলবে?" বৃদ্ধ কিছু মাত্র চিন্তা না করিয়া বলিলেন, "কি আর বলবে? বড় জোর এক ঘরে করবে। তা হরু, যাদের নিয়ে ঘর তারা সকলেই নিজের ঘরে চলে গিয়েছে। আমার আর ঘরে আছে কে? নেড়ীকে অনেক দিন দেখিনি তাই একবার দেখতে গিয়েছিলাম।" "দেখা হোল তো?" "হোল আর কই। বেয়াই ঘনাই সপরিবারে পশ্চিমে গিয়েছেন। হরু বৌমার কি হয়েছে আমি বুঝতে পেরেছি। চল্ আমরা তাকে নিয়ে লক্ষ্ণৌ যাই।" "লক্ষ্ণৌ যাব কি দাদা?" "লক্ষ্ণৌ না গেলে বৌমার ব্যায়রাম সারবে না। এত দিন আমি বুঝিতে পারিনে কিন্তু এই বারে আমার চোখ খুলে গিয়েছে। লক্ষ্ণৌ যাওয়া মানে বিনুর কাছে যাওয়া, সে যেখানে থাক তার কাছে গেলেই বিনুর মার ব্যায়রাম সেরে যাবে।"

তখন হঠাৎ আর্দ্ধান্ধ হরসুন্দরের চক্ষু খুলিয়া গেল। দুনিয়ায় যে চক্ষু ফুটাইয়া দেয় দীর্ঘকাল পরে যে কুসংস্কারাপন্ন কৌলীন্যাভিমানী সদানন্দের চক্ষু ফুটাইয়া দিয়াছিল সেই হরসুন্দরের চক্ষু ফুটাইয়া দিল। দিব্য দৃষ্টি লাভ করিয়া হরসুন্দর নিজের আচরণের নিষ্ঠুরতা বুঝিতে পারিলেন, অনুতাপে তাহার মন ভরিয়া গেল, চোখের জলে বুক ভাসিয়া গেল। তাহা দেখিয়া সদানন্দ চক্রবর্ত্তী বলিয়া উঠিলেন, "তুই ও বুঝেছিস্ দেখছি। হরু, ভুল, সমস্তই ভুল। মান, সম্ভ্রম, অহঙ্কার, অভিমান, সমাজ, সংসার—সমস্তটাই একটা মস্ত ভুল। মানুষ নিয়ে সংসার, সে মানুষ সংসারটাকে যে ভাবে দেখে তার সংসার সেই ভাবের। তুই বৌ-মাকে বলে আয় এখনও রাত্রি হয় নি। সাড়ে ন'টার সময় একখানা গাড়ী আছে, চল্ তাতেই চলে যাই।"

হরসুন্দর উপরে গিয়ে লক্ষ্ণৌ যাত্রার কথা বলিতেই বিনয়ের মাতা যে ভাবে উঠিয়া বসিলেন তাহাতে হরসুন্দর বুঝিলেন যে সদানন্দের কথা সত্য। তখনই গাড়ী ডাকাইয়া বাসার চাকর দাসী ও পাচক ব্রাহ্মণ লইয়া

সকলে লক্ষ্ণৌ যাত্রা করিলেন। ন'টা পঁয়ত্রিশ মিনিটে বোম্বাই মেল ছাড়িবে, হরসুন্দর তিনখানি দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকিট কিনিয়া পত্নীকে আশ্চর্য্যান্বিত করিয়া তুলিলেন।

পরদিন লক্ষ্ণৌ পৌঁছিয়া তাঁহারা এক বাঙ্গালীর গৃহে আশ্রয় পাইলেন। দুই দিন পরে বিনয়ের সন্ধান মিলিল। তাহারা মাতার অবস্থা দেখিয়া তাহার বন্ধুরা বিনয়ের নিষেধ সত্ত্বেও আগ্রার বিনয়কে তার করিল। বিনয় ফিরিয়া আসিতেই বিনয়ের মাতার জ্বর ত্যাগ হইল। হরসুন্দর যখন হুকা হাতে করিয়া সংবাদটা সদানন্দ চক্রবর্ত্তীকে দিতে আসিলেন তখন বৃদ্ধের নয়নদ্বয় জলে ভরিয়া আসিল, তিনি আবেগ ভরে হরসুন্দরের হাতের হুকাটা টানিয়া ফেলিয়া দিয়া বলিয়া উঠিলেন, "দেখেছিস্ হরু? বুঝেছিস্ এই বারে? বুঝেছিস্ তো? এখনও ভুল চাল গুলো ফিরিয়ে নে। এই সংসারের বাবার মাৎ হতে বসেছিলি। এই বার ডুবা ফিরিয়ে নেলি এখন যাতে দাঁড়াতে পারিস্ সেই চেষ্টা কর্।" হরসুন্দরের কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল, তিনি সদানন্দ চক্রবর্ত্তীকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিয়া উঠিলেন, "যা হয়ে গিয়েছে তা হয়ে গিয়েছে দাদা আর চালে ভুল হবে না।"

বিনয়ের মাতা ক্রমে সারিয়া উঠিলেন, বিদেশে পিতা মাতার আদর ও যত্ন পাইয়া বিনয়ের শুষ্ক মুখ প্রফুল্ল হইয়া উঠিল কিন্তু তখনও তবে কেহই দেশে ফিরিবার প্রস্তাব মুখে আনিতে পারিলেন না। তখন সদানন্দের সহিত পরামর্শ করিয়া হরসুন্দর একা দেশে ফিরিলেন। বিনয়ের মাতা স্পষ্ট বলিয়া দিলেন যে একমাত্র পুত্রকে বিদেশে রাখিয়া তিনি হরিহরপুরে ফিরিতে প্রস্তুত নহেন।

কলিকাতায় ফিরিয়া হরসুন্দর বিষম বিপদে পড়িলেন কারণ তিনি বাসায় উঠিয়া দেখিলেন যে স্বয়ং ভবসুন্দরী, অরদা, সারদা ও পরেশ চন্দ্রকে লইয়া বিনয়ের শূন্য বাসা ভরাইয়া ফেলিয়াছেন। কোন মতে বাসায় এক বেলা কাটাইয়া তিনি যখন গৌরমোহনের গৃহে উপস্থিত হইলেন তখন গৃহস্বামী দেশে ফিরিয়া আসেন নাই।

হরসুন্দর দুয়ারে বসিয়া চিন্তা করিতেছেন এমন সময়ে এক খানি ভাড়াটিয়া গাড়ী আসিয়া দুয়ারে লাগিল, নৃত্য-ঠাকুরাণী ইন্দুর হাত ধরিয়া নামিয়া হরসুন্দরকে দেখিয়াই বলিয়া উঠিলেন, "একে হরু যে? এখানে বসে আছিস্ কেন ভাই।" হরসুন্দর উঠিয়া সজল নয়নে নৃত্য-ঠাকুরাণীর পায়ের ধূলা মাথায় লইয়া বলিলেন, "নিজের পাপের প্রায়শ্চিত্ত কর্তে এসেছি দিদি।" এই সময় ইন্দু আসিয়া হরসুন্দরকে প্রণাম করিল এবং নৃত্য-ঠাকুরাণী বলিয়া উঠিলেন, "বাড়ীটা খালি খালি দেখছি যে?" হরসুন্দর বলিলেন, গৌরমোহন বাবু এখনও দেশে ফেরেন নি।" ঠান্-দিদি বলিয়া উঠিলেন, "কি সর্ব্বনাশ। তবে আমি ইন্দুকে নিয়ে যাই কোথায় হরু?" হরসুন্দর হাসিয়া বলিলেন, "মেয়ে আমার মেয়ে ঠানদি' ও আর গৌর-মোহনের মেয়ে নেই। চল্ মা, তুই আমার ঘরে বাস্‌নি ব'লে আমার লক্ষ্মী ছাড়তে বসেছিল।" বৃদ্ধ হরসুন্দর যখন সজল নয়নে ইন্দুর শীর্ণ ক্লিষ্ট হাত দুই খানি চাপিয়া ধরিলেন তখন ইন্দু আর আত্মস্থ করিতে পারিল না। বৃদ্ধা বাবু আসিয়া তাহাদের বিছিমণিকে ধরিয়া লইয়া যাইতেছে দেখিয়া গৌরমোহনের বৃদ্ধ খানসামা আপত্তি করিতেছিল কিন্তু সে নৃত্য-ঠাকুরাণীর ভ্রূকুটি দেখিয়া নিরস্ত হইল।

যে গাড়ীতে ইন্দু আসিয়াছিল সেই গাড়ীতেই তাহাকে উঠাইয়া হরসুন্দর তাহাদিগকে নিজের বাসায় লইয়া গেলেন। তখন একটা নূতন বিপ্লব আরম্ভ হইল।

পুস্তক আলোচনা

'অরবিন্দ প্রসঙ্গ' লেখক শ্রীনীলেন্দ্র কুমার রায়, প্রকাশক প্রবর্ত্তক পাবলিশিং হাউস, চন্দন নগর, মূল্য দশ আনা। বাংলার অন্যতম বরেণ্য সন্তান অরবিন্দের বরোদা রাজ্যের কর্ম্মজীবন ও তাঁহার প্রথম বাংলা ভাষা শিক্ষার কাহিনী এই প্রসঙ্গ পুস্তকখানিতে বর্ণিত হইয়াছে। এ প্রসঙ্গের লেখক অরবিন্দের বাংলা ভাষার শিক্ষক শ্রীনীলেন্দ্র কুমার রায়। অরবিন্দের মত এতবড় লোকের মাতৃভাষা শিক্ষার কাহিনী ও তাঁহার প্রথম কর্ম্মজীবনের পরিচয় উপন্যাসের ন্যায় মনোরম হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। প্রকৃত অরবিন্দকে চিনিবার সুযোগও এই গ্রন্থের নিপুণ শিল্পী দু'একটি রেখাপাতে সুন্দররূপে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। ভারতের বিপ্লব, রাজনৈতিক অবস্থা, দেশের মতি গতিও যথা সম্ভব ফুটিয়া উঠিয়াছে। এক যুগ পূর্ব্বে 'সাহিত্যে' এই অরবিন্দ প্রসঙ্গ আমরা সাগ্রহে পড়িয়াছিলাম—ও বড় শীঘ্র শেষ হইল বলিয়া আপ্‌সোষ করিয়াছিলাম, আজ সেই মাসিকপত্রের পৃষ্ঠার বিক্ষিপ্ত রচনাকে সাহিত্যে স্থায়ী আসন দিয়া প্রকাশক ধন্যবাদ ভাজন হইয়াছেন। প্রসঙ্গের লেখা যেমন সুন্দর, ছাপা, কাগজ, প্রচ্ছদপটও তেমনি উজ্জ্বল, মনোরম। আশা করি অরবিন্দ প্রসঙ্গের বহুল প্রচার হইবে।

——

'নলিনী মঙ্গল' বঙ্গসাহিত্যের ও সাহিত্য সেবীর একনিষ্ঠ সেবক শ্রীনলিনী রঞ্জন পণ্ডিতের মেদিনীপুর সাহিত্য সম্মিলন হইতে সম্বর্দ্ধনা উপলক্ষে বন্ধুগণের শ্রদ্ধা অভিনন্দন। বাংলার বহু সাহিত্যিক এই উপলক্ষে পণ্ডিত নলিনী রঞ্জনকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়াছেন, এই 'নলিনী মঙ্গলে' তাহাই সন্নিবেশিত হইয়াছে। নলিনী রঞ্জন কর্ম্মী পুরুষ, কর্ম্মের আনন্দেই তিনি কর্ম্ম করিয়া যান, এমন কর্ম্মের ত্যাগ ও আনন্দের মধ্য দিয়াই দেশের অনেক বড় প্রতিষ্ঠান গড়িয়া ওঠে। নলিনীর পেছনে তাঁহার কর্ম্মের আনন্দ সাহিত্য পরিষৎ—সম্মুখে বাংলার উজ্জ্বল সাহিত্য সম্পদ। আশুতোষ কর্ম্মীর প্রয়োজন দেশের সব ক্ষেত্রেই রহিয়াছে—আশুতোষ নলিনী রঞ্জনকে আমরাও অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি।

——

'টাকার শতনাম'—বিদূষকের স্যাতিমার শ্রীশরৎ পণ্ডিত বিরচিত—দক্ষিণা মাত্র ৵০—হরিনাম কৃষ্ণনামের চেয়েও এখন টাকা নাম সুমধুর, তাই কলির সন্ধ্যায় এই টাকার শতনাম রচিত হইয়াছে। এই চারি পয়সা মূল্যের ছোট্ট বহিখানি হাতে পাইলে ঠিক চক্রাকার একটি উজ্জ্বল মুদ্রা পাইবার আনন্দ প্রথমে না হইলেও বহিখানি পাঠের পর তার চেয়ে বেশী আনন্দই হইবে। শ্রীকৃষ্ণের শতনাম এখন দেশের লোকে ভুলিতেছে তাই 'টাকার শতনাম' দেশে অগুপতি চলিবে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। শতনামে রস রসিকতা, বিদ্রূপ ফুটিয়াছে চমৎকার।

——

"হাসি" ও "লক্ষ্মী" শ্রীশৈলজা মুখোপাধ্যায় প্রণীত দু'খানি উপন্যাস। শৈলজা বাবুর লেখার পরিচয় বাঙ্গালী পাঠক পাঠিকারা নানা পত্রে অনেকদিন হইতেই পাইতেছেন। উপন্যাস হিসাবে এই হাসি ও লক্ষ্মী বহি দু'খানিই শৈলজা বাবুর প্রথম লেখা। হাসি ও লক্ষ্মীর লেখা বেশ ঝর ঝরে করুণ—প্লটও ঘোরালো। বহি দু'খানির বাঁধা ও ছাপা সুন্দর, প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য। দাম হাসি ১৲ লক্ষ্মী ১৲।

——

ভুলভাঙ্গা—শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু প্রণীত উপন্যাস—সিল্কে বাঁধা, দাম ২৲ কলিকাতার প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য। এই নবীন লেখক স্বর্গীয় নাট্যকার অমরেন্দ্রনাথ বসুর এক মাত্র পুত্র। পুত্র পিতার সাহিত্য প্রতিভার অধিকারী হউন ইহাই কামনা করি। প্রথম উদ্যম হইলেও বহিখানিতে হাসি ও করুণ রস পাশা-পাশি বেশ ফুটিয়াছে।

——

অভিনয় ও অভিব্যক্তি

[শ্রীকিরণ চন্দ্র দাস বি, এ]

একটি গানের সুর, সঙ্গীত শিক্ষক যেমনটি বলিয়া দিবেন, ঠিক তেমনটি অনুকরণ করিতে পারিলেই যেমন গান শিক্ষা করা চলে, ভাব প্রকাশ বা ভাবের অভিব্যক্তি শিক্ষা ঠিক্ সেই ভাবে আয়ত্ত করা যায় না। আচার্য্য বা শিক্ষক একটি বিশেষ ভাবকে প্রকাশ করিবার যে ভঙ্গীটি দেখাইয়া দিবেন, ঠিক সেই ভঙ্গীতে উক্ত ভাবটি প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিলে তাহা অধিকাংশ স্থলেই accurate হয় না ইহার কারণ এই যে, একটা ভাবকে সকলে এক রকমে প্রকাশ করে না বা করিতে পারে না। ভাবের অভিব্যক্তি ব্যাপারটা অনেকাংশে muscle-control এর উপর নির্ভর করিয়া থাকে, মুখের ভঙ্গীতে (Facial expression) ভাবপ্রকাশের বেলায়, এই পেশী নিয়ন্ত্রণ পটুতার প্রয়োজনীয়তা আরও বেশী। যেজন্য যত মাংসপেশী চালনা বিষয়ে যিনি যত পারদর্শী হইবেন ভাবের অভিব্যক্তি বিষয়ে তিনি তত নিপুণ হইতে পারিবেন বলিয়া আশা করা যাইতে পারে, তা বলিয়া সুদক্ষ অভিনেতা হওয়ার আনুসঙ্গিক অন্যান্য গুণ গুলিও আয়ত্ত করা একান্ত দরকার; muscle-control করিতে পারিলেই যে উত্তম অভিনেতা হওয়া যায় তাহা নহে।

ভাষা এবং ভাব (feeling) এই দুইটি জিনিষ অভিনেতাকে পূর্ব্বাহ্নেই আয়ত্ত করিয়া রাখিয়া তবে ভাব প্রকাশে অগ্রসর হইতে হইবে। মাংসপেশীর আনুকূল্য প্রসারণ দ্বারা যে সমস্ত ভাব প্রকাশ করা হইবে, তাহাদের মূলে অবস্থান করিতেছে ঐ ভাব বা feeling। আমরা যখন যে ভাবে অনুপ্রাণিত হই, তখনই সেই ভাবের প্রকাশ মূলক একটা ক্রিয়া আমাদের শরীরে ফুটিয়া উঠে। ইহার অন্যথা কখনও হইতে পারে না। একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি। মনে করুন কোনও একটি যুবকের বিবাহ-সম্বন্ধ স্থিরীকৃত হইয়াছে—এবং সে খবরটা তাহার বন্ধু মহলেও আসিয়া পৌঁছিয়াছে। বন্ধুরা সকলে মিলিয়া তাহাকে ঠাট্টা, বিদ্রূপে মহা ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে। এখন যুবকটি মনে মনে ভাবিতেছে যে "আমি যদি এখন একটু গম্ভীর না হইতে পারি, তাহা হইলে আর আমার উপায় নাই, বাকাবাণে এরা আমাকে পাগল করিয়া দিবে।" এই ভাবিয়া সে খুব গম্ভীর হইয়া বন্ধুদের ভিতরে অবস্থান করিতে লাগিল। ভিতরে ভিতরে কিন্তু সে তাহার ভাবী প্রণয়িনীর ভাবে পুলকে বিভোর হইয়া আছে। এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে—ভিতরে উল্লাসের ভাব নিয়া বাহিরে গাম্ভীর্য্য প্রকাশ কিরূপে সম্ভব? ইহার উত্তর এই যে যুবকটি যখন বাহিরে গাম্ভীর্য্যের ভাব দেখাইতেছে, তখন সে জোর করিয়া সেই গাম্ভীর্য্যের ভাবটিকেই ভিতরে রক্ষা করিতেছে। আবার লক্ষ্য করিলে ইহাও বেশ বুঝিতে পারা যাইবে যে নানা কাজের ভিতরে যে মুহূর্ত্তেই সে ভুলিয়া যাইবে যে তাহাকে গম্ভীর থাকিতে হইবে, ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই তাহার চোখে মুখে একটা পুলকের ভাব ফুটিয়া উঠিবে। এই ভাব বা feeling কে বাদ দিয়া যিনিই অন্য এক মনের প্রদর্শিত ভঙ্গীকে নকল করিতে যাইবেন, তিনিই ভুল করিবেন। অন্ততঃ মুখের নকল করিতে পারিলেও উহা যে প্রাণস্পর্শী হইবে না তাহা স্থির নিশ্চয়। আবার এমন অনেক Expression আছে যাহাদের ভাবটা না ধরিতে পারিলে মোটে নকলই করিতে পারা যায় না। মনে করুন পূর্ব্বোক্ত যুবকটির বিবাহ হইয়া গিয়াছে;—সে এখন কলেজে অধ্যয়ন করিতেছে। যুবকটি একদিন তাহাদের Common roomএ বসিয়া খবরের কাগজ পাঠ করিতেছে। যুবক একদৃষ্টে কাগজের দিকে চেয়ে আছে বটে, কিন্তু মনে মনে সে তার নবপরিণীতার কথাই নানাভাবে ভাবিতেছে। এই অবস্থায় মনোভাবের অবস্থাটা যেরূপ ভাবে বাহিরে প্রকাশমান হইবে, তাহা যদি কেহ প্রাণে প্রাণে অনুভব না করিতে পারেন, তবে অপরে তাহা দেখাইয়া দিলেও ধরিতে পারা যাইবে না।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে আচার্য্য বা বিশেষজ্ঞের নিকট হইতে আমরা কি কি প্রত্যাশা করিতে পারি? ইহার উত্তরে আমি এই বলিতে চাই যে প্রধানতঃ তিনটী জিনিষ আচার্য্যের নিকট হইতে আমাদের গ্রহণ করিতে হইবে—ভাষা ভাব ও ভঙ্গী। অবশ্য যিনি শিক্ষার্থী তার নিজেরও সুযোগমত (observation) দ্বারা জ্ঞান থাকা নিতান্ত দরকার; অন্যথা আচার্য্য বলিয়া বা দেখাইয়া দিলেও শিক্ষার্থীর পক্ষে তাহা গ্রহণ করিতে একটু বিলম্ব হওয়ার সম্ভাবনা। আচার্য্য ব্যতীরেকেও, obsevation দ্বারা কতকাংশে কৃতকার্য্য হওয়া যায়।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

প্রবাসী, ফাল্গুন ১৩০০।—প্রবাসীর সম্পাদক ফাল্গুন মাসের কাজ-খানি ছাপা হয়ে গেলে হঠাৎ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "যৌবন বেদনা-রসে উছল আমার দিবসগুলি" বাক্য নিয়ে একটী কবিতা ছাপিয়েছেন। কবিতাটি হঠাৎ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চুরিয়া পুষ্টাক্ত। পঁচিশ বৎসর আগে আমাদের দেশে একজন বাঙ্গালী কবি ছিলেন, তিনি উপস্থিত গা ঢাকা হয়ে আছেন, হঠাৎ রবীন্দ্রনাথ সেই বাঙ্গালী কবির 'উর্বশী' কবিতা থেকে চুরি ক'রে এই কবিতাটি লিখেছেন। প্রথমে,—

"বহু যাত্রা, বহু কথা, বহু বধূ, সুদূরী রমণী,
হে মানস বাসিনী উর্বশী।"

এর সঙ্গে নূতন বিলাতী কবি হঠাৎ রবীন্দ্রনাথের কবিতার তুলনা করলেই স্পষ্ট বুঝতে পারা যায় যে নূতন কবিতাটি হাঁকা চুরি।

"যৌবন-বেদনা-রসে উছল আমার দিন গুলি,
হে কালের অধীশ্বর, অন্তরবে প্রিয়ের কি খুলি,
হে ভোলা সন্ন্যাসী?"

তোড়াতেই প্রবাসীর সম্পাদক এলাহাবাদে উত্তর ভারতীয় বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশনে যে অভিভাষণটি পড়বেন বলে করেছিলেন সেটি ছাপা হয়েছে। এতে অনেক বাহাদুরী কথা আছে। তবে দু'একটি ভুলও আছে। যেমন তাঁর যে এককালে সমস্ত ভারত ঘোরা ছিল সে কথাটি এখনও আমরা জানি না, তবিষ্যৎ জাতির ইতিহাস এখনও লেখা হয় নাই। শিল্প ও সাহিত্যে ত্রিবিক্রমের স্থান আর্যভট্টের অনেক উপরে।

"মেবারের" রচয়িতা একজন উপন্যাস। শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের "বাহে নবম" অনুবাদ তাও বিলাত ফেরিওয়ালার ভোজে। শ্রীবিদ্যাবিনোদ বিলাত ফেরাণীর বৌদ্ধ যুগের সাজা অতি বাজে, এই সমস্ত 'সাজা' যে এককালে ইউরোপের সমস্ত সভ্যদেশেই ছিল তা বোধহয় লেখক জানেন না। শ্রীবিমলা দেন লাহার "যৌবনিকের প্রেত তত্ত্ব" ছাপা বইয়ের সমালোচনে চর্চিত হওয়া, এই জাতীয় লেখা কোন বাঙ্গালা কাগজে ছাপা উচিত নয়। লেখকটির ভাষা অত্যন্ত জটিল বিষয় বোঝাবার ক্ষমতা পর্যন্ত তাহার নাই অথচ এই প্রেত তত্ত্বের প্রবন্ধের ঠেলাটে বাঙ্গালা মাসিক সাহিত্য ভয়ে অস্থির হয়ে পড়েছে। দাদা: যশাইকে ঢোলা ছেড়ে তাড়ন করা। শ্রীবিভূতি ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের "মেঘ মল্লার" গল্পটি প্রকাশ ভারতের ভাষা ঠাকুর বাড়ীর হুজুগের বেলেও একেবারে যুক্তিযুক্ত নয়। অধ্যাপক শ্রীবিনয় কুমার সরকার "স্বাধীন শ্রেম" সম্বন্ধে দু'পাতায় রাষ্ট্রনীতির জ্ঞান ছড়িয়েছেন। শ্রীপাঁচী মোহন সেন গুপ্তের "ইকেকেরী" কবিতাটি ভাষা ও ছন্দের দোষে কবিতাই হয়নি। শ্রীযতীন্দ্র চন্দ্র সেনের "বাঙ্গলা ছন্দ ও সঙ্গীত" সকলের বোঝবার মত নয়। শ্রীরাধালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের "অবেস ও ভূমর বর্মন" দুষ্পাচ্য প্রত্নতত্ত্বের প্রবন্ধ। ৬১০ পৃষ্ঠায় একটি ও ৬৭৮ পৃষ্ঠায় দুটি পাদ পূরণের কবিতা ছাপা হয়েছে তিনটিই ছাপার অযোগ্য। ৬৬৪ পৃষ্ঠায় "বিদ্রোহী কবি মধুসূদন" নামক শ্রীপাঁচী মোহন সেনের কবিতাটি আগের কবিতাটির চাইতে ভাল। শ্রীজ্ঞান চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের "স্ত্রীশিক্ষা" প্রবন্ধটি বিরাট ঘোট তবে কথাগুলি বিচার সহ। শ্রীপুলিনবিহারী দাসের "লাইব্রেরী ও অসি শিক্ষা" ক্রমশঃ প্রকাশ্য। শ্রীজলধর চট্টোপাধ্যায়ের "ব্যবসায়ের লাভ ও সামাজিক লাভ" প্রবন্ধটী মন্দ নয় তবে লেখকের বাঙ্গালা ভাষার উপর যখন যেই সেই জন্য ওঁর লেখা বোঝা শক্ত। শ্রীউপেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের "রাজ পথ" ক্রমশঃ প্রকাশ্য উপন্যাস এবং পাদ পূরণের কবিতার মধ্যে ৬০২ পৃষ্ঠায় শ্রীবিভূতি ভূষণ মুখোপাধ্যায়ের "স্বরূপ" কবিতাটি উল্লেখ যোগ্য। এবারকার প্রবাসীতে গল্প মোটে একটী প্রবাসীতে গল্পের সংখ্যা বাড়ান দরকার।

শ্রী যাদুনাথ।

শ্রীমতী সুপ্রভা :—আমার স্বামীটির ভাই এমন সঙ্গে বাতিক।

শ্রীমতী বিচিত্রা :—তাই নাকি ভাই—তেমন হলে তো বড় মুস্কিল তোর।

শ্রীমতী সুপ্রভা :—যাচ্ছো। তোর স্বামীর ও সব নেই বুঝি?

শ্রীমতী বিচিত্রা :—নাঃ—তবুও একটুও নেই।

শ্রীমতী :—যাই বল ভাই—তেমনটি হলেও কিন্তু মোটেই ভাল লাগে না।

শিক্ষক :—সংসারে কৃতী লোক কে?

ছাত্র :—সংসারে খরচের চেয়ে যের বেশী যারা রোজগার করে যেতে পারে।

স্ত্রী :—আচ্ছা দেখ গো এক কাজ করলে কেমন হয়? তোমার ব্যবসার জন্য বাবাকে ধরে কিছু টাকা দিতে রাজী করালে কেমন হয়! কি বল?

স্বামী :—বাঃ—এতো খুব ভাল মতলব!

বি :—স্বামী স্ত্রী দু'জনা ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির হলেই ভাল হয়?

নি :—হাঁ সেই জন্যেই তো কোন ধনী শ্বশুরের মেয়েকে খুঁজছি।

সে কথাটী

(শ্রী———)

কতবার এসেছিলে, মুখপানে চেয়েছিলে প্রিয়ে!
শুনিতে সে কথা।
যদি নাই আসি তায়। বলি নাই আমি শুনি পাছে
পাও তুমি ব্যথা।
অধর কম্পনে তব, উচ্ছ্বসিত ব'য়েছিল
শিরায় শিরায়।
ছলনার হাসি আঁখিজলে চকল করিয়াছিল
আমার হিয়ায়॥
শতবার জানিয়াও তুমি, জানিতে চাহিয়াছিলে
সেদিন সে কথা।
বলিবার তরে তাহা প্রিয়ে, আজি মোর বক্ষ ভরি
জাগে ব্যাকুলতা।
কোথা তুমি, কোথা তুমি এবে, চ'লি গেছ তুমি বুঝি
জীবনের পার।
আজি কিগো সেই দেশে পশিবে না তোমার কাণেতে
এই হাহাকার।
আজি এই আকুলতা মোর, হারা বুকখানি ফুকে
এ মহা কাঁদন,
করিবে না ব্যাকুল তোমায়, করিবে না হিয়া তব
একটু চেতন।
এ সুর শুনিবে নাকো তব ছুটিতাবে তুলিবে না
মোহন ঝঙ্কার;
মনপ্রাণ গলাইয়া দিয়া এক করিবে না আজ
আমা দোঁহাকার।
শুনিবার তরে যাহা রেখেছিলে, কৈফেছিলে তুমি
ব'য়েছিলে পায়।
বলিব গো সেইকথা আজ, বলিবার তরে মোর
হিয়া উথলায়॥
না বলিয়া যে কথাটী গেছেছিলো ব্যথা, প্রাণ মোর
আছাড়িছে বুকে;
বলিবগো সেই কথা আজ, এলো ফিরে বাহুপাশে
ধনিবিক্ষ সুখে।
শোন তবে শোন আজ, "ভালবাসি, বড় ভালবাসি,
ভালবাসি প্রিয়া।
ভালবাসি আমি তোমা অন্তরে অন্তরে ভালবাসি
মনপ্রাণ দিয়া।"
প্রত্যেক কথাটী মম আজি এ দেহের যাগে তব
বুকের শয়ন;
সাগাপ্রাণ আকুলিয়া ঠোঁটের কাণায় যাচে সেই
চুমার মরণ॥

সাহানার সুর

(শ্রীপ্রভাতকিরণ বসু)

ওলো গঙ্গাজল!
কোন্ গাঁয়ে আজ সকাল বেলায় সানাই বাজে বল্?
দখিন্ হাওয়া, বাজল বাঁশী,
করে রটে পাগল পারা;—
এমনতর কিছু তারা করেনা চঞ্চল!
এমন ক'রে ভায়না খুলে ফুল শতদল!
সানাই শুনে পড়ল মনে গায় হলুদের তোয়,
বিয়ের মন্তর, ফুলশয্যের আড়ি পাতা তোর!
পড়ছে মনে, জরীর চৌপর
নয়না গাঁটি কাপড় চোপড়
প্রথম দিনের গালের ওপর—বুঝলি? তবে চল্—
বাড়ী গিয়ে দেখবি ঘাটে মেয়ী করার কল।

পঙ্কজ

[শ্রীবীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়]

মাঘের কি বিশ্রী রাত্রি, ঘন কুয়াশায় রাস্তার গ্যাসের আলোগুলি আচ্ছন্ন হয়ে আছে। মোটে আটটা বেজেছে এরি ভেতর দুধারের অধিকাংশ দোকানই বন্ধ হয়ে গেছে। এক যুবক—বয়স বিশ বছর হবে কি না সন্দেহ, রাস্তা দিয়ে টল্‌তে টল্‌তে চলেছে, চল্‌তে চল্‌তে হঠাৎ সে এক জন লোকের গায়ের উপর পড়ে গেল। সে তাকে ধাক্কা দিয়ে এক দোকানের গায় ফেলে দিয়ে বলে উঠ্‌ল "বেটা মাতাল, মরবার জায়গা পাওনি।"

কতক্ষণ সেখানে চুপ্ করে বসে থেকে আবার সে চল্‌তে আরম্ভ করল।

অরুণ ছেলে বেলা থেকেই কবি। তার তরুণ বয়সের কবিতা গুলি পড়ে শিশুর মত কোমল প্রাণ এক বুড়ো শিক্ষক আশীর্ব্বাদ করে বলেছিলেন যে ভবিষ্যতে সাহিত্যে সে খুব নাম করবে। কিশোর বয়সের কবিতা গুলি শরৎ কালের সদ্য ঝরে পড়া টাট্‌কা শিউলি ফুলের মতনই মনোহর হয়েছিল।

ছাত্র জীবনের কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে [illegible] এসে অরুণ আরও অন্য বড়লোকের মত উঁচু আশা ও কল্পনা অন্তরে পোষণ করে দু'বেলা হোটেলে খেয়ে ছুটো-ছুটি করতে লাগল। প্রথমে সে তার কবিতা একজন প্রসিদ্ধ প্রকাশকের নিকট নিয়ে গেল। দু'মাস পরে অরুণ তাঁর এক সংক্ষিপ্ত পত্র পেল; তিনি এই তরুণ কবিকে অনেক প্রশংসা করে তার কবিতা ছাপ্‌বেন বলেছেন তবে খরচা তাকে দিতে হবে এই কথায়ে। যাই হোক্ তার কবিতার অন্ততঃ একজনও সমঝদার যে আছে এটুকুই তার সান্ত্বনা। জীবিকার পথে এর চাইতে বেশী আর সে অগ্রসর হতে পারে নি। ছেলে পড়িয়ে ছাপাখানার প্রুফ দেখে হাড় ভাঙ্গা খাটুনী খেটে সে জীবন ধারণ করতে লাগ্‌ল। কিন্তু পয়সার অভাব হলেও তাঁর এই বিশুষ্ক জীবনে বেশ একটু মহত্ত্ব ছিল।

যাই হোক অরুণের অবস্থা ক্রমেই অত্যন্ত শোচনীয় হয়ে উঠ্‌ল। ছেলে পড়াবার কাজ থেকে তাঁরা জবাব দিয়েছিল; ছাপাখানার প্রুফ দেখার কাজ কি নিয়ে একটু খিটিমিটি হওয়ায় সেখান থেকে সে বরখাস্ত হয়ে গেল। একটা লোকের বাড়ী ভাড়া আদায় করে (সে এক রকম দরোয়ানের কাজ বল্লেও হয়) তার বিনিময়ে খোরাকী ও মাথা গোঁজবার ঠাঁই টুকু পেয়ে সে স্বর্গে গেল। ক্রমে ভাড়া আদায়ের কাজও শেষ হয়ে এল।

মাঘের এই শীত স্নিগ্ধ রাতে পথের উপর দিয়ে যখন সে টল্‌তে টল্‌তে যাচ্ছিল, তখন সাত দিন প্রায় অনাহারে কেটে গেছে। ক'দিন আগে এক বিয়ের বর যাত্রীর দলে মিশে পেট ভরে খেয়ে খানকতক লুচী সে পকেটে পুরে এনেছিল, তারি শেষ টুকরো দিয়ে সে আজ প্রাতর্ভোজন শেষ করেছে, সে দিন এ ছাড়া আর কোন খাবারই তার জোটে নি। পকেট শূন্য। আজের দিন তার এক বন্ধু প্রায় তারই মত গরীব সাহে[illegible] সেখানে গেলে তার বাসাবাড়ীতে গিয়ে খেতে বলে[illegible] বাসায় [illegible] এ আশাও সে পেয়েছিল। কিন্তু অত রাস্তা চল্‌বার সামর্থ্য আর তার ছিল না, প্রায় ঘণ্টা খানেক পথ চল্‌তে চল্‌তে সে এক গলিতে ঢুকে অকস্মাৎ ভাবে একটা রোয়াকের উপর বসে পড়ল। ক্ষুধায় পেটের নাড়ী অবধি জ্বল্‌ছে; মাথার রগ্ দপ্ দপ্ করছে। কি যন্ত্রণা!—ওঃ আর সে পারে না।

সহসা তার পেছন দিকের বাড়ীর একটা দরজা খুলে গেল। সঙ্গে সঙ্গে কে কর্কশ নারী কণ্ঠে বলে উঠ্‌ল "কি গো চন্দ বাইরে বসে যে, ভেতরে এসোনা।"

কলের পুতুলের মত অরুণ স্ত্রীলোকটীর মুখের পানে তাকাল। স্ত্রীলোকটীর রং কাল। বয়স ত্রিশেরও বেশী। পরণে একখানা কাল কস্তাপেড়ে সাড়ী। হাত ও মুখের ধরণ অনেকটা ব্যাটা ছেলের মত শক্ত শক্ত। চোখে সুর্মা, গালে রংয়ের পোঁচ। বেশ বোঝা যায়—চরিত্র হীনা।

একে দেখে অরুণ বিস্ময় স্তব্ধ হয়ে গেল। কিশোর বয়স থেকে এ পর্য্যন্ত নিজের স্বপ্ন কল্পনার সেই কোন্

অজানা দেশের পরী বা রাজকুমারী ছাড়া সে ত এ পর্য্যন্ত আর কাউকেই ভালবাসেনি। তাড়াতাড়ি উঠে সে পালাতে চেষ্টা করল। কিন্তু ক্লান্ত পা-দুটো যেন আর ভর সইতে পারছিল না। কিছুদূর গিয়ে সে আর একটা প্রাচীরের গায় ঠেলে দাঁড়াল।

"মাইরি ভাই..... পালাচ্ছ যে বড়?"

স্ত্রীলোকটি অরুণের পেছনে পেছনে আসছিল এখন তাকে ধরে ফেল। তার পর একেবারে মুখের সামে মুখ এনে বেহায়া ধরণের মুচকি হাসি হাসতে হাসতে এক দৃষ্টে তাকে দেখতে লাগল।

অরুণ তখন মূর্চ্ছিত প্রায়। কপাল দিয়ে ঘাম ঝরছে। সে অস্ফুটস্বরে যেন বলে উঠল "আমায় একা থাকতে দাও।....." যুবককে ভাল করে দেখেই স্ত্রীলোকটির মুখের ভাব হঠাৎ বদলে গেল। যে ধরণের লোক তার কাছে যাওয়া আসা করে এরে মোটেই সে ধরণের নয় তা দেখে সে অত্যন্ত অপ্রস্তুত হয়ে গেল। এখন 'তুমি'র বদলে 'আপনি' সম্বোধন আরম্ভ করল কিন্তু একটু ভয়ের ভাব দেখা গেল।

অরুণ চোখ বুজে ... নিশ্বাস ফেলছিল। সে অস্ফুট স্বরে বল "আজ ক'দিন কিছু খেতে পাইনি..... দিয়ের...ওঃ—

"এঁ্যা! ক'দিন অনাহারী?"—এই বলে স্ত্রীলোকটী এক রকম জোর করেই অরুণকে ধরে নিয়ে ঘরের ভেতর ঢুকে পড়ল।

ছোট্ট একতলা ঘর। এক দিকে একটি কেরোসিনের আলো জ্বলছে। তারি একধারে একটি কালী ঘাটের কালীমাতার ছবি। একটী টেবিল, তার উপর খান-কতক বই। একটী ভাঙ্গা চেয়ার। এক ধারে খাটের উপর ধবধবে সাদা বিছানাটী। বেশ পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন।

দুঃখে লজ্জায় অরুণ সামের চেয়ারটীতে বসে পড়ে দু'হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। ভাবের আবেগে রমণীটীর চোখ ফেটে জল নেবে আসছিল। সে তাড়াতাড়ি এক গেলাস জল ও একটি পিঁড়ি পেতে ঠাঁই করে দিলে। আর খুব তাড়াতাড়ি করেক খানা রুটী কিছু আলুর তরকারী ও করেক টুকরো সিদ্ধ মাংস এই অরুণ অতিথির সামে ধরল।

অরুণ যখন অশ্রু সজল চক্ষে আর্দ্র কণ্ঠে বলতে লাগল 'তোমার বড় দয়া—তখন এই যুবকের প্রতি তার যেন কি এক রকম স্নেহের ধারা উথলে উঠল। সে অরুণের পানে তাকিয়ে করুণ সুরে বল।—আপনি আর কথা বলে নিজেকে শ্রান্ত করবেন না। আগে খেয়ে নিন্।" কম্পিত হস্তে অত্যন্ত আগ্রহের সহিত মুখ তুলে সে খেতে আরম্ভ করল। স্ত্রীলোকটী পাছে সেখানে থাকলে তার কোনও রকম ব্যাঘাত হয় এই ভয়ে শোয়া বেড়ালটিকে তুলে নিয়ে বারান্দায় গিয়ে তাকে আদর করতে লাগল। তার বুকের ভেতর তালে তালে যেন কে বলছিল "আহা বেচারী.....আহা বেচারী।"

হঠাৎ তার মনে হল এতদিন অনাহারী হয়ত এতে ওঁর পেট ভরেনি। সে তাড়াতাড়ি ফিরে এসে স্নেহময়ী জননীর মত তাকে অবশিষ্ট দুখানা রুটী ও কিছু মাংস এনে দিল। তারপর যেন আপনা আপনিই বলে উঠল "আমি কি বোকা। হজম হবার জন্য গরম কিছু চাই যে, যাই, একটু চা করে আনিগে।

এই বলে ঘরে কোণে একটা ষ্টোভ্ জেলে সে চা তৈরী করতে লাগল। অরুণ খেতে খেতে তাকে দেখতে লাগল। শুষ্ক, বীর্যহীন, মজুরণীদের মত কাঠখোট্টা চেহারা, এক সময় হয়ত তার মায়া ছিল, শরীরে শক্তি ছিল, তার যৌবন একটু স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য ছিল।

এখন দেখতে প্রায় বুড়ীর মত, বিশ্রী মোটা কপালের কাছে কয়টী পাকা চুলও দেখা দিয়েছে।

কিন্তু অরুণ একজন প্রকৃত কবি, ক'দিন বাদে সে এক জন কবি বলে খ্যাতিও লাভ করেছিল—স্ত্রীলোকটিকে দেখতে দেখতে তার চোখ জলে ভরে এল। সে যখন চায়ের পেয়ালাটি তার সামে এনে রাখল তখন তার পানে তাকিয়ে অরুণ বল "আপনাকে কি বলে যে ধন্যবাদ.....।" বাধা দিয়ে স্ত্রীলোকটি বল "আমায় কিছু দিতে হবে না। আমি যা ব্যবহার আপনার কাছে পেয়েছি তার চেয়ে বেশী কিছু আশাও করি না, কিন্তু আপনাকে দেখে ত বেশ বুঝতে পারছি যে আপনি সুখী নন্।.....যাই হোক্ আশা ছাড়বেন্ না।.....আপনি যুবক—যৌবন পরম ধন..... এখন আপনি কি করেন?" একটু শুষ্ক হাসি হেসে অরুণ বল "আমি কবিতা লিখি।"

সে বিস্মিত না হয়ে বল "ওঃ বুঝেছি আপনি গান লেখেন, যাই হোক্ ধৈর্য্য ধরে থাকুন, একদিন না একদিন আপনার উন্নতি হবেই।" বলতে বলতে সে মাথা নীচু করে চুপ্ করে রইল।

অরুণ বুঝল এবার বিদায় নিতে হবে। সে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল, তারপর ছোট্ট একটি নমস্কার করে ধীরে ধীরে শান্ত চিত্তে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

(Francois Coppee'র ফরাসী গল্প থেকে)

পাঠের ছলনা করি
প্রিয়-কথা ভাবনা

আলোচনা

ভারতের অর্থ সম্পদের পরিমাণ অগাধ অফুরন্ত হইলেও ভারতের অধিবাসীরা যত রোগে ভুগিয়া, জলাভাবে, অন্নাভাবে নানা দুঃখ কষ্ট সহিয়া মরে—এমন দলিত মৃত্যু আর কোন দেশের অধিবাসীর হয় না। ইহা অতি সত্য কথা এবং ভারতবাসীর পক্ষে পরম লজ্জার কথাও বটে। অভাবের জ্বালায় দগ্ধ হইয়া, মরিতে বসিয়া এ দেশের অধিবাসীরা আকাশ পাতাল ভাবিতেছে যত, মরণ কামনা করিতেছে যত, নিজেদের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বাড়াইবার উপযোগী কর্মশক্তি প্রয়োগ তেমন করিতে পারিতেছে না। জগতের লোক সংখ্যা ক্রমে বাড়িতেছে—অভাব অভিযোগ, জীবন সংগ্রামের তীব্রতাও ক্রমেই বেশী অনুভূত হইবে সন্দেহ নাই। আধুনিক যুগের এই সর্বগ্রাসী অভাব হইতে নিজেদের রক্ষা করিতে হইলে কর্মশক্তি, সাহস, ধৈর্য অবলম্বন করিয়া অভাবের সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া অভাবকে দূর করিতে হইবে। অভাবের ভাবনায় নিষ্ক্রিয় নিরবলম্ব হইয়া দেশবাসী যত ভাবিতে থাকিবে দুঃখ কষ্টপূর্ণ মৃত্যু বিভীষিকা ততই তাহার সম্মুখে আগাইয়া আসিবে।

● ● ●

স্বর্ণপ্রসূ ভারতের মাটিতে সোনা ফলে—বাতাসে অমৃত বহিয়া যায়। কিন্তু এমন দেশের পরিচয় দেশের অধিবাসীর যতটা না জানে বিদেশীরা তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী জানে। দেশবাসীরা আজ অভাবে পড়িয়া অনেক সময় বলে বিদেশীরা আমাদের সব শোষণ করিয়া লইয়া যাইতেছে—তাই আমরা অভাবে মরিতেছি। বসিয়া বসিয়া এ কথার আলোচনায় বিদেশীর উপর দোষ চাপাইয়া পরচর্চার আনন্দ উপভোগ করা যায় বটে, কিন্তু তাহাতে নিজেদের দুঃখ কষ্ট ও অভাবের লাঘব কিছু মাত্র হয় না—বরঞ্চ দিনে দিনে তাহা বাড়িয়াই চলে।

ইংরেজ বণিকই হোক বা অপর যে কেহই হোক যাহারা ভারত হইতে অর্থ সমৃদ্ধি অর্জন করিতেছে তাহারা নিজেদের কর্ম ক্ষমতা দ্বারাই অর্থাগমের পথ উন্মুক্ত করিতেছে। পরিত্যক্ত আবর্জনার মধ্যে তাহারা লক্ষ্মী শ্রী ফুটাইয়া তুলিতেছে, গোবরে পদ্মফুল ফুটাইতেছে। অর্থাগমের জন্য নূতন নূতন খনি খুঁড়িতে বলিতেছে, মাটির নীচে অন্ধকূপে নানা মহামূল্য খনিজদ্রব্য আবিষ্কৃত হইতেছে—পর্বত শৃঙ্গের অজ্ঞাত রাজ্যে, অতল সাগর তলের মণিরত্নের সন্ধান বিদেশীরা প্রাণের মায়া ত্যাগ করিয়া করিতেছে—রত্ন আহরণের জন্য প্রাণ যাহার দিতেছে রত্ন তাহারা ভোগ করিবে না ভোগ করিবে নিষ্ক্রিয়েরা?

● ● ●

পাটের ব্যবসায় বাংলা দেশের খুব একটা বড় ব্যবসায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বাংলার অধিবাসীরা নগদ টাকার মুখ দেখিতে পায় অনেক সময় পাটের দৌলতেই। বাংলার কৃষাণেরা দু'দিন স্বচ্ছল অবস্থায় আসে মহাজনের ঋণ ও জমির খাজনা দিতে পারে এই পাটের জোরেই। অথচ এই পাটের ব্যবহার দেশবাসীরা জানে না—বিদেশীরা ইহা কিনিয়া লইয়া নানা পণ্যে ইহার রূপান্তর করে ও যে মূল্যে পাট ক্রয় করে তার চেয়ে অনেক গুণ বেশী মূল্যে তাহা বাজারে বিক্রয় করে। বাংলা দেশের পাটের কল যাহাদের আছে তাহাদের আয়ের মত আর প্রজার উপর নির্ভরী কোন রাজা মহারাজের নাই। কিন্তু তুচ্ছ পাটকে এই রত্নপ্রসূ ব্যবসায়ে যাহারা রূপান্তরিত করিতে পারিয়াছে তাহারা কি শুধু শোষণকারী বলিয়াই নিন্দিত হইবে দেশবাসীর কাছে—না তাহাদের নিকট হইতে দেশবাসী অর্থাগমের কৌশলটাও শিখিয়া লইবে ও তেমন কর্মশক্তি লাভের যোগ্যতা অর্জন করিবে?

জগতে মুসলমানের সংখ্যা প্রায় বাইশ কোটি। হিন্দুর সংখ্যা বাইশ কোটির কিছু উপরে। মুসলমান বাইশ কোটির মধ্যে প্রায় সাড়ে তিন কোটি স্বাধীন —ইহারা ইওরোপীয়দের অধীন নহে। আর কোটি কোটি হিন্দুর মধ্যে মাত্র লাখ পাঁচ ছয় হিন্দু স্বাধীন নামে পরিচিত। এই স্বাধীন ক'লাখ মাত্র হিন্দু নেপালে ও আর দু'একটা ছোট ছোট রাজ্যে আছে।

● ● ●

বুদ্ধি বৃত্তি, মর্য্যাদা জ্ঞান, মনুষ্যত্ব সকলের সমবায়েই স্বাধীনতা গড়িয়া ওঠে না—স্বাধীনতা পাইবার ও রাখিবার জন্য আরও কোন গুণের অপরিহার্য্য প্রয়োজন আছে? স্বাধীন যাহারা তাহাদের মরণ-ভীতি নাই—একতার বল তাহাদের আছে। ইহা হইতে যে যত ভ্রষ্ট হইতে থাকে স্বাধীনতাও তাহার ততই লুপ্ত হইতে থাকে।

● ● ●

তুরস্কের জাতীয় সমিতির নির্দ্ধারণক্রমে তুরস্কের খালিফের পদ লুপ্ত হইল। ইহার ফল নব আগ্রহ মুসলমান সমাজের পক্ষে ভাল হইবে কি মন্দ হইবে তাহা কেহ বলিতে পারে না। তবে তুরস্কের জন-শক্তির মতে ও তুর্ক বীর, জাতির ত্রাণকর্ত্তা গাজী মুস্তাফা কেমালপাশার নির্দ্ধারণক্রমে যখন এ ব্যবস্থা হইয়াছে তখন বোঝা যাইতেছে জনমত খালিফের অনুকূলে নহে। তুরস্কের স্বাধীনতা, তুরস্কের জন-মতের মর্য্যাদা বড়—না খালিফ বড়—এই প্রশ্নের সমাধানই বুঝি জাতীয় সমিতি এই ভাবে করিলেন। ভারতীয় খিলাফৎ প্রশ্নের সমাধান এইবার কি ভাবে হইবে?

● ● ●

গত বৎসর বাজেটে ভারতসরকার লবণ কর দ্বিগুণ করিয়া সাড়ে চার কোটি টাকা পাইবার আশা করিয়াছিলেন—কিন্তু সে স্থানে বেড় কোটি মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। এজন্যে এবার সরকারের বিশেষ লাভ হইয়াছে। এবার আর নূতন কর কিছু বসিবে না—লবণ কর কমিয়া দু'টাকা হইবে। সৈন্য সংরক্ষণের ব্যয় ৫৮½ কোটি মুদ্রাই রহিল। লবণ কর কমাইয়া পূর্ব্বের পাঁচ সিকা, পোষ্টকার্ড এনভেলাপের দাম আগের মত এক পয়সা, দু'পয়সা করিলেই ভাল হয়।

ডি ক্যামেরণ রমণীর সুপ্রসিদ্ধা অভিনেত্রী মিস্ মারগারেটা ব্যানারম্যান

নারী! নারী! নারী!!

বাসন্তীর উপন্যাস

এই সংখ্যা হইতে শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী সরস্বতীর বিচিত্র নারী চরিত্রের রহস্যময় উপন্যাস 'নারী' ধারাবাহিক চলিবে।

নারী

শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী সরস্বতী

কন্যার বিবাহ সম্বন্ধ ঠিক করিয়া শিবনাথ বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন, উৎকণ্ঠিতা সুরমা জিজ্ঞাসা করিলেন কি রকম দেখলে?

শিবনাথ বলিলেন—"আমার বেশ পছন্দমত, কোন দিকেই খাপ ছাড়া নয়।

সুরমা তবু সন্দিগ্ধভাবে বলিলেন—লেখাপড়া?—শিবনাথ বলিলেন—এম এ পাশ।

সুরমা বলিলেন তবু—স্বভাব চরিত্র—"

শিবনাথ হাসিয়া বলিলেন—ওগো, সব ভাল, সব ভাল। মনে ভাব তোমরা মায়ের জাত বলে ছেলে মেয়েদের ভালমন্দ বেশী রকম দেখে থাক, তা নয়, আমরা বাপ হয়ে তোমাদের চেয়ে বড় কম ভাবিনে। আমার মেয়েটির কষ্ট হ'লে এরপর আমাকেই যে দোষ দেবে সেটা তোমার চেয়েও আমি বেশী রকম ভেবে থাকি। তোমার মাথায় তো কোন দোষ ভার চাপাবে না, কারণ তুমি পরমুখাপেক্ষিণী। যতদূর শুনলুম অমন ছেলে দেখা যায় না। ছেলে লেখাপড়ায় ভাল, অতি সুন্দর চেহারা, আর সব চেয়ে ভাল তার স্বভাব চরিত্র। তবে একটা বিষয় তোমাদের বিবেচনায় তত সুন্দর না হতে পারে কারণ ছেলেটির অবস্থা ভাল নয়, অবস্থা অর্থে শারীরিক কিম্বা সামাজিক নয়, সাংসারিক। গরীব লোক তারা ছেলেটি সবেমাত্র একটা কলেজে অধ্যাপকের কাজে নিযুক্ত হয়েছে। আর একটি ভাই আছে সে বি, এ, পাশ করে এবার কাজে ঢুকবে। এদের দুই ভাইয়ের রোজগারেই সংসার আবার সচ্ছল হয়ে যাবে একদিন, সুতরাং—

সুরমা বাধা দিয়া বলিলেন—তা হোক আর না হোক আমার একটিমাত্র মেয়ে, জামাই এখানেই তো থাকতে পারবে?

শিবনাথ বলিলেন—এখানেই কাজ করে বলে যে তোমার বাড়ীতেই থাকবে এমন কোনই কথা নেই। মানুষের মনুষ্যত্বকে খর্ব্ব করতে আমি ভারি সঙ্কুচিত হই তা জানো। সে গরীব হ'লেও তার মনে আত্মমর্য্যাদা রূপ মনুষ্যত্ব জেগে থাকতে পারে যা তাকে বড়লোক শ্বশুরের বাড়ীতে অন্নদাস হয়ে থাকতে বাধা দেবে। সে বিয়ে করে যদি আলাদা জায়গায় থাকতে চায় তাই থাক, যদি আমার এখানে থাকতে চায় স্বইচ্ছায়, তা থাকতে পারে। সুরমা গম্ভীরভাবে মুখ ফিরাইয়া লইলেন।

যাহার বিবাহ লইয়া পিতামাতার মধ্যে কথা-বার্ত্তা হইতেছিল সে তখন নির্ব্বিকার চিত্তে অন্য কক্ষে বসিয়া স্বরলিপি সংযোগে হার্ম্মোনিয়ামে গাহিতেছিল।

আমি তাহা নাথ লইব আদরে তুমি যাহা দেবে গো।

কণা মেয়েটি যথার্থই বড় সুন্দরী যাহাকে অনিন্দ্য সুন্দর, বলা যায় সে ছিল তাই, তাহার পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত কোথাও এমন একটু খুঁত ছিল না যাহা ধরিতে পারা যায়। এই অপূর্ব্ব সুন্দরী মেয়েটি বাহিরে দেখিতেই যে সুন্দর ছিল তাহা নয়, তাহার মনটাও তেমনি সরল, তেমনি পবিত্র। সেই শুভ্র অকলঙ্কিত হৃদয় খানিতে আজও কোনও রেখা অঙ্কিত হয় নাই। সপ্তদশবর্ষীয়া কিশোরী ঠিক পঞ্চম বর্ষীয়া বালিকার ন্যায় সরলা নির্ম্মলা।

সে দিনে সে ম্যাট্রিক এক্সামিন দিয়াছে, এখনও তাহার খবর বাহির হয় নাই। পিতামাতা শুধু তাহার এক্সামিন দেওয়ার অপেক্ষা করিতেছিলেন, বৈশাখের শেষের দিকে তাঁহারা মেয়েটির বিবাহ দিতে পারিলে বাঁচিয়া যান।

বিবাহের শীঘ্রই সব ঠিক হইয়া গেল সুরমা আর কোনও আপত্তি তুলিতে পারিলেন না, শীঘ্রই কণিকা ও কণার সহিত বিনয়ের বিবাহ হইয়া গেল।

যে দেখিল সেই স্বীকার করিয়া গেল তাঁ, যানাইয়াছে বটে, এ যেন লক্ষ্মী নারায়ণে মিল হইয়াছে।

বিবাহের পরদিনই সুরমা জামাতাকে যখন আহার করাইতে বসাইয়াছিলেন, তখন জিজ্ঞাসা করিলেন তুমি এখানেই তো কাজ কর বাবা?"

বিনয় শান্তকণ্ঠে বলিল—"হাঁ।"

সুরমা বলিলেন এখানে তো তোমার আত্মীয় স্বজন কেউ নেই, তোমার আত্মীয়েরা সবই তো থাকেন সেই পাড়াগাঁয়ে, তুমি এখানে কোথা থাক?"

বিনয় উত্তর দিল 'মেসে থাকি'।"

যেন শিহরিয়া উঠিয়া সুরমা বলিলেন "মেসে? ছিঃ, এখানকার মেস আবার মেস সেখানে কি ভদ্রলোকে থাকতে পারে বাবা। আমি যা শুনেছি তাতে মনে হয় মেসে থাকা আর নরকে থাকা একই সমান। আর আমাদের তো এটা নিজেরই বাড়ী, তুমি এখন এসে স্বচ্ছন্দে এখানে থাকতে পার। আমাদের ও তো তুমি আর ওই মেয়েটী ছাড়া আর কেউ নেই। আমরা এখানে থাকতে তুমি মেসে থাকবে তা হবে না—বাবা আমার এই অনুরোধটী তোমায় রাখতেই হবে, তোমার এখানে থাকা চাই-ই।"

বিনয় মুখ অবনত করিয়া বলিল "আচ্ছা দেখা যাবে।"

সুরমা এবার বিশেষ করিয়া ধরিয়া বসিলেন "না বাবা, দেখা যাবে বললে চলবে না। এ তোমার নিজের বাড়ী, নিজের ঘর, আমরা তোমার শ্বশুর শাশুড়ী, তুমি অন্য জায়গায় থাকবে তাও কি হতে পারে কখন ও? এই যেমে যাচ্ছো, ফিরে এসে উঠতে হবে এখানে। বল বাবা, থাকবে তো?"

বিনয় ফাঁপরে পড়িয়া গিয়া বলিল "আমার মাকে আগে না জিজ্ঞাসা করে কিছু বলতে পারব না মা, সে জন্যে আমায় মাপ করবেন। কখনও মায়ের মত না নিয়ে কিছু করিনি, আজ ও তাঁর মত না নিয়ে পারব না।"

বিনয়ের এই মাতৃভক্তির কথায় সুরমার চোখ দুইটা একবার জ্বলিয়া উঠিল, তখনি স্বাভাবিক মুখে তিনি একটু হাসিয়া বলিলেন "বেশ বাবা, তাঁকে জিজ্ঞাসা করে তার পরে এসো। আমি বেশ জানছি তিনি আপত্তি করবেন না। আর একটা কথা বলি বাবা, আমার ঝি কলকাতার মেয়ে, পাড়াগাঁ কেমন তা সে কখনও জানে না, চোখে দেখা তো দূরে থাক। সে সেখানে গিয়ে থাকতে পারবে না, কেঁদে ভাসাবে। বাবা, তাকে এইবার যা নিয়ে যাও দুদিনের জন্যে নিয়ে যাও, তুমি যদি এখানে থাক তা হলে আর তাকে সেখানে যেতে হবে না। তাকে দুদিন বাদেই নিয়ে এসো, দুদিনের বেশী সে কিছুতেই সেই পাড়াগাঁয়ে থাকতে পারবে না।"—

বিনয়ের মুখখানা বিকৃত হইয়া গেল, সে মাথাটা আরও বেশী রকম নত করিয়া দুধের বাটীতে কতক-গুলা চিনি ফেলিয়া দিতে দিতে বলিল "আচ্ছা, আমি মাকে বলব।"

এই শিক্ষিত ছেলেটী—যে নিজের পায়ে নিজে ভর করিয়া দাঁড়াইতে সমর্থ হইয়াছে তাহার এই মায়ের পরে সম্পূর্ণ নির্ভরতায় সুরমার হৃদয়ের অতি গুহ্যতম প্রদেশটা রি রি করিয়া জ্বলিয়া উঠিল, কিন্তু তিনি আর কথা কহিলেন না।

বিনয়ের মনটাও যেন আঘাত প্রাপ্ত হইয়া দমিয়া গিয়াছিল। শাশুড়ি ঠাকুরাণীর এমন মিষ্ট কথাগুলি তাহাকে মোটেই বশ করিতে পারিল না, উপরন্তু যেন চোখ ফুটাইয়া দিল। সে এই প্রথম পরিচয়েই এখানকার সকলকে এমন কি নিজের শিক্ষিতা স্ত্রীকে পর্য্যন্ত চিনিয়া ফেলিল। নিমেষে তাহার হৃদয়খানা তিক্ততায় পূর্ণ হইয়া উঠিল, সে আপনা আপনি ধিক্কার দিল "ছি।"

মনে সে বেশ বুঝিল শুধু তাহাকে দেখিয়াই

শিবনাথ কন্যা দিয়াছেন। তাহার বাড়ী পল্লীগ্রামে, সে দরিদ্র, প্রথম কারণটা না হইলেও দ্বিতীয় কারণটার জন্যই তাঁহারা কন্যাকে সেখানে রাখিয়া দিতে অসম্মত।

মন তাহার বিদ্রোহী হইয়া উঠিল—না, মা যদি এখানে থাকিতেও বলেন সে কখনই থাকিবে না। মেস তাহার পক্ষে স্বর্গ, সেখানে থাকাই ভাল; স্বাধীন ভাবে থাকা যাইবে। শ্বশুর বাড়ীতে শাশুড়ীর অন্নদাস হইয়া থাকা—ছিঃ, তার চেয়ে মরণ ভাল।

(২)

কিন্তু দুই দিনেই সে তাহার স্ত্রীর পরিচয় পাইল। শিক্ষিতা মেয়ের সম্বন্ধে তাহার মনে যে ধারণাটা জন্মিয়াছিল তাহা শীঘ্রই দূর হইয়া গেল।

বউ ভাত শেষ হইয়া গেল, তখন একদিন বিনয় মায়ের কাছে শাশুড়ী ঠাকুরাণীর প্রস্তাব উত্থাপন করিল।

মা বলিলেন বেশ তো বাবা, তিনি এ ভাল কথাই বলেছেন। তুমি আর মেসে যেয়ো না, তাঁদের কাছে গিয়েই থাকো, আর—সত্যি, বউ মা কি এখানে থাকতে পারবেন? তিনি কলকাতার মেয়ে, পাড়া গাঁ কখনও চোখে দেখেননি, তিনি মুখে কিছু না বললেও আমি বেশ বুঝছি তাঁর প্রাণটা হাঁফিয়ে উঠছে। এই এসেছেন, আর তাঁর আসতে হবে না। আর এখানে এসে থাকবেনই বা কোথায়—তাঁর থাকবার মত জায়গা কি আমাদের এই কুঁড়ে ঘর?

বিনয় রাগ করিয়া বলিল "হোক কুঁড়েঘর, তবু এইখানেই থাকতে হবে। বিয়ে হলে পরে মেয়েই আসে শ্বশুর বাড়ী, পুরুষ যায় শ্বশুর বাড়ী তা শুনেছ? আমার বেলা উল্টো হবে তাঁরা বড় লোক আর আমরা গরীব লোক বলে বুঝি?"

মা চুপ করিয়া গেলেন। পুত্রের কথার উপরে কথা বলিয়া কেনাইয়া কেনাইয়া এই কথাটাকে অনেকখানি করিতে পারিলেন না। তিনি স্বভাবতঃ অতি অল্প কথা বলিতেন, তাহার উপর বাড়ীতে রহিয়াছে পুত্রবধূ, তাহার সম্বন্ধে এ সময় কোন কথাই বলা চলে না।

কণা গৃহকর্ম কিছুই জানিত না, তাহাকে কিছুই শিখানো হয় নাই। এই পল্লীগ্রামের ছোট ছোট মেয়েরা পর্যন্ত কেমন বড় বড় কাজগুলা করে দেখিয়া সে আশ্চর্য্যও যেমন হইয়াছিল নিজের অক্ষমতার কথা ভাবিয়া তেমনি সঙ্কুচিতও হইয়াছিল সে কাজ করিবার জন্য হাত বাড়াইল কিন্তু বিনয়ের মা কাজ করিতে দিলেন না, মিষ্ট সুরে বলিলেন "না মা তুমি পারবে না, ভারী কষ্ট হবে তোমার।"

হাসিমুখে কণা বলিল, কেন পারব না মা? আপনার আশীর্ব্বাদের জোর থাকলে আমি কখনই এমন অক্ষম হয়ে থাকব না।

সে যে ভাবে মা কথাটা উচ্চারণ করিল তাহাতে মায়ের প্রাণটা জুড়াইয়া গেল, তিনি তাহাকে সজল-স্নেহে বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিলেন।

দুই দিনেই কণা অনেকটা কাজ আয়ত্তে আনিয়া ফেলিল, স্নেহের বশে হইতেছিল বলিয়া কষ্ট লাগিলেও তাহা সে প্রাহ্যের মধ্যে আনে নাই।

বউভাতের রাত্রে বিনয় বলিল—কাল সকালেই আমাদের যেতে হবে কণি তোমার কাপড় জামা সব গুছিয়ে নিয়েছ তো?

বিস্মিতা কণা বলিল "কাল সকালেই! কেন, আর দিন কত থেকে গেলে হয় না?"

বিনয় একটু হাসিল "এই পাড়া গাঁ, এই খড়ের ঘর, এতে তোমার ভাল লাগছে কণা?"

কণা একটু দৃঢ়তার সহিত বলিল "লাগছে বলেই বলছি আর কিছুদিন থেকে গেলে কি হয় না?"

বিনয় বলিল "হতে পারে, কিন্তু তোমার বাপ মা কি রকম অবস্থায় আছেন তোমায় পাঠিয়ে দিয়ে তা মনে করে দেখ? তুমি যে এ জায়গা ভাল বলবে এই খড়ের ঘরকে ভালবাসবে, তা আমি স্বপ্নেও

ভাবি নি। তুমি কখনও স্বপ্নেও যার আশা কর নি, হয় তো কখনও অন্য কারও এমনি খড়ের ঘর, এমনি দীন দরিদ্র ভাব দেখে—সে শুধু একবার চেয়ে দেখে মাত্র চলে গ্যাছ, আজ সেই দরিদ্রের সেই পর্ণ কুটীরে বাস করতে তোমার মত মেয়ের এত ইচ্ছে কেন কণা তা জিজ্ঞাসা করতে পারি কি ?"

কণা শান্ত চোখে স্বামীর পানে চাহিয়া রহিল; ধীরে ধীরে বলিল "পারবে না কেন—নিশ্চয়ই পারবে। তুমি জীবন্ত দেবতা, আমার বাবা নারায়ণ সাক্ষ্য রেখে তোমার হাতে আমায় সমর্পণ করেছেন, আমার এমন কোনও গোপন কথা নেই যা তোমায় শোনাবার অনুপযুক্ত হতে পারে। এ তোমার ভিটে বলেই আমার কাছে এ বড় সুন্দর, এ বড় শান্তিপ্রদ এই কুটীরে বাস করা আমার কাছে স্বর্গ সুখ, আমি কলকাতার সে প্রাসাদে ফিরে যেতে চাই নে। আমার বাবা আমায় এই ঘর বেঁধিয়ে দেছেন, আমার বাবা আমার কানে কানে বলেছেন—যাও মা, স্বামীর ঘরে যাও। সে ঘর পর্ণ কুটীর হোক, তবু জেনো সেই তোমার স্বর্গ।"

কথাগুলা বলিতে বলিতে কণার মুখ অকস্মাৎ লজ্জায় আরক্তিম হইয়া উঠিল—ছিঃ, কি পাগলের মত সে বলিয়া যাইতেছে, স্বামী কি ভাবিবেন তাহার ঠিক নাই।

বিনয় মুগ্ধ নেত্রে তাহার লজ্জারুণ অনিন্দ্য মুখখানির পানে চাহিয়া রহিল। তাহার মনে হইল ভগবান বৃথা তাহার ঘাড়ে সৌন্দর্য্যের বোঝা চাপাইয়াছেন। তাহার অন্তরে যে সৌন্দর্য্যে রহিয়াছে এক মাত্র ইহাই যে যথেষ্ট, মানুষ চাহিয়া ইহার চেয়ে বেশী আর আশা করিতে পারে না। বহিঃসৌন্দর্য্যটা মানুষকে মুগ্ধ করিতে পারে বটে কিন্তু তাহার কার্য্য এক সমান চিরটা কাল চলিতে পারে না, দেহের দিকটার সৌন্দর্য্য শুকাইয়া গেলে কাজও ফুরাইয়া যায়। কিন্তু মানসিক সৌন্দর্য্য চিরকালপ্রদ, ইহাই সংসারে যথার্থ শান্তি আনে।

এই মুহূর্ত্তে বিনয়ের মাথা ভক্তিতে অদৃশ্য দেবতার পায়ে নত হইয়া পড়িল—আমায় রাঃ দিয়ে ভুলাও নাই ভগবান, যথার্থই সোণা দিয়াছ। মরীচিকার পিছে জানিয়া শুনিয়া তৃষা বুকে লইয়া ছুটিয়াছিলাম, তাহা মরীচিকা নয়, যথার্থই শীতল পরিষ্কার জলপূর্ণ তড়াগ বটে।

বিনয় কণার হাতখানা নিজের হাতে টানিয়া লইয়া বলিল—তুমি শুনেছ কণা তোমার মা আমায় তোমাদের বাড়ী থাকতে বলেছেন ?

কণা বলিল—শুনেছি।

কথাটা তেমন স্পষ্টরূপে ফুটিল না, চাপা স্বরে বাহির হইল।

বিনয় গম্ভীর মুখে বলিল—তার উদ্দেশ্য তোমায় আর এখানে না পাঠানো। আমার কাছে টেনে নিতে পারলে এখানকার সঙ্গে তোমার সব সম্পর্কই চুকে গেল—তুমি ওখানেই থাকতে পারবে। তোমার মত কি কণা ?"

কণা একমুহূর্ত্ত নীরব রহিল তাহার পর বলিল তোমার সেখানে থাকার কথা আমি কিছু বলতে পারিনে। তোমার যদি আজ মর্য্যাদা বোধ থাকে হবে কখনই শ্বশুর বাড়ীর পালিত জীব হয়ে থাকবে না। আমি এখানে মাঝে মাঝে আসব বই কি ? মেয়েরা যেমন শ্বশুর বাড়ী আসে আমি কেন তা আসব না ? ভগবান যখন আমাকেও মেয়ে করে পাঠিয়েছেন তখন আসতেই হবে আমায়। ভগবানের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যাওয়া তো ঘটবে না। তাঁর বিধান সবগুলো যেমন মেনে নিতে হবে তেমনি শ্বশুর বাড়ী আসার বিধানটাও নিতে হবে। বিয়ে হয়ে গেলে মেয়ের পরে মা বাপের কোনও দাবী থাকতে পারে না। আমায় দান করে এখনও আমায় কাছে রাখার ইচ্ছে তাঁদের সম্পূর্ণ অন্যায়।

বিনয় উজ্জ্বল নেত্রে পত্নীর উজ্জ্বল মুখখানার পানে চাহিয়া রহিল আনন্দে তাহার হৃদয়টা ভরিয়া গিয়াছিল সে তাই কথা কহিতে পারে নাই।

পরদিন সকালে কণা মায়ের কাছে গিয়া জানাইল সে দুই চার দিন এখানে থাকিবে, তাহার পরে পিত্রালয়ে যাইবে।

মা শান্ত মুখে বলিলেন—তা কেমন করে হবে মা?

কণা বিবর্ণ হইয়া গিয়া বলিল—কেন হবে না?

মা বলিলেন—বিনয়কে যে আজই যেতে হবে, ওর ছুটি আর নেই কাল ওকে কলেজে যেতেই হবে।

কণার মুখে হাসি ফুটিল, আঃ, এই কথা? তা যান না উনি, আমাদের বাড়ীতে গিয়ে তো থাকবেন না, মেসে থাকবেন। আমাদের বাড়ী আমি কখনও থাকতে দেব না, তা হলে আমার আর এখানে আসা হবে না, বরাবর একতুয়ারী হয়ে বাপের বাড়ীই থাকতে হবে। না মা, আপনার পায়ে পড়ি, আপনি থাকতে দেবেন না আমাদের বাড়ীতে, তাতে আমার ভারি লজ্জা বোধ হবে। লোকে বলবে গরীব কিনা, তাই বড় মানুষের মেয়েকে বিয়ে করে শ্বশুর বাড়ী থেকে এখনই অবস্থা শুধরাতে সুরু করেছে। না, মা, আমি এ কথা সইতে পারব না আপনারা গরীব, কিন্তু আপনাদের মধ্যে যা আছে তা বড় লোকের মধ্যে নেই; আপনার এই ঘরের ঘরে যা আছে আমাদের অমন বাড়ী খানায় তা নেই। আপনার পায়ে পড়ি মা, আমার এখানে আসা ঘুচাবেন না।

মা বধূকে কোলের মধ্যে টানিয়া লইয়া তাহার সুগঠিত সুন্দর ললাটে একটা স্নেহ চুম্বন দিলেন, চোখের জল উপছাইয়া সে ললাটে পড়িয়া গেল। এই মুহূর্ত্তটীতে তাঁহার মনে হইল জগতে তাঁহার চেয়ে সুখী কে? বড় লোকের একটী মাত্র মেয়ে, তাহাতে সে শিক্ষিতা, তিনি কৃতবিদ্য শিক্ষিত পুত্রের সহিত তাহার বিবাহ দিয়া পুত্রবধূরূপে বরণ করিয়া লইয়াও ঠকাইয়া ছিলেন, সাহস করিয়া কাছে আসিতে পারেন নাই। আজ এই মুহূর্ত্তে মনে হইল তিনি বর পাইয়াছেন। এ কথা শুলি নারীর যথার্থ উক্তি তিলমাত্র গর্ব্ব ইহাতে নাই।

বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে তিনি বলিলেন "তুমি ঠিক কথাই বলেছ বউ মা, আমি সাহস করে কোনও কথা বলতে পারি নি—"

বাধা দিয়া কণা আর্ত্তভাবে বলিয়া উঠিল "অমন কথা মুখেও আনবেন না মা। আমাদের কাছে আপনি সাহস করে কথা বলতে পারবেন না, ছেলে বউয়ের কাছে আপনি মাথা নিচু করে থাকবেন এ কি কখনও হতে পারে মা? ছেলে আপনার যাই হোক, যত বড়ই হোক, সে চিরকালই আপনার ছেলে থাকবে, আপনার কাছে সেই ছেলে মানুষটি থাকবে আর—"

মা একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন আজ কাল আর সে দিন নেই মা, নতুন দিন এসেছে। আমার ছেলের কথা আমি বলছিনে, যে দুটি বর পেয়েছি সে আমি গর্ব্বের সঙ্গে বলতে পারি। আমার ছেলেরা আজিও মায়ের অনুমতি না নিয়ে কোনও কাজ করে না।"

কণা বলিল তাই আমি বলছি মা আপনি বলুন আপনার ছেলেকে, আদেশ দিন যেন তিনি শ্বশুর বাড়ী না থাকেন, যেন তিনি মেসেই থাকেন। বলুন—আদেশ দেবেন?

বধূর আগ্রহাতিশয্যে শাশুড়ী হাসিলেন "পাগলী মা আমার। আচ্ছা তাই আদেশ দেব, ব'স তো, তুমিও দু চার দিন থাকবে, তারপর যেয়ো, আবার তোমার যখন আসবার ইচ্ছে হ'বে আমায় জানিয়ো আমি প্রণয়কে পাঠিয়ে দেব তোমায় আনতে।"

কথা রহিয়া গেল, বিনয় ছোট ভাই প্রণয়ের সহিত কলিকাতায় চলিয়া গেল। ক্রমশঃ

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—আগামী সপ্তাহ হইতে বাসন্তী কার্য্যালয় ৯নং বৃন্দাবন মল্লিকের লেন, বাগবাজারে স্থানান্তরিত হইল। এখন হইতে চিঠি পত্র, টাকা কড়ি, প্রবন্ধ, বিনিময় পত্রাদি উপরোক্ত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

সুবাসী

শ্রীকৃষ্ণপদ দাস

(১)

এক পেট তাড়ি খেয়ে ছোলা ভাজা চিবোতে চিবোতে উঠানের মাঝে দাঁড়িয়ে মোতে ডাকলে "সুবাসী—সুবাসী—"

দাওয়ায় বসে সুবাসী খেজুর পাতার চেটাই বুনছিল। মোতের ডাকে একটু বিরক্ত হয়ে ঘাড় না তুলেই উত্তর দিলে—'আজ আবার মরতে তাড়ি গিলেছিস্—'

সুবাসীর পাশে বসে ধপ্ করে তার হাতটা ধরে মোতে বললে 'রাগ করলি সুবাসী?'—একটা ঝাঁকানি দিয়ে সুবাসী বললে—'রাগ করে তোর কি করব বল। এত মানা করি, শুনবি না তো কথা,—মর তোর যা খুসী করে—'

'লক্ষীবারের বারবেলা—এই দিন দুপুরে মর মর করে গাল দিস্ না। কি করব বল সরকার বাড়ী হ'তে মজুরীর আট আনা পয়সা নিয়ে যেমন বেরিয়েছি অমনি গোবনে বেটার ছেলে কোথা ছিল বললে 'ওই যে সমন্দি খাইয়ে দাও না। কি করি বল বোনাই হয় আবদার করে ধরলে—'

"ও দিকে নবাবী করি আট আনা পয়সা খরচ করি বোনাইয়ের সঙ্গে খুব আমোদ করি এলি ঘরে যে এদিকে কুকুর কাঁদছে—"

"তুই থাকতে আমার ভাবনা কি বল দেখি সুবাসী? তুই হলি—ওই যে কি বলে আমার কুঁড়ে ঘরের লক্ষী ঠাকরুণ।'

"যা: বকবক করিস না বলে দিচ্ছি অমন যারা করলে আমিও দেখিস কারুর সঙ্গে চলে যাব।'

'না তোর দিব্যি বলছি সুবাসী দেখিস্ কাল হতে কোন বিষয়ে ও ছাই পাশ খায়।'

'খুব হয়েছে যা আর তোর দিব্যিতে কাজ নেই, তুই তোর গরবীকে নিয়ে মনের সুখে ঘর করিস—আমি আপনার মনে চলে যাব।'

'এই তোর মাথার হাত দিয়ে দিব্যি করছি গরবীর কাছেও আর যাব না—যাই তো নিজের মাথা খাই।'

'আচ্ছা দেখব তোর কেমন দিব্যি। পয়সা কড়ি কিছু আছে যে।"

মোতে মহা ফাঁপরে পড়ল। আজকার মুজুরীর আধলাটী পর্য্যন্ত সে তাড়ি খেয়ে—উড়িয়েছে। কি জবাব দেবে ভেবে না পেয়ে—খানিক চুপ করে থেকে বললে—'দেখ, সোঁসাই বাড়ীর চোদ্দ আনা পয়সা বাকী আছে তেনারা আজ দিলে না লক্ষীবার বলে।'

'পয়সা না আনলে আজ ঐ ছোলা খেয়েই কাটাতে হবে।'

আশ্চর্য্য হয়ে মোতে বললে 'কানে তুই রাঁধিস নি?'

'ঘরে কি একখানা চাল আছে। হাঁড়ি চড়বে কোত্থেকে?'

'সত্যি সুবাসী কিচ্ছু নেই?'

মোতের খিদের পেট জ্বলছিল—'এক মুঠো হাঁড়ি কুড়িয়ে বাড়িয়ে হবে না?'

'না গো—হাঁড়ি সত্যি সত্যি আজ চড়ে নি।'

'তুই খেলি কি?'

'হাওয়া আর কি।'

মোতের নেশা ছুটে গেল—ধপাস করে দাওয়ার উপর বসে মনে মনে বললে 'সত্যিই তো অন্যায় করেছি—শুধু শুধু একটা প্রাণীকে উপোষী রেখেছি। —না কাল হ'তে কিছুতেই—প্রাণ গেলেও সে একটী পয়সা খরচ করবে না—কারো সঙ্গে মিশবে না।

(২)

হাড়িপাড়ার মাঝে রায়গড়ের পাড়ে মোতে ডোম তার স্ত্রী সুবাসীকে নিয়ে তালপাতার ছাওয়া ছোট কুঁড়ে ঘরে বাস করত। মোতে ঘর ছাইতে পারত তাইতে. তার মজুরি দিন গেলে দুবেলা খোরাকী আর নগদ দু সিকে। আবার মরসুম পড়লে মজুরী চোদ্দ আনা পর্য্যন্ত উঠত। বর্ষার সময় ঘর ছাওয়ার কাজ যখন বন্ধ থাকত তখন সে বাঁশ হ'তে ঝুড়ুনি—কুলের চাঙারী, ডালি পেতে খাবারের ঢাকনা তৈরী করত—গাঁয়ে ও পাশের গাঁয়ের হাটে তাই বিক্রী করে ও বেশ দু পয়সা পেত। সুবাসীও বসে থাকত না,—সেও তালপাতার—খেজুর পাতার চেটাই, টোকা, পেখে বুনত, সে-গুলোও বেশ ঘরে বিক্রী হত।

দুজনের যা উপার্জ্জন হত তাতে সংসার চালিয়ে কিছু কিছু জমা হতে পারত। কিন্তু জমা চুলোয় যাক দিন দিন মোতের দেনা হচ্ছিল। সে যা উপায় করত তাড়িতে মদে সব উড়িয়ে দিত উল্টে গুঁড়ীর দোকানে টাকাটা সিকেটা ধার রেখে আসত। তার আর এক রোগ ছিল—সেটী হচ্ছে গরবীর ঘরে যাওয়া। গরবী কুলো বাগ্দীর বোন। অল্প বয়সে সে বিধবা হয়। স্বামীর ঘরে তাকে আদপেই যেতে হয় নি ভাইয়ের ঘরেই আজন্মকাল আছে। ছোট বেলায় মতি ক্ষেতু ঘোষের বাড়ী রাখালের কাজ করত। গরবী তখন তাদের বাড়ী ঝিএর কাজ করত। সেই সময় তাদের দুজনের আলাপ হয়।

* * * *

মোতের শরীর ঝিম ঝিম করছিল। সকালে সে অবশ দেহটাকে কোন মতেই বিছানা হ'তে টেনে তুলতে পারছিল না। সুবাসী উঠানে 'ছড়া' দিতে দিতে ডাকলে—ওই এখনো উঠ্‌ল নি যে বড় কোন সকালে ভেকে দিয়েছি।

মোতি আর একবার চেষ্টা করলে—সমস্ত দিন রাতটা তাড়ী আর ছোলা ভাজা খেয়েই কেটেছে—অনাহারে তার খোয়ান দেহটাকেও কাবু করে দিয়েছে। সুবাসীর মুখের দিকে কাতর দৃষ্টি ফেলে বললে আজ আর পারি না সুবাসী।

ক্ষুব্ধ স্বরে সুবাসী বললে পারবিনাত খাবে কি? যানা তোর সেজাৎদের কাছে, আর দু'গেলাস তাড়ী গিলে এলেই গায়ে জোর পাবে এখন।

সুবাসীর তিরস্কারে মতের মনটা তিক্ত হয়ে গেল, চিরকালটা সেই তাকে শাসিয়ে আসছে—অবাধ্য হলে দুচার ঘা কড়া মিঠে দিতেও সে কসুর করেনি আজ কিনা সমস্ত বুকে সুযোগ পেয়ে তাকেই সে বেশ দুকথা শুনিয়ে দিলে—আচ্ছা এর শোধ নেব একদিন মনে রইল। গা ঝাড়া দিয়ে উঠে মোতে ময়লা গামছা খানা কাঁধে ফেলে—কোলকের আগুন দিয়ে টানতে টানতে কাজে গেল।

মজুরীর আট গণ্ডা পয়সা চেঁকে গুজে মোতি ভাবতে লাগল—কোথা যাব—বাড়ী না গুঁড়ী বাড়ী। রাত্রের অনাহার সমস্ত দিনের কঠোর খাটুনী মোতের শরীর আর বইছিল না। আজ আর তাড়ীতে হবে না, একটু খাঁটি পেটে না পড়লে সোজা হতে পারবে না। কিন্তু গুড়ী বাড়ী গেলে আট আনায় কি হবে, যদি আর কেউ জোটে। না তাড়ীই ভাল।

শরণ মুদী পথে ডাকলে—মতিলাল—ওই মতিলাল।

ব্যাজার স্বরে মোতি উত্তর দিলে—কি গো দোকানী কত্তা—

'তুমি ত দোকান আমার ছেড়ে দিয়েছ—'জিনিষ পত্তর তো—কিছুই নাও না। তা বলে কি আমার সঙ্গে দেখা করতেও মানা আছে?'

'না তা নেই।'

'তাও তো কোন দিন দেখলুম না।'

'এবার হ'তে আপনার দোকানেই জিনিষ নেবো কত্তা।'

'তা তুমি যেখানে সুবিধা পাও নাওনা তাতে আমার দুঃখু নেই তবে কথাটা শোন, আমার ঘরটীতে বাস করা তো অসাধ্য হয়েছে। মনে করে-ছিনু--গোঁজা গাঁজা দিয়ে এবছর চালবো—'

বাধা দিয়ে মোতে বললে 'সেতো হবেনা কত্তা আমি সরকারদের ঘর ভেঙেছে—'

'বেশতো ওদের আগে সারনা—তারপর একদিন হবে আমার—'

'ওনাদের হ'লে গোঁসাই মা বলে রেখেছে—'

'আচ্ছা আজ এই ৫৲ টাকা আগাম রাখো তোমার খরচ চালিও, তারপর একদিন সময় মত আমার ঘরটা সেরে দিও।'

কাহার টাকা পাঁচটা নেবে মতিলাল দুহাতে প্রণাম করে বোল্লে—'তা দেবো ওনাদের—হলেই আপনার—'

'হোঃ হোঃ মনে থাকলেই হলো—মনে থাকলেই হলো, বলে—মরণ তার চোদ্দপুরুষ উদ্ধার করতে করতে বাড়ী চল্‌ল। আর মতি আহ্লাদে ভরা মনটা নিয়ে শুঁড়ী বাড়ীর পথ ধরল।

(৩)

শুঁড়ী বাড়ী হ'তে যখন বেরুল তখন সে দস্তুর মত তৈরী। হাটতলা এসে বিশু মোড়লের দোকান হতে ৩৸৵১০ দিয়ে একখানা চওড়া পাড় পাড় সাড়ী নিয়ে নেবলে তখন তার টেকে মজুত মোট ১।৵১০ আনা। একটু ইতঃস্তঃ করে মোড়ল মশাইয়ের মুখের পানে চাইতেই চতুর মোড়ল মশাই আরও কিছু বুঝতে পেরে—প্রসন্ন মুখে বললেন—কিরে মতি আরও কিছু চাই নাকি?

"হ্যাঁ দরকার ছিল এক শিশি ভুলল তেল আর—।"

হাসি মুখে মোড়ল মশাই বললেন—ভুলল তেল আর কি?

পয়সা তো এই আছে এই একটা টাকা আর কতগুা পয়সা এতে তো হবে না।

আঃ পয়সা না থাকে দিয়ে যাস একদিন—না হয় ঘরই ছেয়ে দিস একদিন তার কি—

'না কত্তা তুমি ওই দাও'

মোড়ল মশাইয়ের দোকানে বহুদিন হতে দু'শিশি নিকৃষ্ট তেল পচ্ছিল। শিশির গায়ের ধুলো ঝুল ঝেড়ে মোতের হাতে দিয়ে বললেন—আর এই সাবান এক বাক্স আছে খুব ভাল—জলে ভাসা এইটে নিয়ে যা—।

'তাই দাও কিন্তু—

সে ব্যাটা বকতে হবে না। তাহলে তোর দাম হ'ল গিয়ে ৸৹ আনা আর সাবানের দাম সাড়ে বার আনা তা তুই না হয় ছটো পয়সা কম দিস যাঃ—

'বাকি কত রইল মোড়ল মশাই' বলে তেলের শিশিটা আর সাবান বাক্সটা গামছায় বেঁধে—মতি উঠে দাঁড়াল।

আজ যা—সে একদিন হিসেব হবে এখন—বেশী আর কি?

"আমারে আসতে বলে।" গাইতে গাইতে মোতি গরবীর ঘরে ঢুকল।

বাগ্দী পাড়ার দুলোদের বাড়ীর সামনের মাঠে সেদিন মনসার ভাসান হচ্ছিল। মোতি ডাকলে গরবী পিয়ারী মেরি জান—

আস্তে আস্তে গরবী বল্‌লে 'চেঁচাস্ না দাদা রয়েছে।'

'নেশাটাই মাটী হয়ে গেল।'

ধমক দিয়ে গরবী বললে 'আবার বেয়াদবী করছিস্।'

'রাগ করিসনে গরব এই দেখ তোর জন্তে আজ কি এনেছি' বলে—কাপড় খানা তেলের শিশি সাবানের বাক্সটা তার সামনে রেখে দিলে।

একবার জিনিষ গুলোর দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে চেয়ে গরবী বললে—আজ যা মোতি আমি গান শুনতে যাব—

'তাই নাকি—আমি এত কষ্ট করে তোর জন্যে এখানে এলাম আর তুই—'

মনদা গাছের আড়াল হ'তে হুলো ডাকলে—'গরবী।'

হাবার গলার সাড়া পেয়ে গরবী মতেকে ঠেলে দিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল।

(৪)

মোতের স্বভাবের কোন পরিবর্ত্তন হলো না। সে তেমনই যা উপায় করত তাড়িতে মদে আর গরবীকে দিয়ে শুধু হাতে নবাবী মেজাজ নিয়ে ঘরে ফিরত। সেদিন কাজে যাবার নাম করে বাড়ী হতে বেরিয়ে গিয়ে সোজা গরবীর ঘরে উঠল। শুধু হাত দেখে গরবী বেশ কড়া কড়া দুকথা শুনিয়ে দিলে। 'আ মর মুখপোড়া—আমি কি তোর পরিবার তাই তোর মুখ দেখে চুপ করে বসে থাকব। পয়সা কই দে—'

'আজ আর কাজে যাইনি গরব।'

'তবে আর কি আমার গা জুড়িয়ে দিলে। পয়সা নেই তো এখানে মরতে এসেছিস্ কেনে?'

'তোকে দেখতে।'

'ভাকামিতে কাজ নেই—পয়সা থাকে তো দে, বস তামাক খা—নইলে ঘুর হয়ে যা—'

'দেখ গরব সময় অসময় তোকে কত পয়সা দিয়েছি—সুবাসীকে উপোষ রেখেও তোকে দিয়েছি—'

'তবে আর কি আমায় রাজা করে দিয়েছিস্—ভালয় ভালয় উঠবি কিনা বল ত, দাদা দেখতে পেলে আর রক্ষে রাখবে না।'

ঘুর মনে মোতি বাড়ী ফিরল। সমস্ত রাগটা পড়ল সুবাসীর উপর। তাকে দুচার ঘা দিয়ে বল্লে 'অলুক্ষণে মাগী তোর জন্যে আজ কাজ হলোনা আর—যে পয়সা থাকে তো—'

মার খেয়ে রাগে ফুলতে ফুলতে সুবাসী বললে—'পয়সা তুই কবে আমার কাছে জমা রেখেছিস্ বলত—তাই সময় নেই অসময় নেই—যখন তখন এমনি জুলুম করবি।'

'মিছে রাগ বাড়াস না সুবাসী দে পয়সা, পাঁচ আনা হলেই হবে।'

'এক আধলাও নেই—'

'পয়সা নেই চাল আছে তো।' বলে ঘরে ঢুকতে যেতেই বাধা দিয়ে সুবাসী বললে—'খবরদার চাল নিসনা বলে দিচ্ছি ভাল হবে না।'

'তোর বাবার জিনিষ নিচ্ছি। খুব করব নোব আটকা রেখি কেমন মুরদ।—' সুবাসীর মুখে একটা ঘুসী মেরে হাঁড়ি উজার করে চাল ঢেলে সে নিয়ে বেরিয়ে গেল।

সুবাসীর নাক দিয়ে ঝলকে-ঝলকে রক্ত পড়তে লাগল। সে অসাড় হ'য়ে সেইখানে পড়ে রইল। পড়ন্ত বেলায় ইন্দে এসে ডাকলে—'সুবাসী'।

সুবাসী একবার উঠবার চেষ্টা করলে পারলে না। মাথার ভেতর ঝিম্ ঝিম্ করে মেহটা এলিয়ে পড়ল। ইন্দের মুখের পানে করুণ দৃষ্টি ফেলে সুবাসী বললে—'ইন্দে।'

ইন্দে কতদিন এসেচে কোন দিন এমন আদর পায়নি—রোজই সুবাসী তাকে কুকুরের মত দূর দূর করে তাড়িয়ে দিয়েছে। সুবাসীর আদরে সাহস পেয়ে বললে 'তোর কি হয়েছে রে সুবাসী—পড়ে কেন?"

'অসুখ করেছে।'

অসুখ করেছে না মতে মেরেছে। ওখানে অত রক্ত কেন রে—ওঃ এমনি করে মার খেতে খেতে কোন দিন দেখছি মরে যাবি—তার চেয়ে সুবাসী চল দুজনে পালিয়ে যাই—তোর প্রাণটা ত বাঁচবে।

ইন্দের কথার জবাব কি দেবে সে ভেবে ঠিক করতে পারলে না। ইন্দের প্রস্তাবটা বড় কম নয়—আজ আর সে আপনাকে সামলাতে পারছিল না—রক্তপাতের সঙ্গে তার মনের বলটুকুও যেন সে হারিয়ে ফেলেছিল। ভাবতে গিয়ে সব এলো

মেলো হয়ে গেল। কিছুক্ষণ স্থির থেকে বললে—তুই যা ইন্দে—তোকে একদিন বলব।'

'ভেবে দেখিস সুবাসী—আমার কথাটা যেন মনে থাকে ভুলিস না যেন।'

(৫)

সন্ধ্যা হয়েছে। রায় দীঘির পাড়ের বাঁশঝাড়ে বকগুলো নিজের নিজের যায়গা নিয়ে বেজায় ঝগড়া বাঁধিয়েছে।

মোতি ডাকলে—'সুবাসী।'

উঠানের মাঝে আমড়া গাছটার পানে চেয়ে সুবাসী কি ভাবছিল—মোতির ডাকে উঠে কাছে এসে বললে—'কি বলছিস।'

'একটু জল দে।'

'জল দিতে যে কবরেজ মানা করেছে।'

'শুকিয়ে মরলি সুবাসী, দে একটু—এক ফোঁটা গলাটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে—দে একটু জল—'

সুবাসী একটা পিতলের গেলাসে জল নিয়ে মোতির মুখের কাছে ধরতেই তার হাত হ'তে গেলাসটা টেনে নিয়ে—এক নিশ্বাসে জলটা শেষ করে—আঃ বাঁচালি—বলে একটা তৃপ্তির নিশ্বাস ছাড়লে।

আজ আট দশ দিন মোতি বিছানা নিয়েছে—উঠবার শক্তি নেই। অসুখ ক্রমেই বাড়ছে দেখে সুবাসী বড় চিন্তিত হয়ে পড়ল। ঘরে এমন একটী পয়সা ছিলনা যা দিয়ে সে স্বামীর চিকিৎসা করায়। গায়ের যা দুই একখানা গয়না ছিল তাই বাঁধা দিয়ে আজ কয়দিন কবিরাজী চিকিৎসা করাচ্ছে। ঘরের ঘটী, বাটী, থালা একে একে সব বাঁধা পড়ল—। রোগ কিন্তু এতটুকু কমল না। সুবাসী মহা ভাবনায় পড়ল। মোতির নিতারে কোড়া।

ইন্দে আজ কদিন তার সাহায্য করছিল। ওষুধ আনা পয়সার সংস্থান করা রান্না খাওয়ার ব্যবস্থা—সবই করছিল। এ কাজে তার অনেকখানি আনন্দ ও উৎসাহ ছিল। তার এই অযাচিত সাহায্য সুবাসী প্রথমটা নিতে আপত্তি করেছিল—ক্রমে অভাবে পড়ে নিতে বাধ্য হ'ল। অসময়ে তার এই সাহায্য অনেকখানি উপকার করেছিল—সুবাসীর মনটাও অনেক খানি নুইয়ে পড়েছিল তার দিকে। কপাল মন্দ মোতি ও যাত্রা রক্ষা পেলে না।

* * *

সুবাসীর দিদি বাসিনী এই দুর্ঘটনার সংবাদ পেয়ে তাকে নিতে এল। সুবাসী সেই দিন হ'তেই শয্যা নিয়েছিল। বাসিনী দিনরাত বোনের সেবা করতে লাগল আর ইন্দে—সেও প্রাণপণ করে সুবাসীর জন্যে বাসিনীর সাহায্য করতে লাগল। কদিন সুবাসী অঘোরে পড়ে রইল। জ্বরের ঘোরে সে কখন বলত—'বড্ড দেখেছে মাথায় পটি বেঁধে দিই—আবার কখন বা ব্যস্ত হয়ে বাসিনীর হাত দুটো ধরে বলত—

এতখানি রাত হ'ল এখনও তো সে ফিরল না। দুই দরজা খুলে রাখ দিদি যদি আমরা ঘুমিয়ে পড়ি ডেকে সাড়া পাবে না। আবার কখন বা ক্রোধে গর্জ্জন করে বলত 'সেখানে গিয়েছিলি কেনে। তুই থাক ওকে নিয়ে—আমি ইন্দের সঙ্গে চলে যাব।' আবার কখন কেঁদে মার্জ্জনা চাইত—'আমি যে বুঝতে পারি না তুই অমন করিস কেনে। আর কখন করব না তুই যাবি চল।'

এমনি করেই—কাটতে লাগল। বাসিনী সব কথা বুঝতে পারত না—ইন্দে বুঝত সব। মনে মনে সে বললে—যা সুবাসী তোকে আমি রাখতে পারব না। ভগবান তোকে মোতের পাশে জায়গা দিন।

সেদিন সকাল হতে সমস্ত দিনমানটা বেশ কাটল। বাসিনী ডাকলে সুবাসী তার নিষ্প্রভ চোখ দুটো তুলে ক্ষীণকণ্ঠে বললে 'কি ?'

'আমাদের ঘরে চল বোন আমি তোকে নিতে এসেছি।'

'যাব ভাই যাই আগে।'

দিনের আলো ধীরে ধীরে নিভে আসছে—ছাতিম গাছের উপর একটা ঘুঘু ডেকে ডেকে ক্লান্ত হয়ে চলে গেল।

সুবাসী ডাকলে—'দিদি।'

ব্যস্ত হয়ে বাদিনী বললে—'কি?'

'শুনতে পাচ্ছিস—'

'কি?'

'আমায় ডাকছে—

'কে?'

'তার বড় কষ্ট হচ্ছে কিনা তাই সে আমায় ডাকছে।'

"আমি যে তোকে নিতে এসেছি—বোন্।"

"আমি যে চলিছি দিদি।"

বেলা শেষের আলোটুকু নিভে গেল। সুবাসী দেখলে মতি যেন তাকে হাসি মুখে ডাকছে। মরণ যাতনার মধ্যেও সুবাসীর মুখ শান্তির হাসিতে ভরে উঠল।

কবি ও সুন্দরী

"কথিকা"

শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায় বি-এ

কবি ও সুন্দরীর সঙ্গে দেখা—সে এক বসন্তের প্রভাতে আর এক "মধুকর নিকর করম্বিত কোকিল কূজিত কুঞ্জ কুটীর" তার মাঝখানে। তখন সুরভি বিভোর বায়ু ঝির্ ঝির্ করে বয়ে' সুন্দরীর চূর্ণ কেশ কলাপকে হিল্লোলিত করে তুল্‌ল—সুন্দরীর হাতের কাঁকণ বেজে উঠ্‌ল তার রাঙা ঠোঁট দু'খানি কেঁপে উঠ্‌ল—তার বুকের হার ও কাণের দুল দুলে উঠ্‌ল তার চীন বাস উতলা হ'য়ে উঠ্‌ল—তার আঁখি দুটি কবির মুখে জড়িয়ে এল—তার 'দুধে আলতা গোলা গায়ের রংটি কিলিক্ দিয়ে উঠ্‌ল—সুন্দরী সঞ্চারিণী লতার ন্যায় লীলায়িত গতিতে কবির দিকে এগিয়ে আস্‌তে লাগল—কি যেন একটা আকর্ষণ তাকে চুম্বকের মত টেনে নিয়ে এল।

কবি সুন্দরীকে সম্বোধন করে' মৃদু স্বরে জিজ্ঞাসা কর্‌ল—কি চাও?

সুন্দরীর দুটি গাল রাঙা হ'য়ে উঠ্‌ল। সে ঈষৎ কটাক্ষ করে—নীচের দিকে চেয়ে—অতি সলজ্জ ভাবে—ধীরে ধীরে উত্তর কর্‌ল—"প্রিয়তম, তোমাকে।"—কে যেন তানপুরার তারে মৃদু আঘাত কর্‌ল।

কবি তার বাঁশীটী হাতে নিয়ে আত্মবিস্মৃতের ন্যায় চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

অনেকক্ষণ পরে সুন্দরী আবার জিজ্ঞাসা কর্‌ল—এবার যেন তার স্বর কিঞ্চিৎ রুদ্ধ—"তবে কি তুমি আমাকে চাও না?

কবি এবার মৃদু হেসে বল্‌ল—"ঠিক তোমাকে কিনা বল্‌তে পারি না।

সুন্দরী যেন একটুকু দুঃখিত হয়ে আবার জিজ্ঞাসা করল—তবে তুমি চাও কি?

কবি—আমি চাই কি? আমি চাই—তোমার রুক্ষ কেশের হিল্লোলটুকু—তোমার কাঁকণের সুরটুকু—তোমার রাঙা ঠোঁটের কম্পনটুকু—তোমার

গায়ের ও ফুলের সোণটুকু—তোমার চীনাকলের চাকচাটুকু—তোমার আঁখির মণির স্বচ্ছটুকু—তোমার লীলায়িত গতিটুকু—আর তোমার মধুর আকর্ষণ টুকু—

সুন্দরী—আর কিছু না।

কবি—বোধ হয় —আর এমন কিছু না।

সুন্দরী—বেশ, তবে তাই হ'ক।

—এই বলে সুন্দরী পলকের মধ্যে কোথায় মিশিয়ে গেল। আর কবি সুন্দরীর মূর্ত্তিটী নিয়ে আবতোলার মত—আপন মনে—চারদিক কম্পিত করে বাঁশী বাজিয়ে বেড়াতে লাগল।

লক্ষ্মী-শ্রী

শ্রীসুধা দেবী

চামড়ার উপর প্রায়ই মাঝে মাঝে দাগ পড়ে যায় সেগুলি সহজে যায় না। যদি একটু তেল্‌লিন ঘসে দেওয়া যায় সেই জায়গায় তবে শীঘ্রই সে দাগ একেবারে উঠ যাবে।

● ● ●

ইস্ত্রী করবার সময় মধ্যে মধ্যে কাপড়ে একটা দাগ ধরে যায় ঠাণ্ডা জলে কাপড় খানা একদিন ভিজিয়ে রাখলে সেই দাগ উঠে যাবে।

● ● ●

রেশমী কাপড়ে কালীর দাগ তুলতে হলে সেই স্থানটী গরম দুধে ধুয়ে ফেলা উচিত।

● ● ●

কাঠে উই ধরলে বেশ করে পেরাফিন মাখাতে হয়।

জানা দরকার

চীনে যে বিরাট প্রাচীর আছে সেটা তার শাখাপ্রশাখা নিয়ে দৈর্ঘ্যে প্রায় ৩৯৩০ মাইল।

● ● ●

আইসল্যাণ্ডে পুরুষদের সঙ্গে পরস্পর দেখা হ'লে চুম্বন করে। কিন্তু স্ত্রীলোকদের মুখ চুম্বন করা সেখানে সহজ নয়।

● ● ●

আমেরিকার যাত্রী গাড়ীগুলি আজকাল ঘণ্টায় ১১২ মাইল হিসাবে যায়।

বিনা টিকিটে কি রকম করে রেলগাড়ী চড়া যেতে পারে, তার শিক্ষা অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির ক্লাবে দেয়।

● ● ●

হাতীর পাঁজরার অস্থি সংখ্যা ছুড়িটী।

● ● ●

কাঙ্গারু ৭০ ফুট লাফাতে পারে।

● ● ●

আধ সের কর্কের সাহায্যে একজন মানুষ ভাসতে পারে।

৪০ বৎসর বয়সে হস্তী পূর্ণবয়স প্রাপ্ত হয়।

● ● ●

বাজের আলো সাধারণ বৈদ্যুতিক আলোর চেয়ে ৪০০০,০০০ গুণ বেশী।

● ● ●

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে পৃথিবীর লোক সংখ্যা ছিল ৭০০ কোটী আর এখন হচ্ছে ১৬৮০ কোটী।

● ● ●

চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে পৃথিবীতে মাত্র একটী টেলিফোন ছিল আর এখন গ্রেটব্রিটেনেই ৯৯৪২৪২ আছে।

● ● ●

ভারতে টেলিগ্রাফের কাজ হয় ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে।

● ● ●

ব্যাঙ্ক অফ ইংলণ্ডের মূলধন ১৪৪৫২০০০ পাউণ্ড।

ইয়োরোপে ৬৮০০ রকম ফুলের চাষ হয় তার মধ্যে ৫৮৮০ রকমের ফুলে কেবল খারাপ গন্ধ ২৩০০ রকমের গন্ধ নেই কেবল ৪২০ রকমের গন্ধ মিষ্টি।

● ● ●

কলিকাতার পুলিসের সৃষ্টি হয় ১৭০৪ খৃষ্টাব্দে।

● ● ●

মানুষের ফুসফুসের মধ্যে ১৭৪ মিলিয়ান ছোট ছোট ছিদ্র আছে।

● ● ●

পৃথিবীতে এক জাতীয় মৌমাছি আছে যাদের মধু খেলে মানুষে মরে যায়।

● ● ●

১৬৬৫ খৃষ্টাব্দে ৭ই নভেম্বর সংবাদ পত্র প্রথম বাহির হয়।

● ● ●

অষ্ট্রেলিয়াতে সর্ব্ব প্রথম পোষ্টকার্ড ব্যবহার হয়।

সদ্ব্যবহার

শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী

(তুলসী দাস)

যে তোমার প্রাণে কণ্টক বোনে,
তুমি তার প্রাণে বুনিও ফুল,
তোমার ফুল সে ফুলই রহিবে,
তার প্রাণে হবে শাণিত শূল।

ব্যতিক্রম ! ব্যতিক্রম !
আগামী সংখ্যা বাসন্তীতে সুপ্রসিদ্ধ লেখক শ্রীযুক্ত রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের
ব্যতিক্রম সমাপ্ত হইবে।

ষোড়শী

শ্রীমণীন্দ্রনাথ ঘোষাল

রমেশ পড়ত কাই ক্লাসে। কবিতা লেখার ঝোঁক যে একটু আধটু ছিল না তাও না, তবে কি না কবিতা সব সময়ে মিলত না এই যা দুঃখু। তা হ'ক রমেশ যে দিন একটী ষোড়শীর রূপ বর্ণনা করতে গিয়ে লিখল—

আঁকা বাঁকা নয়ন দুটী
দৃষ্টিটুকু মাটীর পর।
তোমার চুলের গন্ধ পেয়ে
তোমরা ওড়ে নিরন্তর।
মুখটী তোমার হাসি ভরা
কাপড়খানি ঢাকে বুক।
বুঝি তাহার অকলেতে
কিবা দুটী সুকোয় মুখ।

ইত্যাদি—ইত্যাদি

রমেশ ভাবল কি সুন্দর হয়েছে। তার আজ এই প্রথম 'সাকসেস্'। তার চোখে একটু একটু জল এল। ভাবল সত্যি কি কেউ এমন সুন্দর হবে! যতই পড়ে ততই আরো লিখবার ইচ্ছা হয়। সে কলম বাগিয়ে প্রায় তিন পাতা লিখে ফেলল। যখন সে বুঝল আর কোন পয়েন্ট্ই তার মনে আসছে না, তখন নিরস্ত হয়ে কলমটাকে টেবিলে রেখে, কবিতাটী একবার আগাগোড়া পড়ে নিল। তার প্রাণটা এক অজানা আনন্দে ভরে গেল। ভবিষ্যত তার কাছে উজ্জ্বল হয়ে উঠল, সে দেখতে পেল, গোলাবরীতে তার কবিতার সমালোচনা বেরিয়েছে—সমালোচনায় লেখা আছে—রমেশবাবু মরেন্দ্রবাবুর উপযুক্ত শত্রু—মরেন্দ্রবাবু চিত্রাঙ্কনে ষোড়শীকে যত না সৌন্দর্য্য দিতে পেরেছেন, রমেশ বাবু কবিতায় তা সক্ষম হয়েছেন। মানস-পটে রমেশ কত কি যে দেখে নিল তার ঠিক নাই তবে কি না বুকটা, আর তার সঙ্গে সঙ্গে উদরও কিসে যেন ভরে গেল।

লেখা ত হল, এখন সে প্রথম কবিতাটা রাখবে কোথায়। এই ভাবনা তার মাথায় ঢুকে পড়ল। একবার রাখে বিছানার তলায়, একবার রাখে বাক্সে, একবার রাখে বইয়ের ভেতর। যদি কেউ দেখে ফেলে, আর যদি সে কথা তার দাদার কানে উঠে—তাহলে দাদা যে একটী ষোড়শী এনে দেবেন না এটা ঠিক, বরঞ্চ ষোড়শীর নাম পর্য্যন্ত একেবারে ভুলিয়ে দেবেন। আর দেখবার মধ্যে শুধু তার ছোট বউদিটী, সে তার সব কবিতাই পড়ে কি না। যা হোক সে ঠিক করলে যে আজকে কবিতাটা কোথাও লুকিয়ে রেখে, কাল সকালে উঠে মুখস্থ করবে তার পর কবিতাটাকে পুড়িয়ে ফেলবে। এই না ভেবে সে কবিতাটাকে বালিসের তলায় রেখে দিল। তার প্রাণটা যেন কতটা হাল্কা হল।

ঘুম ত হল না। সে ভাবতে লাগল—তার কবিতা বর্ণিত ষোড়শীটী কেমন! সেদিন গঙ্গার ঘাটে সে একটী মেয়েকে দেখেছিল, তারও বয়স প্রায় ষোল, চোখ দুটী মাটীর দিকে। তার কথা মনে করেই রমেশ এক অজানা 'লভে' পড়ে গেল। তার মনে কতকগুলি লাইন জেগে উঠল।

শুধুই পেয়েছি দেখা কথা বলিনি।
ভাল তোকে বাসি আমি হে ঘাট শোভিনী॥

মুহূর্ত্তমধ্যে রমেশ তাহাকে ভালবাসিয়া ফেলিল। তার বাসনা কি পূর্ণ হবে! সে ঠিক করল কোন মতে মেয়েটীর সঙ্গে দেখা করে তারপর ভাব করবে। সে মেয়েটীকে ভালবাসে আর মেয়েটী কি তাকে বাসেনা। সে আরও ঠিক করল, কালকে সে মেয়েটীর জলের ঘড়াটা, তার কাঁকে উঠিয়ে দেবে। তারপর তার সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে সে বলবে, যে ওগো! মুখ তুলে চাও—তোমায় যে আমি বড় ভালবাসি।

তার একটু তন্দ্রা এল। তার একটু পরেই

সকাল হল। তাড়াতাড়ি উঠে একটু তেল মাখায় দিয়ে, গামছাটা কাঁধে ফেলে রমেশ ছুটল গঙ্গার দিকে। তার মনে কতকগুলি লাইন জেগে উঠল।

কি মধু প্রাণের টান!
কোথায় ছুটেছি, উদ্দেশে কার, গাহিতা প্রেমের গান!

কোন দিকে না চেয়ে, উর্দ্ধশ্বাসে রমেশ গঙ্গার দিকে ছুটেচে। দুটী লোককে ধাক্কা দিয়ে, একটা গাড়ীর তলায় পড়তে পড়তে বেঁচে, দুটা হোঁচট খেয়ে, হাঁপাতে হাঁপাতে রমেশ ত গঙ্গার ঘাটে পৌঁছিল। সে কিন্তু কবিতাটী সঙ্গে করে আনতে ভোলেনি। কারণ সেইটুকুই যে তার জয়পত্র।

তাড়াতাড়ি সে একবার চারিদিকে চেয়ে নিল। কই তার বাঞ্ছিত বস্তুত সে দেখতে পেলনা। আবার সে চাইল। সে দেখতে পেল, তার সে ষোড়শীটী জল থেকে মাথা তুলেছে, এতক্ষণ বোধ হয় ডুবে ছিল। তাকে দেখে রমেশের বুক থেকে খানিকটা নিশ্বাস বেরিয়ে গিয়ে তার প্রাণটাকে বেশ হাল্কা করে দিল। সে তখন ঘাটের একটা সিঁড়ির উপর বসে পড়ল। তারপর কবিতাটা বার করে সে তার কবিতার ষোড়শী এবং গঙ্গার বক্ষে ষোড়শীটীর রূপ মিলাতে চেষ্টা করল। অনেকটা যেন মিলছে, একই যেন! তার আনন্দ আর ধরে না। এখন কি করে যে সে নিজেকে পরিচিত করবে এই ভাবনা তার মাথায় ঢুকে পড়ল। সে হঠাৎ মৃগের মত লাফিয়ে গিয়ে জলে পড়ল, তারপর একটু সাঁতার কাটল—ভাবল যাই তার কাছে কিন্তু দ্বিধা ও সঙ্কোচ তার পা দুটোকে জড়িয়ে ফেলল। জলে দাঁড়িয়ে খানিকটা পা ঘসে নিতে নিতে রমেশ বার বার মেয়েটীর দিকে চাইল। ষোড়শীটীও তার মুখে ঠিক পাঁচবার দৃষ্টি বিনিময় করল। রমেশ ভাবল, একটা আকর্ষণ ত আছে—অমনি কয়েক লাইন কবিতা তার মনে এসে পড়ল—

প্রেমের আকর্ষণ

দৃষ্টি আমার চুম্বক সম টানল তোমার মন।

ষোড়শীটীর সঙ্গে কাউকে না দেখে রমেশ বুঝল তার ভাগ্য সুপ্রসন্ন। তারপর সে দেখল মেয়েটী ধীরে ধীরে সিঁড়ির ধাপে উঠে, তার ঘড়াটা কাঁকে উঠাতে চেষ্টা করছে। অমনি রমেশ ডলফিনারএর মত লাফিয়ে গিয়ে মেয়েটীর কাছে গিয়ে বলল "আপনি পারছেন না, দিন আমি নিয়ে যাচ্ছি।" মেয়েটী তার দিকে একবার চেয়েই ঘড়াটা সমর্পণ করল। রমেশের মনে অমনি জেগে উঠল—

যেমন করে ঘড়াটাকে করিলে অর্পণ।
তেমন করে করবে কি গো মন সমর্পণ॥

রমেশ ঘড়াটা হাতে লইয়া কহিল "আপনাদের বাড়ী।" মেয়েটী উত্তর করল "গোস্বামী লেনে।" আপনার নাম। মেয়েটী বলল "রমা।" অবনত মস্তকে মেয়েটী জিজ্ঞাসা করল "আপনার নামটী কি জিজ্ঞাসা করতে পারি কি?"

আর ইতঃস্তত না করে রমেশ আবেগে বলল "সত্যি সত্যি বলব তবে রমা—আমার নাম ঠিক তোমার স্বামীর নাম হবার উপযুক্ত—সে প্রবল বেগে রমাকে বক্ষে টেনে চুম্বন করল। চুম্বন করতে সে অনুভব করল, রমার মুখে যেন গোঁফ রয়েছে। কিন্তু তাতেও নিরস্ত না হয়ে রমেশ তার গালটী উপর্যুপরি চুম্বনেতে ভরিয়ে দিল। আর রমা কি না, তার ঠোঁটটা কটাস্ করে কামড়ে দিল। স্বপ্ন ভাঙ্গতে চোখ মেলে দেখল তার পুঁথি বেয়ারাটা তখনো তার ঠোঁটে কামড়ে রয়েছে। সে বিছানায় শুয়ে।

মার্কিন নর্ত্তকী মিস্ ভ্যাণ্ডা হফ্

প্রসিদ্ধ পল হোয়াইট্‌ম্যান অরচেষ্ট্রা কোম্পানীর পরিচালক ও মালিকের স্ত্রী ইনি। সমগ্র ইওরোপে ইঁহার নৃত্যের খ্যাতি পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। বিশ্ব বিখ্যাত অরচেষ্ট্রা কোম্পানীর পরিচালনে মিস্ ভ্যাণ্ডা স্বামীর প্রধান সহায়।

অগ্রহায়ণ — ৩৪

আলোচনা

ভারতের নব জাগরণের নেতা মহাত্মা গান্ধী ক্রমশঃ আরোগ্যলাভ করিতেছেন। তাঁহার ক্ষত প্রায় শুকাইয়া গিয়াছে, আর ভয়ের কোন কারণ নাই—তাই ডাক্তার ম্যাডকের অনুমতি ক্রমে তিনি হাঁসপাতালের বাহিরে আসিয়াছেন। দেশবাসী জীবনের সহস্র প্রকার বন্ধন দশা হইতে মুক্ত হইতে চাহিতেছে—মহাত্মা জাতীয় জীবনের বন্ধন মুক্তির পথ প্রদর্শক—তাই দেশ কার্য্যের অগ্রণী নানা দলই মহাত্মার পরামর্শ লাভের জন্য তাঁহার সঙ্গে দেখা করিবার জন্য উদ্‌গ্রীব। এই জন্য স্বাস্থ্য লইয়াও মহাত্মা সাধ্যমত জাতীয় নেতাদের সঙ্গে দেখা করিতেছেন, জাতির কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ সম্বন্ধে পরামর্শ করিতেছেন। লেখা পড়ার কার্য্যও মহাত্মা সাধ্যমত করিতেছেন। মহাত্মার কারাগমনের পর হইতে মুক্তি পর্য্যন্ত এই দুই বৎসর কালের মধ্যে দেশের অবস্থা অনেকটা পরিবর্ত্তিত হইয়াছে দেশবাসী জীবন পথের পরিবর্ত্তন চাহিতেছে, কিন্তু পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া তাহারা উন্নতির পথেই যাইতে চাহিতেছে, জীবনের অনন্ত দুঃখ কষ্টের লাঘব যাহাতে হয় তাহাই চাহিতেছে? দেশে যে পরিবর্ত্তন মহাত্মার পথ নির্দ্দেশে আসিতে পারে দেশবাসীর সে বিশ্বাস ও আশা আছে। তাই মহাত্মার কর্ম্মপন্থার নির্দ্ধারণ দেখিবার জন্য দেশবাসী উদ্‌গ্রীব হইয়া আছে।

● ● ●

নিদারুণ অভাব হইতেই আমাদের দেশের পারিবারিক, সাংসারিক, রাজনৈতিক জীবনে আজ এত অশান্তির সৃষ্টি হইয়াছে। অভাবগ্রস্ত দেশবাসীর ঘরেও শান্তি নাই বাহিরেও শান্তি নাই। যেখানে সে যায় সেই খানেই তীব্র হাহাকার তাহার সঙ্গে সঙ্গে যায়। অভাবে জীবনের সুখ শান্তি আনন্দ সব হরণ করিয়া লয়। মানুষকে নীচ স্বার্থপর মনুষ্যত্ব বর্জ্জিত করিয়া ফেলে। আমাদের ব্যক্তিগত, সামাজিক, রাজনৈতিক জীবনের ব্যর্থতার কারণও এই অভাব। অভাব দূর করিয়া মানুষের জীবনের স্বাভাবিক সুখ স্বাচ্ছন্দ্য আনিবার জন্য যে সংগ্রাম যে আয়াস যে কর্ম্ম ক্ষমতা প্রয়োজন তাহাও আমরা জীবনে ফিরাইয়া আনিতে পারিতেছি না। যে দেশের মাটিতে সোনা ফলে সেই দেশের লোকেই অনাহারে—অভাবে সব দেশের চেয়ে বেশী মরে, যে দেশে নদ নদীর সংখ্যা নাই সেই দেশেই জল জল করিয়া লোকে তৃষ্ণায় বুক ফাটিয়া মরে—অদৃষ্টের এর চেয়ে বড় পরিহাস আর কোন দেশে বোধ হয় চলিতেছে না।

● ● ●

সমস্ত দেশময় আজ কিছুদিন যাবৎ একটা উদ্দেশ্য বিহীন চাঞ্চল্যের ভাব দেখা যাইতেছে। কংগ্রেস, কনফারেন্স, হিন্দু মুসলমান সমস্যা ইত্যাদি অনেক বিষয় আমরা দেখিলাম কিন্তু আজ একটি প্রশ্ন স্বতঃই আমাদের মনে আসিতেছে যে ইহার শেষ কোথায়? মহাত্মা গান্ধী নির্দ্দিষ্ট পথে দেশ চলিতে পারিল না কিম্বা কতিপয় নেতা দেশকে চলিতে দিলেন না। অতঃপর কংগ্রেস বিলাফৎ স্বরাজ্য দল নায়ক যে দল সমগ্র দেশময় একটা সাড়া ফেলিয়া দিবার ঘুম ভুলিয়া দেশবাসীকে কাউন্সিল গমনের জন্য উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিলেন, তাঁহারাও যেন এখন ম্রিয়মান। পণ্ডিত মতিলাল এখন ধ্বংস পথ হইতে বিরত হইয়া আপসতন্ত্রের সহায়ক ভাবে আপনাকে প্রকট করিয়াছেন। একমাত্র মধ্যপ্রদেশে স্বরাজ্য দল ধ্বংস লীলার অভিনয়ে কিয়ৎ পরিমাণে কৃতকার্য্য হইয়াছেন। কিন্তু তাহাতে দেশের আপামর জনসাধারণের নিদারুণ দুঃখ কষ্টের কি লাঘব হইল? দেশীয় মন্ত্রীগণকে তাঁহারা অপদস্থ করিয়া স্থানচ্যুত করিলেন বটে, কিন্তু তাহাতেই কি আমরা স্বরাজ পাইলাম? এদিকে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় স্বরাজ্য এবং স্বাধীন পন্থীগণ যদিও কয়েকদিন একটু গরম গরম কাজ করিয়াছেন এখন তাঁহাদেরও ভবিষ্যৎ অন্ধকারময়। যদিচ তাহারা সম্মিলিত হইয়া মন্ত্রীগণকে স্থানচ্যুত করেন তাহা হলেই বা দেশের পক্ষে লাভ কি হইবে? বজেট আলোচনার সময় সমাগত প্রায়। স্বরাজ্যপন্থীগণ অনেক বিষয়েই বজেট নাকচ করিবার চেষ্টায় আছেন, কিন্তু যে ভাবে তাঁহারা এই কার্য্য করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন তাহা

কি জনসাধারণের পক্ষে এবং আমাদের ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রীয় জীবনের পক্ষে মঙ্গলকর হইবে?

● ● ●

বঙ্গদেশে এখন দুইজন মুসলমান মন্ত্রী হস্তান্তরিত বিভাগসমূহের ভার লইয়া কাজ করিতেছেন। ইহাদের কেহই অজ্ঞাত কুলশীল অথবা অযোগ্য নহেন। শিক্ষা সচিব মাননীয় শ্রীযুক্ত ফজলুল হকের নাম সর্ব্বত্র পরিচিত এবং দেশের কাজ করিয়া ইহাঁর যে অভিজ্ঞতা লাভ হইয়াছে তাহা শাসন বিভাগের কার্য্যে সুফল প্রসব করিবে বলিয়াই আমরা আশা করি। কৃষিমন্ত্রী মাননীয় আবদুল করিম আবু আহমেদ গজনভী পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দু এবং মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের নিকট সুপরিচিত। শাসন সংস্কারের পূর্ব্বে আঞ্জুমান ব্যবস্থাপক সভায় ইহাঁর দেশপ্রীতি এবং জনসাধারণের হিতকর অনুষ্ঠানের সহায়তা-কল্পে অক্লান্ত পরিশ্রম ভারতবর্ষব্যাপী শিক্ষিত এবং অশিক্ষিত মুসলমান তথা হিন্দুর নিকট সুবিদিত। কৃষিবিভাগের গুরুভার দায়িত্ব গ্রহণ করিবার অল্প কিছুদিন অগ্রে যখন ব্যবস্থাপক সভায় মন্ত্রীগণকে জনসাধারণের চক্ষে হেয় করিবার চেষ্টা করা হয়, গজনভী সাহেব তখন স্পষ্টভাবে দেশবাসীর নিকট কাজ করিবার জন্য সুযোগ প্রার্থনা করেন। আজ আমরা স্বরাজদলের কার্য্য দেখিয়া এইজন্য বিস্মিত হইতেছি যে তাঁহারা কি বাস্তবিকই ভাবেন যে দেশময় স্বরাজ্যপন্থী ব্যতীত অপর কাহারও দেশ মাতার সেবা করিবার অধিকার নাই? যদি তাহাই হয় তবে তাঁহাদের এই দাম্ভিকতার স্পর্দ্ধা দেখিয়া আমরা অবাক হইতেছি। কিন্তু যদি তাঁহারা বিশ্বাস করেন যে তাঁহারা ব্যতীত অপর দলসমূহেরও দেশের কাজ করিবার ইচ্ছা এবং সামর্থ্য আছে, তবে আমরা আশা করি, যে দেশীয় মন্ত্রীগণের শাসন বিভাগ সমূহের সমূদয় ব্যয় তাঁহারা মঞ্জুর করিয়া দেখিবেন যে ইঁহারা গঠনমূলক কার্য্য করিবার উপযোগী কিনা।

● ● ●

স্বরাজদলের হিন্দু মুসলমান প্যাক্ট লইয়া অনেক আলোচনা হইয়া গিয়াছে। জনসাধারণের বিশেষতঃ হিন্দুগণের নিকট প্যাক্ট কখনই বিশেষ সুবিবেচনার কাজ বলিয়া মনে হয় নাই। মুসলমান ভ্রাতাগণের মধ্যে যাঁহারা ধীর স্থিরভাবে এই বিষয় লইয়া আলোচনা করিয়াছেন তাঁহারা কেহই বর্ত্তমান সময়কে প্যাক্টের উপযোগী বলিয়া বলেন না। তথাপি আমরা বিশ্বাস করি যে এত বড় একটি সম্প্রদায়কে উন্নতির পথে আনিতে তাঁহাদিগকে প্রথম প্রথম কতক পরিমাণে বিশেষ অধিকার দিতেই হইবে। কিন্তু সে দিন যখন ব্যবস্থাপক সভায় জলপাইগুড়ীর খান বাহাদুর মসরুফ হোসেন এই প্যাক্টের ভাবানুযায়ী একটি প্রস্তাব উপস্থিত করেন, তখন আমাদের দেশবন্ধু এবং তাঁহার দল অতিশয় তীব্র ভাবে ইহার বিরুদ্ধে মত প্রদান করেন এবং প্রস্তাবটি নাকচ করেন। দেশবন্ধু যদি বাস্তবিকই মুসলমান সম্প্রদায়ের হিতের জন্য ব্যস্ত থাকিতেন তবে আমরা তাঁহার নিকট হইতে এই প্রকার ভাব আশা করিতে পারিতাম না। যে মুসলমান সম্প্রদায়ের কতিপয় সভ্যকে দেশবন্ধু বিশেষ ক্ষমতার প্রলোভন দেখাইয়া ব্যবস্থাপক সভায় নিজের দলপুষ্টি করিয়াছেন, আজ তাহাদের দাবীকে কুড়িতে উড়াইয়া দিবার কি কারণ সহসা প্রকট হইয়াছিল তাহা আমরা ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিতেছি না। মোটের উপর, এই এক বিষয়ের উপর দেশবন্ধুর ভাব হইতেই তাঁহার মুসলমান প্রীতির সম্যক পরিচয় আমরা পাইতেছি।

● ● ●

এই সম্পর্কে আমরা কয়েকটি সহজ এবং সরল কথার আলোচনা করা যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে করি। বহুদিন যাবৎ হিন্দু আমরা রাজপ্রসাদ লাভ করিয়া রাজার অনুগ্রহে পুষ্ট হইয়াছি। আজ যদি মুসলমান ভাইগণ কিছু অধিকারের দাবী সকলের সমক্ষে উপস্থিত করেন, তাহা কি আমাদের অগ্রাহ্য করা উচিত? যদিও আমরা সাম্প্রদায়িক অনুষ্ঠান অথবা অধিকারের বিরোধী কিন্তু তবুও বর্ত্তমান সমস্যার সমাধান করিতে হইলে আমাদের কিছু পরিমাণে স্বার্থ ত্যাগ করিতেই হইবে। আজ বাঙ্গালী মুসলমান সমাজের গৌরবের বিষয় যে হস্তান্তরিত বিভাগগুলি দুইটি সুযোগ্য মুসলমানের হাতে ন্যস্ত হইয়াছে। আমরা ঘরসে নীতির বিরোধী। ইহাতে

কখনও দেশের কিম্বা দশের কল্যাণ সাধিত হইতে পারে না। আজ আমরা কাউন্সিলের মুসলমান সভ্যগণকে এই অনুরোধ করি যে, স্বরাজ্যদলের নেতার আহ্বানে যেন তাঁহারা দেশ এবং নিজের সম্প্রদায়ের পদে কুঠারাঘাত না করেন। স্বরাজ্যদলের নির্ব্বাচনকালীন রীতিনীতি আমরা নয়ন মেলিয়া দেখিয়াছি, কি প্রকার ভাবে তাঁহারা মিথ্যা আশ্বাসে প্রলুব্ধ করিয়া দেশের গণ্যমান্য নেতৃবৃন্দের স্থলে অজ্ঞাতনামা জনসাধারণকে ব্যবস্থাপক সভায় স্থান দিয়াছেন, তাহাও কাহারও অবিদিত নহে। কিন্তু দেশবন্ধু দাস মহাশয় সেদিন ব্যবস্থাপক সভায় মুসলমান সমস্যার যে মীমাংসা করিয়াছেন, তাহাতে আর কাহারও পক্ষে তাঁহার প্রকৃত অভিসন্ধি বুঝিবার বাকী থাকিবে না। আমরা কেবল মুসলমান-অথবা কেবল হিন্দুর রাজত্ব চাই না। আমরা হিন্দু মুসলমানের এবং বিদেশীয়গণের মিলনের উপর প্রতিষ্ঠিত স্বরাজ চাই। তাই আজ আমরা স্বরাজ্য দলের কীর্ত্তিকলাপ দেখিয়া ভীত এবং সন্ত্রস্ত হইতেছি এবং মুসলমান এবং মুসলমান ব্যবস্থাপক সভার সভ্যগণকে মন্ত্রীগণের পক্ষ অবলম্বন করিয়া দেশের গঠনমূলক কার্য্যের সহায়তা করে অনুরোধ করিতেছি।

● ● ●

সমগ্র কলিকাতার মধ্যে বালিকাদিগের জন্য একমাত্র বেথুন কলেজেই যথাযথভাবে দেশীয় ভাবে পাশ্চাত্য উচ্চশিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা রহিয়াছে। কিন্তু বড়ই আক্ষেপের বিষয় যে এই প্রতিষ্ঠানটির প্রিন্সিপালের পদে সুযোগ্যা ভারতীয় রমণীর অভাব না থাকিতেও ভূতপূর্ব্ব শিক্ষা সচিব মহাশয় অনেক মিস রাইটকে সমাসীন করিয়াছিলেন। ইহা লইয়া কোনও কোনও কাগজে কিছু কিছু আলোচনা হইয়া গিয়াছে। কিন্তু বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভাতে শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু মহাশয় ইহা লইয়া প্রস্তাব উপস্থিত করিয়া স্ত্রী শিক্ষার উন্নতিকামী সমুদায় বাঙ্গালীর কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছেন। শিক্ষা সচিব মাননীয় ফজলুল হক সাহেব যে জবাব দিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ যুক্তি সঙ্গত। কারণ, যদি মিস্ রাইটকে কোনও বিশেষ সর্ত্তানুসারে আনা হইয়া থাকে তবে গবর্ণমেণ্ট তাহা রক্ষা করিতে স্বভাবতঃ বাধ্য কিন্তু যতীন্দ্রনাথ যে সুপরামর্শ দিয়াছেন তাহাতে শিক্ষা সচিব মহাশয় মিস্ রাইটকে স্কুল সমূহের ইন্‌স্পেক্ট্রেস্ ভাবে স্থানান্তরিত করিয়া সেই স্থলে কোনও সুযোগ্যা ভারতীয়া অথবা বাঙ্গালী মহিলাকে বসাইতে পারেন।

● ● ●

সম্প্রতি আইনের বয়স কমিল কি বাড়িল, ইহা লইয়া হিন্দু ধর্ম্ম রসাতলে গেল কি স্বর্গে উঠিল এই লইয়া বার প্রতিবাদের সময় কোন কোন সমাজ ও সভায় যে রকম উৎসাহের প্রাবল্য দেখা যায় তেমন উৎসাহ যদি এই সব সভা ও সমাজ নিজ নিজ সামাজিক অতি মর্ম্মভেদী ব্যাধিগুলির নিরাকরণের দিকে দিতে পারিতেন তবে সমাজ ও দেশের অনেক হাহাকার কমিয়া যাইত।

সাধে বাদ

খন্দে আলি মিয়া

(জেলখানা হইতে)

লালসী যেমতি মধুর তরে ;—
ছুটিয়া বেড়াত মধু প্রান্তরে।
শতেক ভিয়ান হৃদয়েতে ধরি
সাধ হয় আজ তেমনি-ই করি।
অমনি সরম-শৃঙ্খল তোর
আঁকড়ি চরণ বেঁধে ফেলে মোর।

নারী

শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী সরস্বতী

সুরমা কিছু বিরক্ত হইয়া উঠিয়া ছিলেন, স্বামীকে তাই বলিলেন "খুঁজে খুঁজে আর তো পাত্র পেলে না তাই নিয়ে এলে বিনয়কে। সহরে ছেলে তোমার আমার কপালেই দুর্মূল্য হয়ে উঠেছিল—না ?

শিবনাথ পত্রিকা দেখিতেছিলেন, বলিলেন "এ কথার মানেটা কি ?"

সুরমা রাগ করিয়া বলিলেন "মানে আমার মাথা আর মুণ্ড। মেয়েটাকে হাত পা ধরে যেন জলে ফেলে দেওয়া হয়েছে। আমার অমন মেয়ে, যেমন সুন্দরী, তেমনি শিক্ষিতা, একটা পাশ দেছে, ওকি পাড়াগাঁয়ের অশিক্ষিতা মেয়ে ? আমার এত টাকা এ সব আর কে খাবে, সব তো ওরই। ওকে যদি তেমনি ঘরে দিতে পারতে গো ? ওমা, মেয়ে আর আমার সে মেয়ে নেই, যেন কি রকম ভাবখানা হয়ে গ্যাছে।" একটু হাসিয়া শিবনাথ বলিলেন "কি রকম ভাবখানা দেখতে পেলে ?" সুরমা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন "জানি নে।"

সঙ্গে সঙ্গে তিনি প্রস্থান করিলেন।

কাল জামাই ষষ্ঠী, শিবনাথ তত্ত্বের যোগাড় করিতেছিলেন। সুরমা মুখ বাঁকাইয়া বলিলেন "আর অত জিনিষ দিতে হবে না। চাল নেই, চুলো নেই যার তার সঙ্গে দিয়েছেন মেয়ের বিয়ে, জিনিষ দেওয়ার বহর কত ! হ্যাঁ যুক্তুম, জামাই যদি এখানে থাকত, দেওয়া যানাত। এ সবই তো যাবে সেই খড়ো বাড়ীতে, সে ঘরে রাখবার মত জিনিষ এ সব নয়।"

ধীর প্রকৃতি শিবনাথ চোখ তুলিলেন, স্ত্রীর উপর চোখ রাখিয়া গম্ভীর কণ্ঠে ডাকিলেন "সুরমা—"

এই একটী শব্দ মাত্র, সুরমা এই শব্দটাতেই অত্যন্ত সঙ্কুচিতা হইয়া পড়িলেন, জড়সড় ভাবে সরিয়া বসিয়া অন্য একটা কাজের অছিলা খুঁজিতে লাগিলেন।

শিবনাথ কঠিন কণ্ঠকে তখনই কোমল করিয়া ফেলিয়া বলিলেন "বারবার এই একটা কথাই তুলো না সুরমা। আমি আগেই বলেছি কারও আত্ম-মর্য্যাদায় আঘাত করতে আমি পারব না। আমার জামাই—সে গরীব হ'লেও প্রকৃত মানুষ, মনুষ্যত্ব তার ভেতরেই আছে যে প্রলোভনে ভুলে যায় না। তোমার এ জন্যে ভগবানকে ধন্যবাদ দেওয়া উচিত যে প্রকৃত একটী মানুষকে তুমি জামাইরূপে, তোমার ছেলের মত কাছে পেয়েছ। তার খড়ের ঘর বলে ঘৃণা করছ, কিন্তু সেই খড়ের ঘর রাজপ্রাসাদের চেয়েও মহিমময়। সেই খড়ের ঘরের মধ্যে যে নিষ্ঠা, যে ভক্তি, যে স্নেহ, যে প্রীতি জেগে আছে তা কি তোমার এই জিতল হর্ম্যে আছে সুরমা ? তোমার মেয়ে শিক্ষিতা বলে তুমি ভাবছ সে সেখানে থাকতে পারবে না, তার অশিক্ষিতা শাশুড়ি, তার অশিক্ষিতা গ্রামবাসিনীদের সঙ্গে মিশতে পারবে না। এ তোমার ভুল ধারণা সুরমা। আমার মেয়েকে আমি নিজে শিক্ষা দেছি, তাকে বাইরের কতকগুলো শিক্ষা জোর করে গিলিয়ে দেই নি, তাকে আমার জাতি, আমার ধর্ম, সকলের সঙ্গে মিলিয়ে সামঞ্জস্য রেখে শিক্ষা দেছি। আমার মেয়ে যথার্থ শিক্ষায় শিক্ষিতা হয়েছে, বিলাসের মধ্যে বর্দ্ধিতা হয়ে, তোমার মত বিলাসিনী মায়ের কাছে মানুষ হয়েও সে আমার মানসী রূপেই ফুটতে পেরেছে। তার জন্যে তোমার ভাবতে হবে না সুরমা, তার জীবনপথ সামনে মুক্ত রয়েছে, সে নিজে পথ চিনে চলতে পারবে।

সুরমা আর একটাও কথা বলিতে পারিলেন না।

জামাই ষষ্ঠীর দিন সকাল বেলায় বিনয় নিমন্ত্রণ

রক্ষা করিতে আসিল। মায়ের গম্ভীর বিমর্ষ মুখখানা দেখিয়া কণা ঠিক জানিয়াছিল মা আজ আবার কি বলিয়া বসিবেন; তাই সে আগেই মাকে সাবধান করিয়া দিতে আসিল—"মা তোমার জামাইকে এখানে থাকার কথা—"

অর্দ্ধেক কথা না হইতেই মা হঠাৎ চেঁচাইয়া উঠিলেন "ওরে বাপু, থাম, থাম, ঢের শুনেছি। ভয় নেই, কিছু বলব না। হল তো, তোরা বাপ মেয়ে যা খুশী তাই কর্ গিয়ে, আমি আর কিছু বলতে আসব না।"

কণার প্রফুল্ল মুখখানা এক মুহূর্ত্তে মলিন হইয়া গেল; সে একটু থামি নীরব হইয়া রহিল তাহার পর বিস্রস্ত বাড়িয়া ফেলিয়া স্বাভাবিক কণ্ঠে বলিল "আমি বলছি তুমি যে আমার শাশুড়ির আর তোমার জামাইয়ের ঘাড়ে সব দোষ দিচ্ছ এটা সম্পূর্ণ মিথ্যে। দোষ আমারই; তোমার জামাই যে মেসে থাকেন সে কেবল আমারই জন্যে।"

মা জিজ্ঞাসু নেত্রে কন্যার মুখপানে চাহিয়া রহিলেন।

কন্যা অঞ্চলটা দুই হাতে লইয়া একটা কোন পাকাইতে পাকাইতে বলিল "হাঁ, সব দোষ আমারই তাঁর আত্মমর্য্যাদা পাছে নষ্ট হয়, পাছে লোকে বলে শ্বশুরবাড়ী থাকেন, সেই ভয়ে আমিই বায়না করেছি যেন আমাদের বাড়ী না থাকা হয়। আমার শাশুড়ি মত দিয়েছিলেন, বাধ্য হয়ে তাঁকেও আসতে হত, এখানেই থাকতে হ'ত, কেবল আমার কথার জন্যেই—"

তীব্র কণ্ঠে সুরমা বলিলেন "বেশ করেছ, এ কথা আর আমায় বলবার কি দরকারটা ছিল। তোমার স্বামী, তাঁর জামাই, আমার কে? আমি তোমাদের কেউই নই—"

উদ্বেল অশ্রুবেগে তাহার কণ্ঠরুদ্ধ হইয়া গেল, তিনি মুখে কাপড় চাপা দিতে দিতে চলিয়া গেলেন, —কণা স্তম্ভিত ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।

দুপুর বেলা স্বামীকে ডাকিয়া সে বলিল "তোমার এখানেই থাকতে হবে! বল থাকবে তো?"

বিনয় পান চিবাইতে চিবাইতে মাথা নাড়িয়া বলিল "তা হয় না কণা।"

কণা বলিল "কেন হবে না?"

বিনয় বলিল "তুমিই তো বলেছ শ্বশুর বাড়ীতে পুরুষ হয়ে বাস করার চেয়ে মৃত্যু ভাল। আমি হাজার উপার্জ্জন করে বাস করি, নিজের খরচ যদি নিজেই করি, তবু লোকে বলবে আমি শ্বশুরবাড়ী বাস করছি। এত বড় কলঙ্ক পুরুষের আর নেই। দুই চার দিনের জন্য যাওয়া চলে কিন্তু বার মাস বাস করা, সে কখনই হয় না।

কণা খানিকক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া বলিল "আমিই তোমায় বলেছিলুম, আবার আমিই তোমায় এখানে থাকতে বলছি তবু থাকবে না তুমি।"

বিনয় তাহার মুখের উপর দৃষ্টি রাখিয়া বলিল "তুমিই বিবেচনা করে দেখ কণা, কোনটা ঠিক সত্য কথা তখন যে কথাটা বলেছিলে সেই কথাটাই ঠিক সত্য ছিল না কি? তখন তোমার মনে সত্য লেগেছিল কারণ তখন তুমি বড়লোকের বিলাস বঞ্চিতা আদরের পুতলী কণা ছিলে না, তখন ছিলে দরিদ্রের ঘরে দরিদ্রের স্ত্রী কণা। সেখানে মিথ্যা ছিল না, ছিল সত্য, তাই সেই সত্যকেই তোমার মধ্যে ফুটে উঠতে দেখেছিলুম। তোমার এ যুক্তি, এ কথার সঙ্গে সে যুক্তি সে কথার ঢের প্রভেদ কণা, তোমার কথা আমি রাখতো পারব না, সে জন্যে তুমি আমায় ক্ষমা করো। আমার মার আদেশ যা আমি তা পালন করব। জগতে সব চেয়ে পূজনীয়া আমার মা, তাঁর আদেশ আমি ঠেলতে পারব না, তাঁর কথা আমায় রাখতেই হবে।"

কণা আর চাপিয়া থাকিতে পারিল না, বলিয়া ফেলিল "তোমার মায়ের কথা যেমন তোমার কাছে বেদ বাক্য, আমার মায়ের কথাও তো তেমনি

আমার কাছে বেদ বাক্য। আমার মায়ের আদেশ ও আমি লঙ্ঘন করতে পারি নে।"

শান্ত মুখে বিনয় বলিল সে কথা নিশ্চয়ই সত্য, আমি তা অস্বীকার করছিনে, এত বড় অসত্য সত্য-টাকে অস্বীকার করবার যো ও নেই। তোমার মায়ের আদেশ তুমি মেনে চল, আমাদের ওখানে যেয়ো না, কেন না সহরের শিক্ষিতা মেয়ে তুমি পাড়াগাঁয়ের জল বাতাস তোমার সহ্য হবে না, অশিক্ষিতাদের সঙ্গে তোমার মিলবেও না। আমিও আমার মায়ের আদেশ মেনে চলি, যদিও আমি শিক্ষিত, একটা প্রফেসর তবুও আমি আমার গরীব মায়ের ছেলে, পাড়াগাঁ আমার জন্ম ভূমি, ওই সব অশিক্ষিত অশিক্ষিতারা আমার ভাই বোন। আমার ওদেরই কাছে যেতে হবে, ওদেরই কাছে থাকতে হবে। আমি দরিদ্র তাই দরিদ্রের ব্যথা বুঝি, আমার ব্যথা তারা বোঝে। ধনী দরিদ্রে মিল হয় না। তারা যতই কেন না কাছাকাছি আসুক, তবু তাদের মাঝে ঘৃণা ও সম্মানের ভাব জেগে থাকবেই। তোমার সঙ্গে আমার মিল হওয়া অসম্ভব। কর্ম্মসূত্রের টানে এসে পড়েছিলুম, মাঝে দেখছি জেগে আছে আমার দেশ—আমার দেশবাসী, আমার মা; তোমার জেগে আছে তোমার মা, তোমার ধনীর গর্ব্ব, শিক্ষিতার অহঙ্কার। আমি তোমায় নিয়ে যাব বলে এসেছিলুম, কিন্তু না, দেখছি, নিয়ে যাবার কোনও দরকার নেই। দুর্ভাগ্য কি সৌভাগ্য জানি নে, আমি তোমায় মুক্তি দিয়ে যাচ্ছি। যদি কোনদিন তোমার আত্মমর্য্যাদায় স্বামীর অধিকারে স্ফীত হয়ে আঘাত করে থাকি, আশা করছি ক্ষমা করবে।"

কথার কুসুম পেলব হাতখানা নিজের হাতের মধ্যে লইয়া মৃদু নিপীড়িত করিয়া বিনয় তাহা ছাড়িয়া দিল; তাহার পর ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল।

ক্রমশঃ

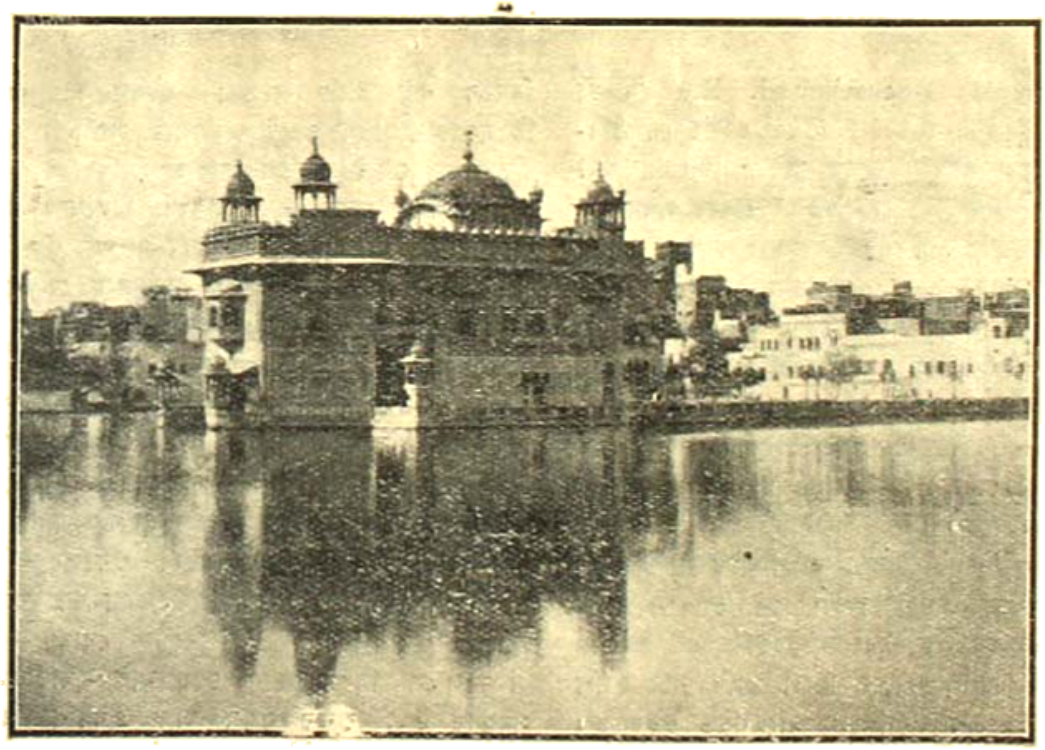

স্বর্ণ মন্দির (এক পার্শ্বের দৃশ্য)

দৈত্য প্রশস্তি

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

ক্ষম হে দৈত্য ক্ষম
আমার উপর আক্রোশ কেন
কোনো দোষ নাই মম।
দর্পেতে তুমি হয়েছ অধীর
পদভরে বুক কাঁপে ধরণীর
করাল ভয়াল সাধুজন ত্রাস
তুমি ধূমকেতু সম।

২

আমি ত দেবতা নহি
দেব দূত আমি ধরণীতে আনি
স্বরগের বাণী বহি।
লতাপাতা ফুল এই লয়ে থাকি
চাঁদের জোছনা বুক ভরে মাখি
বন শোভনার কাণে কাণে আমি
দিনরাত কথা কহি।

৩

তুমি ক্রুর অভিমানী
বিবেক রহিত চির-অপকারী
চিরদিন ধরে জানি।
হীনতার তব নাহিক যে শেষ
অকারণে দাও কতই যে ক্লেশ
বিধাতার তুমি চির অভিশাপ
মানবের তুমি গ্লানি।

৪

করিতে ধরার ত্রাণ
আসিবেন জানি আশায় রয়েছি
আসিবেন ভগবান।
সাধুজন সব সে আশায় আছে
নতুবা বিপদে কেমনে বা বাঁচে
তোমার পাপের প্রখর প্রতাপ
হক হক অবসান

বারাঙ্গনা বৃত্তি

John. D. Rockfeller I. R.র নেতৃত্বে Bureau of social hygiene হইতে যে চারিখানি পুস্তক বাহির হইবে "Commercialized Prostitution of New york" তাহার প্রথম।

এই সমিতি গঠিত হইলে ইহার কার্য্যভার Mr. George. I. Kneeland উপর অর্পিত হয়। Mr. Kneeland চিকাগোর Vice commissionর চালাইয়া আসিয়াছেন, সেইখানেই ইহার কার্য্যদক্ষতা প্রমাণিত হইয়াছে। এই খণ্ডের একটি মূল্যবান অধ্যায় নিউইয়র্কের State Reformatory for womenর সুপারিন্‌টেনডেন্ট Katherine Bement কর্ত্তৃক লিখিত হইয়াছে।

গ্রন্থকারদিগের উদ্দেশ্য ব্যাপারটির সমস্ত ঘটনা সম্যক পরিজ্ঞাত হওয়া এই ব্যাপারে অনুসন্ধান বিশেষ ভাবে সফল হইয়াছে, এবং নিউইয়র্কের এই পাপের ব্যবসায়ের দিকটা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে রাখি ঢাকি ছাপি ছাপি কিছু না রাখিয়া আলোচিত হইয়াছে। এই পাপ ব্যবসায়ের প্রাচুর্য্য এবং প্রসারের বিস্তৃত বিবরণ এই খণ্ডে দেওয়া হইয়াছে। এমন কি সখের সংস্কারগণও এই ব্যবসায়ের প্রাচুর্য্য এবং কত অগাধ অর্থ ইহার উপর ব্যয় হয় দেখিয়া আশ্চর্য্য হইবেন। যে ভাবে এই কু-ব্যবসায় চলিতেছে এবং যাহারা ইহার উপর নির্ভর করিয়া দিন গুজরাণ করিতেছে সে সমস্ত ব্যাপার পড়িয়া স্তম্ভিত হইতে হয়। একটা ব্যাপার অন্ততঃ এই অনুসন্ধানে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, এই পাপ সমস্যা কিছু একদিনে নিরাকরণ হইবে না—এবং ইহা পত্র পাঠ নিরাকরণের যে কোন ব্যবস্থা স্বপ্নের মত এবং অসম্ভব।

শেষ অধ্যায়ে এই পাপ নিরাকরণের জন্য সমিতি ও ব্যক্তিগত চেষ্টার উল্লেখ করা হইয়াছে—কিন্তু এ সব কর্ম্মের এখন আরম্ভ মাত্র; ইহার সুফলের আশা ভবিষ্যদ্বংশীয়দের কার্য্যাবলীর উপর নির্ভর করে তবে এই যে পাপের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা—এ যে ভাল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই,—বারাঙ্গনা সমস্যার এমন সুন্দর পুস্তক আর প্রকাশিত হয় নাই।

ব্যতিক্রম

শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ,

একোনষষ্টিতম পরিচ্ছেদ

বাসায় ফিরিয়া আসিয়া, ইন্দুকে উপরে পাঠাইয়া দিয়া হরসুন্দর বাহিরে আসিলেন। তাহার মুখে সমস্ত কথা শুনিয়া নৃত্য ঠাকুরাণী মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "হাঁগা, এখন করবি কি?" হরসুন্দর চাকরের হাত হইতে হুঁকা লইয়া বলিলেন, "তার জন্ত তুমি ভেব না দিদি। এখন আমি নিজের ভুল বুঝ্‌তে পেরেছি, ভগবান এক ঘায়ে আমাকে সমস্ত ভুলিয়ে দিয়েছেন, বিষয়, আশয়, ঘর, বাড়ী কিসের জন্ত? কেন এতদিন পয়সা পয়সা করে মরেছি? বিন্দুই যদি বাড়ী না আসে তা'হলে বিষয়, বাড়ী, পয়সা কে ভোগ করবে?" নৃত্য ঠাকুরাণী বলিলেন, "পয়সা পয়সা করে তাদের যে রকম ভাবে পাকিয়ে তুলেছ তাই তাতে লোভার নিষ্কৃতি পাওয়া বড়ই শক্ত। শ্রীকৃষ্ণপুরের গিন্নী যখন মেয়ে নিয়ে এসেছেন তখন তার বিহিত করতে হবে তো?" "বিহিত আমি আর কি কোরব দিদি? ভগবান এর বিহিত করবেন।" "হুঁ তোর যত বয়স বাড়ছে ততই তোর বুদ্ধি শুদ্ধি কমছে। ভগবান নিজে কখনও কারো বিহিত করেন না একটা উপলক্ষ দিয়ে বিহিত করান, তুমি যে তাল পাকিয়েছ তা তোমাকেই খুলতে হবে। শ্রীকৃষ্ণপুরের গিন্নীকে কি বলবি?" "আমি আর কি বলব দিদি?" "মেয়ে মাথায় করে তোর বাড়ী এসেছে, তোর বউ দুই ঘরে নিবি কিনা আর কে বলবে?" "ঘর আর আমার নয় দিদি! ঘর বাড়ী বিন্দুর পরিবার বিন্দুর, সে ইচ্ছা হয় তার স্ত্রী নেবে না হয় না নেবে।" বৃহৎকায় পরেশচন্দ্র দুয়ারের পার্শ্বে আত্মগোপন করিয়া দাঁড়াইয়াছিল—সে এই সময়ে বলিয়া উঠিল, "এক্কে তা কি হয়? গিন্নীমা বলে গেছেন যে বহুরের ছিমুখের এক্কে না পেলে তিনি নড়্‌বেন না।"

পরেশচন্দ্রের কথা শুনিয়া চমক ভাঙ্গিয়া হরসুন্দর বলিয়া উঠিলেন "ঠানদি' তুমি উপরে যাও, বিন্দুর মা যে এখানে এসেছে তা আমার মনে ছিল না, এরা তো কেউ ইন্দুকে চেনে না সুতরাং সে হয় ত চোরের মত একপাশে দাঁড়িয়ে আছে।"

নৃত্য ঠাকুরাণী উপরে গিয়া দেখিলেন, যে হরসুন্দর যাহা ভাবিয়াছিলেন তাহাই হইয়াছে, সে একপার্শ্বে দাঁড়াইয়া নাই বটে কিন্তু সারদা ও অন্নদা তাহার দুইদিকে দাঁড়াইয়া তাহাকে যেরূপ তীব্র ভাবে আক্রমণ করিয়াছে তাহাতে সে অস্থির হইয়া উঠিয়াছে।

ইন্দুকে বসাইয়া নৃত্য ঠাকুরাণী ভবসুন্দরীকে তাহার পরিচয় দিলেন। পরিচয় পাইয়া ভবসুন্দরী প্রসন্ন হইলেন না বটে কিন্তু ভদ্রতার খাতিরে ইন্দুকে ঘরের ভিতরে লইয়া গিয়া তাহার সহিত কথা কহিতে আরম্ভ করিলেন। নানা ছন্দে বিনাইয়া ভবসুন্দরী জানাইলেন যে জামাতার দুর্ব্যবহারে তাহার কন্যা দিন দিন শুকাইয়া যাইতেছে—সে প্রায় মরিতে বসিয়াছে এবং এ দুর্ব্যবহারের কারণ ইন্দু। ইন্দু চুপ করিয়া শুনিয়া গেল। তাহার মুখে কোন ভাবই প্রকাশ পাইল না। ইন্দুর ব্যবহার দেখিয়া নৃত্য ঠাকুরাণী আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন কারণ তাহার ষাট বৎসর বয়সে তিনি কখনও স্ত্রীলোকের সর্ব্বাপেক্ষা মর্ম্মভেদী অপবাদ, এমন অম্লান বদনে সহ্য করিতে দেখেন নাই।

ইন্দু কাঁদিল না; ঝগড়া করিল না, সামান্ত একটা আপত্তি পর্য্যন্ত করিল না। তাহার ব্যবহার দেখিয়া মুখরা সারদা পর্য্যন্ত স্তব্ধ হইয়া গেল। স্নান করিয়া আহার শেষ করিয়া ইন্দু একখানা পত্র লিখিল পত্র

খানা কাহাকেও না দেখাইয়া সে একা নীচে হরসুন্দরের নিকটে গিয়া উপস্থিত হইল। হরসুন্দর আহারান্তে হুঁকায় তামাক খাইতেছিলেন এবং পরেশচন্দ্র কলিকার প্রসাদের অপেক্ষায় প্রভুভক্ত কুকুরের ন্যায় বাহিরে বসিয়াছিল। ইন্দুকে দেখিয়া হরসুন্দর জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি মা?" ইন্দু মাথায় কাপড় টানিয়া টানিয়া দিয়া বলিল "বাবা, বিনু দাদাকে একখানা পত্র লিখেছি, আপনি, একবার পড়ে দেখুন।" হরসুন্দর ত্রস্ত হস্তে হুঁকা নামাইয়া রাখিয়া পত্র লইলেন, কলিকায় তামাক পুড়িয়া যাইতে দেখিয়াও পরেশচন্দ্র কলিকা ফুঁ দিতে ভুলিয়া গেল। হরসুন্দর পড়িলেন :—

কলিকাতা,
৩রা বৈশাখ ১৩০৯।

শ্রীচরণ কমলেষু—

বিনুদাদা, আমি কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়াছি। তুমি পত্রপাঠ মাকে লইয়া একবার দেশে আসিবে আমি তোমার বাসাতেই আছি, বাবা ও সেই খানেই আছেন। আমার বাবা, মা ও দাদা এখনও বিদেশে। আমি জানি যে আমি পত্র না লিখিলে তুমি দেশে ফিরিবে না, সেইজন্য মিনতি করিয়া লিখিতেছি, তুমি আমার এই অনুরোধটী উপেক্ষা করিও না, পত্র পাঠ মাকে লইয়া কলিকাতায় বাসায় আসিও। বিশেষ বিপদে না পড়িলে তোমাকে এত করিয়া অনুরোধ করিতাম না।

ইতি,—সেবিকা।
ইন্দু

পত্র পড়িয়া হরসুন্দর জিজ্ঞাসা করিলেন "এ পত্র আমি কি করব মা?" জিজ্ঞাসা করিয়া সহসা একটা অজ্ঞাত পুলকে তাহার শরীর রোমাঞ্চিত হইল। হরসুন্দর ভাবিলেন যে বিমুখ অদৃষ্ট দেবতা হয়ত এতদিনে প্রসন্ন হইয়াছেন, ইন্দু বিনয়কে ফিরাইয়া আনিয়া তাহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবে। ইন্দু বলিল, "পুরোহিতের ঠিকানাটা আমি জানি না, পরেশচন্দ্র ঠিকানা লেখা হইলে স্বয়ং তাকে দিতে গেল এবং ফিরিয়া আসিয়া ভবসুন্দরীর নিকট মোটা রকমের বকুনিস্ আদায় করিল। পত্রের কথা শুনিয়া সকলেই প্রসন্ন হইল। ভবসুন্দরী ভাবিলেন যে জামাতা ফিরিয়া আসিলে তাহার সম্মুখে এই বিবাহটার কথা কিছুই বলিতে পারিবে না, অতএব তিনি নির্ব্বিবাদে জামাতার দখল লইবেন। হরসুন্দর মনে করিলেন যে তাহার পাপের প্রায়শ্চিত্ত দেখিয়া ইন্দু হয়ত বিনয়কে গ্রহণ করিবে, তাহার সংসার উচ্ছন্ন যাইবে না, তাহার মন শান্ত হওয়ায় তিনি হরিদ্বর-পুরের ভেজারতির কথা ভাবিতে বসিয়া গেলেন। সারদা মনে মনে ভাবিয়া রাখিল যে বিনয় ফিরিয়া আসিলে আর তাহাকে নয়নের অন্তরাল হইতে দিবে না। কেবল বৃদ্ধা ঠাকুরাণীর মুখে হাসি দেখা গেল না, তিনি বিনয় ও ইন্দু দুই জনকেই চিনিতেন, পত্রের কথা শুনিয়া তিনি অত্যন্ত ভীত হইলেন।

ষষ্ঠিতম পরিচ্ছেদ

সেই দিন দ্বিপ্রহরে গৌরমোহন ও নির্ম্মল কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন। দরোয়ানের মুখে ইন্দুর প্রত্যাগমনের কথা শুনিয়া তাহারা তখনই বিনয়ের বাসায় ছুটিয়া আসিল। ইন্দু পিতাকে কহিল যে সে ফিরিয়া যাইবে তবে তখনই নহে। ইন্দু কলিকাতায় আছে এবং হরসুন্দরের আশ্রয়ে আছে দেখিয়া আশ্বস্ত হইয়া গৌরমোহন গৃহে ফিরিয়া গেলেন। নির্ম্মলের মাতা তখনই আসিয়া ইন্দুকে দেখিয়া গেলেন কিন্তু ভবসুন্দরীর ব্যবহার দেখিয়া তাহার সেখানে তিষ্ঠিতে ইচ্ছা হইল না।

দুই দিন পরে মাতাকে লইয়া বিনয় ফিরিয়া আসিল। পুত্রের মুখ দেখিয়া হর্ষে হরসুন্দরের হৃদয় ভরিয়া উঠিল। ইন্দুর বিবাহের পরেই বিনয় শুকাইয়া গিয়াছিল, আজ এক বৎসর পরে তাহার শুষ্ক মুখ-খানি আবার প্রফুল্ল হইয়া উঠিয়াছে। বিনয় আসিয়া প্রথমেই পরেশচন্দ্রকে দেখিল, তাহাকে দেখিয়া সে রাগিল, মাতার সঙ্গেই উপরে গিয়া সে যখন ভবসুন্দরী

ও সারদাকে দেখিল তখন তাহার দেহ জ্বলিয়া উঠিল। সারদার শিক্ষামত অন্নদা যখন সাজিয়া গুজিয়া আসিয়া প্রণাম করিল তখন রাগে তাহার মুখখানা রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। সেই সময়ে নৃত্য-ঠাকুরাণীর সহিত ইন্দু আসিয়া উপস্থিত হইল।

ইন্দুকে দেখিয়াই বিনয় রাগিয়া বলিয়া উঠিল, "এঁরা এসেছেন সে কথা তো তুমি লেখনি ইন্দু?" ইন্দু বলিল "এঁদের কথা লিখলে আপনি আসবেন না জেনেই লিখিনি। আপনার মনে কষ্ট হয়েছে তা বুঝতে পাচ্ছি কিন্তু এর মধ্যে অনেক কষ্টই তো পেয়েছেন আর একটু কষ্ট করলে যদি সকল দিক বজায় থাকে সেই আশায় আপনাকে এই কষ্টটুকু দিয়েছি।" বিনয় ইন্দুর মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল যে তাহার চক্ষুদ্বয় শুষ্ক কিন্তু অত্যন্ত উজ্জ্বল। তাহার শরদিন্দু ধবল মুখ খানা যেন আরো শাদা হইয়া গিয়াছে, হাত দুই খানা অল্প অল্প কাঁপিতেছে। বিনয় জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি বিপদে পড়েছ লিখেছিলে বলেই এসেছি। মায়ের শরীর এখনও সারে নি, তাঁকে এ সময়ে নিয়ে আসা উচিৎ হয় নি। কি কথা আছে বলে ফেল ইন্দু।" বিনয়কে বাধা দিয়া ইন্দু বলিল, আমার উপর যতই রাগ করুন এখনই তো ফিরে যেতে পারবেন না এই মাত্র এলেন ঠাণ্ডা হোন, আমার অনেক কথা আছে।" "বিনয় রাগিয়া বলিয়া উঠিল "তা হবে না ইন্দু। যা তোমার মনে আছে বলে ফেল। আমি এখানে তিষ্ঠতে পাচ্ছি না। আমার যেন দম বন্ধ হয়ে আসছে। আমি চলে যাই, তোমার কথা বলে ফেল।" এই সময়ে ভবসুন্দরী উঠিয়া বিনয়ের হাত ধরিয়া বলিলেন, "এত রাগ করে কি চলে বাবা, আমরা তিনটী অনাথা স্ত্রীলোক তোমার মুখ চেয়ে এত দিন বসে আছি। এসে, বোস,—নাও, খাও তারপর সকলের কথাই শোন। আমারও অনেক কথা আছে।" বিনয় মুখখানা বাঁকাইয়া তীব্র অবজ্ঞাভরে বলিয়া উঠিল, "কেন আপনার পূর্ণ আসে নি?" তখন বিনয়ের মাতা বিনয়ের মুখ চাপিয়া বলিয়া উঠিলেন, "শাশুড়ী মায়ের সমান বাবা। তার সামনে অকথা কুকথা কি বলতে আছে?"

হরসুন্দর বিনয়ের কড়া গলার আওয়াজ শুনিয়া ধীরে ধীরে নিতান্ত অপরাধীর মত সিঁড়ির উপরে আসিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন, বৃদ্ধ সদানন্দ চক্রবর্ত্তীও তাহার পিছনে আসিয়াছিলেন। সদানন্দ এই সময়ে বলিয়া ফেলিলেন, "ইন্দু মা, আমি নির্ম্মলের শ্বশুর। তোমার মনের কথা এখনই বলে ফেল, বিলম্ব করে কাজ নেই।" ইন্দু তখন সাহসে ভর করিয়া বলিল "বিনু দাদা, আপনি এইখানে বসুন। আপনারই হুকুম মত সকল কথা এখনই বলব। আপনার শাশুড়ী মনে করেন যে আমি আপনাকে পর করে দিয়েছি, আপনি আমার লোভে তার কন্যাকে গ্রহণ করেন না"—বিনয় শুষ্ক কণ্ঠে বলিল, তার কন্যা যে কেন আমাকে গ্রহণ করেন না সে কথা কি জানতে তার বাকী আছে?" ইন্দু আবার বলিল, "ভিতরের কথা যাই হোক আপনার সমাজে প্রকাশ যে আমার জন্যই আপনি স্ত্রী গ্রহণ করেন না। এই অপবাদ দেশে বিদেশে সর্ব্বত্র নাগপাশের মত আমাকে জড়িয়ে রেখেছে। বিনুদাদা আপনি ভিন্ন কেউ আমাকে এ অপবাদ থেকে মুক্ত করতে পারবে না তাই আপনাকে লক্ষ্ণৌ থেকে এখানে আনিয়েছি। বিনয় আবার শুষ্ক কণ্ঠে হাসিয়া বলিল "তুমি কি মনে করেছ ইন্দু যে আমি ইচ্ছা করলেই তোমাকে অপবাদ থেকে মুক্তি দিতে পারি? তা নয়। বিষম ভুল। ভুলে এ সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে, সেই থেকে আমরা প্রত্যেকে প্রতিপদে ভুল করে আসছি, এত ভুল এত সহজে শোধরায় না।" ইন্দুর মুখ খানা সহসা রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল, সে এক হাতে সবলে অন্নদাকে টানিয়া আনিয়া বিনয়ের পার্শ্বে দাঁড় করাইল এবং উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "না, তোমার ভুল। শোধরায়, তুমিই তা শোধরাবে। যদি তা না শোধরাও তাহলে

তোমার পায়ে আত্মহত্যা ক'রে বংশের অপকলঙ্ক ধুয়ে ফেলবে। বিনু দাদা আমার এই একটী অনুরোধ তোমাকে রাখ্‌তেই হ'বে, যেমন করে পার, তোমার মনে যত কষ্টই হোক আমার মুখের দিকে চেয়ে আমার বাপ ভাইয়ের কথা মনে করে তোমাকে এই স্ত্রী গ্রহণ করতে হবে। তা হলেই সব শুধ্‌রে যাবে, সব দোষ নষ্ট হয়ে যাবে। আমিও আমার বরাতের বোঝা মাথায় করে বাপের ঘরে ফিরে যাব।" বিনয়ের কালো মুখ পাণ্ডুর হইয়া গেল। দুই তিন বার ঘন ঘন নিশ্বাস ছাড়িয়া বিনয় জিজ্ঞাসা করিল, "ইন্দু তুমি মনে করেছ যে এই স্ত্রী রত্নকে জেনে শুনে চিনে, তার কলঙ্কের বোঝা মাথায় ক'রে তুলে নিলেই এত ভুল, এত ব্যথা, এত কলঙ্ক সমস্ত মুছে যাবে?"

তখন বিনয়ের মাতা, সারদা, ভবসুন্দরী, নৃত্য ঠাকুরাণী হরসুন্দর ও সদানন্দ পাথরের মূর্ত্তির মত নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন, ইন্দু কাহারও দিকে না চাহিয়া দৃঢ়কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "যাবে, আমি বল্‌ছি যাবে। তুমি শোনো বিনু দাদা, অন্নদা তোমার স্ত্রী, সে যাই হোক আমাদের সমাজে তুমি ভিন্ন তার রক্ষাকর্ত্তা আর কেউ নেই। সে কলঙ্কিনী হোক, সে পাপীয়সী হোক তবু সে তোমার স্ত্রী, তার পাপ তার কলঙ্ক দূর কর্ত্তে পার কেবল তুমি আজ আমার মুখ চেয়ে, আমার বরাতের দিকে চেয়ে তার সকল পাপ তুমি ক্ষমা করো। ভগবান আমাকে মেরেছেন, আমার অদৃষ্টের ফল আমি ভোগ কচ্ছি তাতে হস্তক্ষেপ করবার অধিকার তোমার নেই। কিন্তু অন্নদা যাতে নিজের পাপের প্রায়শ্চিত্ত কর্ত্তে পারে, সে সংসারের পথ চল্‌তে গিয়ে যদি পা পিছ্‌লে পড়ে গিয়ে থাকে তাহলেও তোমার তাকে ধরে তোলা উচিত; কারণ তুমিই তার স্বামী। চল্‌তে গিয়ে যদি তোমার গায়ে কাদা লাগে তাহলে তুমি তোমার মহান মনের মহত্ত্ব দেখিয়া দুজনের কাদা একত্র ধুয়ে ফেলো তা হলে আমার গায়ের কাদা ও ধুয়ে যাবে। বিনু দাদা এই জন্য তোমাকে ডাকিয়েছি, বল আমার কথা তুমি রাখ্‌বে?"

মুহ্যমানের মত বিনয় বলিয়া উঠিল, "ইন্দু এই যদি তোমার মনের কথা হয় তা হলে রাখ্‌ব। তুমি ঠিক বুঝেছ যে অন্নদার সঙ্গে আমার বিয়ে হয়েছিল বলেই আমি তার স্বামী? পা পিছ্‌লে অনেক দূর চলে গিয়েছে, তুমি ঠিক বুঝেছ যে আমি তাকে টেনে তুলতে পারবো? আমার হাত ধরেই আবার সমাজের পথে সে উঠে দাঁড়াতে পারবে? ইন্দু তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, "পারবে। ঠিক বুঝেছি—বল তুমি বিনু দাদা—বল তুমি ওকে গ্রহণ করে? বল তোমার মুখের কথার অপেক্ষায় আমার দম বন্ধ হয়ে যাচ্ছে?"

এক মুহূর্ত্ত পরে বিনয় বলিল, "ইন্দু একে গ্রহণ কল্লে যদি তোমার মনে শান্তি ফিরে আসে তাহলে তাই কল্লুম।" বিনয়ের কথা শুনিয়া ভবসুন্দরী ছুটিয়া আসিয়া ইন্দুকে জড়াইয়া ধরিলেন এবং কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "বড় অপরাধ করেছি মা। তুমি সতী মায়ের সতী মেয়ে তোমাকে চিন্‌তে পারি নি।" ইন্দু কোন রকমে ভবসুন্দরীর আলিঙ্গন মুক্ত হইয়া ক্ষীণ কণ্ঠে নৃত্য ঠাকুরাণীকে বলিল "ঠানদিদি, আমায় বাড়ী নিয়ে চল।" ভবসুন্দরী ব্যগ্র হইয়া বলিলেন, "সে কি হয় মা, আমার নিরানন্দের সংসারে তুমি আজ আনন্দ ফিরিয়ে এনেছ, তোমায় কি এখন ছেড়ে দিতে পারি?" ইন্দু আবার দৃঢ় কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "মাপ করবেন মা। আমারও রক্ত মাংসের দেহ, এ দুদিন এ বাড়ীতে মুখে অন্ন তুলেছি কেবল বিনু দাদার ভবিষ্যৎ চিন্তা করে। এ সংসারের সকলেই মনে করে যে আমি কুলটা এখানে আর অন্ন মুখে তুল্‌তে পারবো না। মা, বাপ, ভাইকে কেবল বিনু দাদার মুখ চেয়েই ফিরিয়ে দিয়েছি। আপনার মেয়ে আপনার জামাই নিয়ে আপনি আনন্দ করুন, আমি আপনার বাপের ঘরে ফিরে যাই।" ইন্দু আর

দাঁড়াইল না, তাহাকে আর কেহ কোন কথা বলিতে সাহস করিলে না। নৃত্যঠাকুরাণী তাহার সঙ্গে সঙ্গে নামিয়া আসিল, বিনয় তাহাকে বাড়ী পৌঁছাইয়া দিতে যাইতেছিল কিন্তু ইন্দু তাহাকে নিষেধ করিল। নৃত্য ঠাকুরাণী গাড়ী ডাকাইয়া ইন্দুকে বোড়া সাঁকো লইয়া গেলেন।

সেই রাত্রিতে অন্নদা সুন্দরী নিরুদ্দেশ যাত্রা করিল। পাপের সম্মোহন শক্তি তাহাকে উপপতির অনুগামিনী করিয়াছিল সেই সম্মোহন শক্তি এখন তাহাকে অসীম প্রেমের দৃঢ় বন্ধন ছাড়াইয়া তাহার উদ্দিষ্ট পুরুষের সংসর্গে লইয়া গেল।

একোষষ্টিতম পরিচ্ছেদ।

সন্ধ্যার পূর্ব্বেই বিনয় নির্ম্মলের সহিত বাড়ী ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছিল। সে ইন্দুর অনুরোধ রক্ষা করিয়াছিল বটে কিন্তু সে তখনও তাহার ধর্ম্ম পত্নীর প্রতি প্রবল বিতৃষ্ণা দমন করিতে পারে নাই। রাত্রি দশটার সময়ে বাসায় ফিরিয়া সে যখন অন্নদার কথা শুনিল তখন তাহার বুকের বোঝা নামিয়া গেল, তাহার মুক্ত কণ্ঠের উচ্চহাসো ক্ষুদ্র গৃহ কাঁপিয়া উঠিল। হরসুন্দর ভাবিয়াছিলেন যে এক রকমে তাহার সাংসারিক সমস্যার একটা মীমাংসা হইয়া গেল কিন্তু প্রাতঃকালের অবস্থা সন্ধ্যাবেলা যখন এতটা পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল তখন তাহার মুখ শুকাইল। বিনয় গাড়ী ফিরিয়া অকারণ হাসিতে আরম্ভ করিয়া দিল, তাহা দেখিয়া নির্ম্মল মনে করিল যে সে পাগল হইয়া গিয়াছে। সে যখন বিনয়কে জিজ্ঞাসা করিল, "বিনু তোর হল কি?" তখন বিনয় অতিকষ্টে হাসির বেগ দমন করিয়া বলিল, "কৈ কিছুই না!" "তবে এত হাস্‌ছিস্ কেন?" "হাসি পাচ্ছে বলে।" ভাল আপদ। তুই এখানে এসে হাসির কথা কি শুনলি বিনু?" "সমস্তটাই। দেখ ভাই, সকলে মনে করে যে সে যেমন বোকে এমনটি আর কেউ বোকে না। সকাল বেলায় ইন্দু কেমন আমাদের ভাঙ্গা সংসার যোড়া দিয়া গেল দেখলি তো। আর এখন এই সংসারটা আবার ধমকা হাওয়ার মুখে কাঁচের ঘরের মত চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল, তাই হাসছি।" উত্তর শুনিয়া নির্ম্মল একেবারে চুপ করিয়া গেল।

উপরে গিয়া বিনয় হরসুন্দরকে বলিল, "বাবা, আমি তবে মাকে নিয়ে কাল লক্ষ্ণৌ চলে যাই।" বৃদ্ধ হরসুন্দর তখন চারিদিকে বিভীষিকা দেখিতেছিলেন তিনি নিতান্ত অসহায় শিশুর মত বলিয়া উঠিলেন, আর আমি? আমি কোথায় যাব?" বিনয় হাসিমুখে বলিল, "আপনিও আমাদের সঙ্গে চলুন। "হরসুন্দর আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঘর বাড়ী?" "বন্ধ থাক।" "বিষয় আশয়" বিনয় পিতার কথা শুনিয়া হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল, সে বলিল, " বিষয় আশয় এখন যেমন আছে তেমনি থাক, তারপরে আপনি যাকে ইচ্ছা হয় দান করে যাবেন।" কৃপণ স্বভাব ঘোর বিষয়ী হরসুন্দর আর সহ্য করিতে পারিলেন না, তিনি উঠিয়া দাঁড়াইয়া বিনয়ের হাত ধরিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। হরসুন্দরের ক্রন্দনের আওয়াজ পাইয়া এক শুবসুন্দরী ব্যতীত আর সকলেই সেইখানে উপস্থিত হইল। বৃদ্ধ বলিলেন, "এমন করে যে আমার সোণার সংসার ছারখার হয়ে যাবে তা কখনও মনে ভাবিনি। বিনু, তোর বাড়ী, তোর বিষয়, তোর টাকা তুই থাকতে আমি কার হাতে দিয়ে যাব?"

সদানন্দ উঠিয়া হরসুন্দরকে বসাইলেন এবং অনেক কষ্টে তাহাকে শান্ত করিয়া দুইজনে সৌর মোহনের গৃহের উদ্দেশ্যে বাহির হইলেন তখন বিনয় মাতার নিকট গিয়া বসিল। সন্ধ্যার পর হইতে অন্নদাকে খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না শুনিয়া শুবসুন্দরী শয্যা গ্রহণ করিয়াছিলেন, সারদা হতাশ হইয়া বসিয়াছিল এবং পরেশ বাড়ী খুঁজিতে বাহির হইয়াছিল। বিনয় মাতাকে বলিল, "মা সকাল থেকেই আমার পালাতে ইচ্ছে করছে। চল কাল

দশটার গাড়ীতেই চলে যাই।" মা বলিলেন, "এবারকার যাওয়াটা একটু শক্ত যাওয়া বিনু। বাবুকে নিয়ে যে কি করব বুঝতে পারছি না।" "বাবাকে আমাদের সঙ্গেই নিয়ে যেতে হবে তা নইলে তাঁকে দেখবে কে মা? ঘর বাড়ী বিষয় আশয়ের মায়া কাটাতে বাবার বড় কষ্ট হবে কিন্তু আমি আর এখানে টিঁকতে পাচ্ছি না মা।" বিনয়ের পৃষ্ঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে মা বলিলেন, "ইন্দু যে এমন করবে বাছা তাত বুঝতে পারিনি।" বিনয় অনেকক্ষণ মাতার কাছে বসিয়া রহিল। ক্রমে রাত্রি বাড়িয়া চলিল। বারটা বাজিয়া গেলে বিনয়ের মাতা জিজ্ঞাসা করিলেন, "বিনু, বড় ঠাকুর কোথায় গেলেন? বিনয় বলিল, বোধ হয় বাবার সঙ্গে নিকুঞ্জের বাড়ী গিয়াছেন।" "ওবে আর বিলম্ব করে কাজ নেই তাদের আসতে রাত্তির হবে, তুই খেয়ে নে।"

বিনয় নিশ্চিন্ত মনে আহারে বসিয়া গেল, তাহার মনের আনন্দ ও আহারের পরিমাণ দেখিয়া তাহার মা আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন। সে আহারান্তে শৈশবের মত মাতার শয্যাপ্রান্তে শয়ন করিয়া ঘুমাইয়া পড়িল এবং হরসুন্দর কখন ফিরিয়া আসিলেন তাহা সে জানিতেও পারিল না। প্রভাতে উঠিয়া হরসুন্দর সারদা ও পরেশকে লইয়া শ্রীরুক্ষপুরে চলিয়া গেলেন, বিনয় বিছানা পত্র বাঁধিয়া যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইল, প্রভাতে উঠিয়া হরসুন্দর বাহির হইয়া গিয়াছিলেন, বিনয়ের মাতা তাহার অপেক্ষায় অনেকক্ষণ বসিয়া রহিলেন। বেলা নয়টা বাজিলে বিনয় তাহার মাতাকে বলিল, "মা, দশটার সময় গাড়ী, আর তো বিলম্ব করা চলে না।" মা বলিলেন, "বাবু কাল রাত্রিতে দুটোর সময়ে ফিরেছেন, তার সঙ্গে কোন কথাই হয় নি। তাঁকে ফেলে কেমন করে যাব?" বিনয় কোন উত্তর খুঁজিয়া পাইল না, ক্রমে দশটা বাজিয়া গেল কিন্তু তখনও সদানন্দ বা হরসুন্দর কাহারও সাক্ষাৎ পাওয়া গেল না, বিনয় ক্রমশঃ অস্থির হইয়া উঠিল, সে পাগলের মত বাড়ীর ভিতরে ও বাহিরে ছুটাছুটি আরম্ভ করিল, তাহা দেখিয়া তাহার মাতা বলিলেন, "দশটার গাড়িতে আর যাওয়া হোল না বিনু, বাবু কেন আসছেন না তাও বুঝতে পাচ্ছি না রাত্রের গাড়ীতেই এক সঙ্গে যাওয়া যাবে।" অন্যদিন বিনয় মায়ের কথাতেই শান্ত হইত কিন্তু আজ আর মাতৃবাক্য তাহার চঞ্চল চিত্তকে স্থির করিতে পারিল না, বিনয় বলিল, "মা, শরীরটা যেন কি রকম বোধ হচ্ছে, মনটাকে কোন রকমেই শান্ত করতে পাচ্ছি না, চল তোমাকে নিয়েই চলে যাই, উপস্থিত এ বাসাটা ছেড়ে চলে যাই, আবার না হয় ফিরে আসব কিন্তু এখন মনটা বড়ই চঞ্চল হয়ে উঠেছে, মনে হচ্ছে কে যেন আসবে, আবার একটা কি বিভ্রাট বাধাবে। চল চলে যাই, চল না মা? তোমার মনে কি ভয় হচ্ছে না?" পুত্রের বিভ্রান্ত মূর্ত্তি দেখিয়া মাতা তাহাকে কোলের কাছে টানিয়া বসাইলেন এবং অঞ্চল দিয়া সযত্নে মুখ মুছাইয়া বলিলেন, "ভয় কিরে? এখন তুই বড় হয়েছিস্ তোর কিসের ভয়?" বিনয় অনেকক্ষণ পরে বলিল, "মা আবার আসবে, আবার বিষ খাওয়াবে, তখন তো তুমি ছিলে না, তুমি জাননা সে বড় কষ্ট। তার চাইতে চল চলে যাই। বাবা হয় ত পরশু কড়ি বিঘার আশা ছেড়ে যেতে পারবেন না, তুমি না হয় দিন কতক পরে চলে এস?"

অনেক কষ্টে চোখের জল রোধ করিয়া মা বলিলেন, "বিনু, আজকের দিনটা থাক কাল সকালের গাড়ীতে আমি নিশ্চয় তোকে নিয়ে চলে যাব, কেউ আমাকে আটকাতে পারবে না। তুই বুঝতে পাচ্ছিস না, বাবু অনেক বদলে গেছেন। তাঁর মন এখন আর তত শক্ত নেই। তাঁকে ছেড়ে যেতে মন সরছে না, বিনয় তথাপি স্থির হইতে পারিল না, সে বলিয়া উঠিল, "তুমি বুঝছ না মা তাদের পূর্ণ আছে, সে সুন্দর আমি না ম'লে সে নিষ্কণ্টক হবে

না। আবার এখুনি ফিরে আস্‌বে, আবার ছলে বলে আমাকে নিয়ে যাবে, ইন্দু এসে হয়ত তাদের সঙ্গে যোগ দেবে। চল মা চল যাই।"

বিনয়ের এইরূপ মনের অবস্থা দেখিয়া মাতা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন, বেলা দশটা বাজিয়া গেল তখনও হরসুন্দর ব, সদানন্দের দেখা নাই। তখন বিনয়ের মাতা বলিলেন, "বিনু একখানা গাড়ী ডেকে নিয়ে আয়, চল একবার গঙ্গা নেয়ে আসি।" বিনয় গাড়ী ডাকিয়া আনিল, মা গাড়ীতে উঠিলেন। ঠিক সেই সময়ে আর একখানা ভাড়াটিয়া গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইল, বিনয় তাহা দেখিয়া নিজেদের গাড়ীর দরজা ধরিয়া দাঁড়াইয়া গেল, দ্বিতীয় গাড়ী খানা হইতে ইন্দু নামিয়া তাহার নিকটে আসিল এবং জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কোথায় যাচ্ছেন?" বিনয় মুখখানা ফিরাইয়া বলিল, "সে কথায় আর তোমার দরকার কি? তোমার সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই, সে কথা তুমি কাল সকালেই বলে গিয়েছে, আবার কেন জিজ্ঞাসা করতে এসেছো?"

ইন্দু বিনয়ের হাত ধরিয়া বলিল, "ভুল করেছ, ভুল কোরেছিলুম, তাই মাপ চাইতে এসেছি। এতদিন বাপ মায়ে সকলেই ভুল করে এসেছে। কালকের দিনটি মাত্র আমি ভুল করেছি। হাত জোড় করে মাপ চাইছি, চল ফিরে চল।" বিনয়ের উচ্চশির সহসা নত হইয়া গেল, মা গাড়ী হইতে নামিয়া বলিলেন, "আয় মা ঘরে আয়। তুই ঘরে ছিলি না বলে আমার ঘরে লক্ষ্মী-শ্রী ছিল না।" দূরে দাঁড়াইয়া সদানন্দ চক্রবর্ত্তী বলিয়া উঠিল, "হরি বোল, হরি বোল।"

সমাপ্ত।

সমস্যা

জল্পনা কল্পনা

ভাবের অভিনেত্রী

শ্রীমতী খুরসিদ জাঁহা বেগম

অনেক অভিনেতা অভিনেত্রী আছেন যাঁরা প্রথমে থিয়েটারে নাম করে নিয়ে পরে কিম্বে নাম করেন। আবার কোন কোন অভিনেতা অভিনেত্রী আছেন যাঁরা প্রথমেই কিম্বে নাম করে নিয়ে পরে থিয়েটারেও খ্যাতি লাভ করেন। বর্ত্তমান চিত্রে ভাব বৈচিত্র্যের অভিনেত্রী মেরি ওভেট প্রথমে কিম্বেই খ্যাতি অর্জ্জন করেন।

মেরি ওভেট্

ফরাসী দেশে এঁর জন্ম। ইউরোপের নানা প্রদেশের রঙ্গমঞ্চেই ইনি নানা নাটকের প্রধান অভিনেত্রীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জ্জন করেছেন। অতি শিশুকাল থেকেই এঁর অভিনয় প্রতিভা বিকশিত হয়। দশ বছর বয়সের সময় ইনি পরী সেজে দু' লাইনের একটা পার্ট নিয়ে রঙ্গমঞ্চে প্রথম নামেন।

থিয়েটারে কিছুদিন অভিনয় করবার পরেই এঁর কিম্ব অভিনেত্রী হবার ঝোঁক চাপে। ভাল কিম্ব অভিনেত্রীরূপে ক্রমে এঁর নাম ছড়িয়ে পড়তে থাকে। মেরি ওভেট সহজ স্বাভাবিক ভাবে আত্মহারা হয়ে অভিনয় করেন। যে ভূমিকা ইনি অভিনয় করেন নিজেও একেবারে তাই বনে যান। নিজের সত্তা একেবারে হারিয়ে ফেলেন।

ইনি জীবজন্তু বড় ভালবাসেন, শিশুদের উন্নতির অনেক সমিতির সঙ্গে এঁর ঘনিষ্ট সম্পর্ক আছে। মাছ, মাংস ভিন্ন কোন রকম আমিষ খাদ্যই ইনি খান না, একেবারে নিরামিষাশী। নাচবার সময় সত্যি একে পরীরাণীর মতই দেখায়। মেরী ওভেটের মা আছেন, যেখানেই যেতে যান মা ও তাঁর সঙ্গে সঙ্গেই যান।

ভাল কিম্ব অভিনেতা অভিনেত্রীদের কিম্বে অভিনয়ের উপযুক্ত মুখ ও দেহ সৌষ্ঠব থাকা দরকার। মেরি ওভেটের তা আছে, অন্তরের নানা ভাব ইনি মুখে সুন্দর ফুটিয়ে তুলতে পারেন। এই প্রবন্ধের চিত্র গুলি থেকে পাঠক পাঠিকা সুন্দরী অভিনেত্রীর ভাবাভিনয়ের কৃতিত্বের পরিচয় পাবেন।

ভাবনা, সারদা, খুসী, হাস্যাননা, বিহ্বলা ক্লান্তা

চাট্‌নী

(শ্রী যতীশ মিত্র)

এক

অভিভাবকের অর্থের সদ্ব্যয়—

বিজয় কলেজে পড়ে। খরচের টাকা অলপাই-গুড়ী হইতে কাকা বড় কষ্টে পাঠান; সে কলিকাতায় মেসে বসিয়া মণি অর্ডার সই দিয়া রোজগার করে। একদিন রাস্তায় ভিড়ের মধ্যে কে যেন তাহার পকেট হইতে দশটাকার নোটখানা না বলিয়া বাহির করিয়া লইয়া গিয়াছে। বাসায় আসিয়া বিজয়—নিজের অসাবধানতার কথা ভাবিয়া নিতান্ত দুঃখিত; তদোধিক দুঃখিত তার কাকার গায়ের রক্ত-জলকরা টাকা হারাইয়া ফেলিয়াছে বলিয়া। যাক্, মাসের শেষে আবার বিল পাঠাইল—; সঙ্গে চিঠি দিল,—"সে দিন দশটী টাকা হারাইয়া ফেলিয়াছি। কত কষ্ট করিয়া আপনি টাকা দেন—তাহাই হারানোর জন্য আমার আর মনঃপীড়ার অবধি নাই। যাক্—যা হইবার—হইয়াছে। কেরত ডাকে আমার জন্য এ মাসে আর দশটী টাকা পাঠাইবেন। উহার সঙ্গে আরো দু'টী টাকা বেশী দিবেন। টাকা হারানোর দিন মনটা খুব খারাপ হইয়াছিল বলিয়া—থিয়েটার দেখিয়া মনটা ভাল করিয়া লইয়াছিলাম।" কাকা টাকা পাঠাইয়াছেন;—চুপনে লিখিয়াছেন,—"অত হিসাব করিয়া চলিতে পারিলে আর বেশী দিন আমার খরচের ভাবনা ভাবিতে হইবে না।

কাকা রাগ না করিয়া টাকা পাঠাইয়াছেন—দেখিয়া বিজয় মহা খুশী। আগাগোড়াই কিরূপ হিসাব করিয়া খরচ পত্র করে, তাহা প্রকাশ করিয়া বাহাদুরী লইবার প্রলোভনটা এড়াইতে পারিল না। পর পত্রেই কাকাকে জানাইল,—"আপনি অতি কষ্টে টাকা দেন বলিয়া আমি খুব হিসাব করিয়াই চলি। আমাদের মেসের সবাই ডাইং-ক্লিনিংএ কাপড় কাচায়, আমি নিজেই সাবান দিয়া কাচিয়া লই; সবাই রুটী-হালুয়া দিয়া জল খায়, আমি চা বিস্কুট খাইয়া থাকি; ওরা সিগারেট খায়, আমার বিড়িতেই চলে; আমি ওদের মত সপ্তাহে তিন দিন থিয়েটার না দেখিয়া,—ওদের অপেক্ষা কম খরচেই ৫ দিন করিয়া বায়স্কোপ দেখি; ইত্যাদি।

—

দুই

ব্যারিং যাত্রী।

হঠাৎ রাস্তায় এক ট্রেসনে গাড়ীতে চেকার উঠিতে দেখিয়া নীরেনের বুকটা ধরাস্ করিয়া উঠিল। শুধু তাই নয়, তিনি উঠিয়া আগে তারই কাছে টিকিট চাহিয়া ফেলিলেন। 'যেখানে বাঘের ভয়, সেখানেই রাত হয়'—কথাটা যে এত সত্য নীরেন তা সেই দিন প্রথম বুঝিল। নিরুত্তর দেখিয়া চেকার বাবু আবার টিকিট দেখিতে চাহিয়া—হাত বাড়াইলেন। নীরেন মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিল,—"আজ্ঞে—টিকেটের দরকার এখন পড়ে না—পোষ্ট কার্ডেই চলে।" নির্দ্দোষ রসিকতায় চটিয়া গিয়া চেকার বাবু বলিলেন,—"আজ্ঞে না মশাই—এখানে টিকেট না হলে চলে না।" "তবে আমি ব্যারিং এসেছি; ডেলিভারির সময় মাশুল পাবেন।"

হতচকিত—টিকেটের বদলে রাগ কাটিবার বস্তুটী দিয়া চেকার বাবু নীরেনের পিঠে আস্তা করিয়া এক গুতা বসাইয়া দিলেন। নীরেন বিস্মিত হইয়া তাঁর দিকে চাহিতে তিনি বলিলেন,—আজ্ঞে—ব্যারিং চিঠিতে একটী 'unpaid'এর দিন যায়তে হয় কি না!—তা ঠিক বলেছেন, না স্পষ্ট করে আর একটা যায়তে হবে?"

পিঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে নীরেন বলিল, "আজ্ঞে না, খুব স্পষ্টই সিল পড়েছে। চিঠি ছিঁড়ে গেলেও এর দাগ মুছবে না।"

তিন

ছোওয়া নয়, সরিয়ে রাখা।

বিশ্ব প্রেমানন্দ কাব্য-ব্যাকরণ-ন্যায়-স্মৃতি সাংখ্য-বেদান্ত-দর্শন তীর্থ মহাশয় ব্রাহ্ম মুহূর্তে শয্যা ত্যাগ করিয়া পায়খানায় যাইবার গাড়ুটী উঠানে রাখিয়া —তামাকে টান দিবার জন্য বাহিরের ঘরে ঢুকিলেন। বাহিরে আসিয়া জগাই মালীকে উঠান ঝাঁট দিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আরে ব্যাটা, ছুঁয়ে দিয়ে আমার গাড়ুর জলটা নষ্ট করে' দিস্‌নি ত?" "আজ্ঞে না প্রভু, ছুঁয়ে ফেলার ভয়ে আগেই ওটী একধারে সরিয়ে রেখেছি।"

চলতি চাকৃতি

প্রসিদ্ধ মার্কিণ ভ্রমণকারী মিঃ পিটার অ্যাভিস্ এখন গোদাবরী জেলায় বাস করিতেছেন। ইনি দিনে দু'ঘণ্টা করে চরকায় সূতা কাটেন, নিজের হাতে কাটা সূতায় পোষাকে সাজবার এঁর বড় ইচ্ছা। ইনি হিন্দী শিখছেন, গীতাও পড়ছেন।

● ● ●

আমাদের দেশের কোন কোন স্বদেশ-সেবী এখনও প্রকাশ্য সভায় বলছেন যে খদ্দরের উপকারীতা কি তা এখনও তাঁরা বুঝতে পারেন নি, তবে জনসেবার মহৎ ইচ্ছার প্রাবল্য নিয়েই যখন কার্য্যক্ষেত্রে নামতে যাচ্ছেন তখন জনসাধারণ যদি তাঁদের খদ্দর পরাই দেখতে চায় তবে তাঁরা তাই করবেন। সাধু! জন মতের প্রতি কত শ্রদ্ধা!

● ● ●

জনরব— শ্রীযুক্তা বেসান্ত, রাইট্ অনরেবল্ শাস্ত্রী, স্যর সপ্রু প্রভৃতি ডেপুটেশন নিয়ে বিলেত যাবার ইচ্ছা করছেন—ডেপুটেশন অথচ-এর মধ্যে বাংলার বিপিনচন্দ্রের নাম নাই!

● ● ●

এক ম্যালেরিয়াতেই বাংলা দেশে প্রতিদিন নাকি হাজার করে লোক মরে। এ ছাড়া আরো অনেক আধি ব্যাধি উপদ্রব আছে যাতে লোকে শমন সদনে যেতে পারে। কোন উপসর্গটাকে বাহন করে সব চেয়ে বেশী লোক যম রাজ্যে যায় সে এখনো জানা যায় নি।

● ● ●

লর্ড ব্যালফুর মস্ত বড় ধনী লোক। তাঁর ঠাকুরদা মাদ্রাজে এসে আহারে বসে আর খাবার দেবার কনট্রাক্ট নেন। এই কাজে অল্প ক বছরের মধ্যেই ৩০০০০০ পাউণ্ড জমিয়ে দেশে ফিরে বিরাট সম্পত্তি কিনে ফেলেন। অনেক ইংরেজ আর সুখের ভাগ্য ভারতেই ফিরে গেছে।

● ● ●

বিলেতের বড় ধর্ম্ম গুরু বলছেন—এখনকার মেয়েদের ফ্যাশানও এক মহা কেলেঙ্কারীর ব্যাপার হয়ে পড়েছে। কোন পোষাকে অঙ্গ কতটা অনাবৃত থাকতে পারে ফ্যাশান মহলে এই হচ্ছে বড় কথা। এমনি খোলা পোষাকের মেয়েদের পোপ যেমন গীর্জ্জায় প্রবেশ বন্ধ করেছেন ইনিও তাই করবেন বলে ভয় দেখিয়েছেন। আধুনিক নৃত্য কলাকেও নীতির দিক থেকে ইনি অত্যন্ত নিন্দা করেছেন।

ইউরোপের কোন কোন অংশে আইন হ'বার যোগাড় হ'চ্ছে অবিবাহিত এবং যোড়শী মেয়েরা বেণী বাঁধবে না, খুলে রাখ্‌বে। এর দ্বারা কারো কিছু সুবিধা হ'বার আশা আছে কি ?

● ● ●

জগতে যত লোক মরে জন্মে তার চেয়ে বেশী, তাই জগতের লোক সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে। পণ্ডিতেরা হিসেব করে দেখেছেন জগতে মিনিটে ৬' জন করে লোক মরে—সে জায়গায় জন্ম হয় ৭০ জন লোকের। প্রতিদিন তা হলে বিশে ৪৩২০ করে লোক বেড়ে যাচ্ছে।

● ● ●

পুরুষেরা নিজের স্ত্রীর কাছে সাধারণ ভাবেই থাকেন, অপর কোন মেয়ের কাছে যেতে হলেই তাদের সাজ সজ্জা প্রসাধনের ধুম পড়ে যায়।

বাঁশরী

শ্রীমতী কিরণ দেবী

বাজবে নাকো শ্যামের বাঁশী
　　গাইবে নাকো গান,
মিছে তোদের আশায় থাকা
　　মিছে তোদের মান।
আসবে নাকো কালো শশী
　　দেবে নাকো প্রাণ,
উঠবে না আর কূল লহরী
　　যমুনায় উজান।
আসবে না আর কালো সোণা
রাধার চরণ কমল ধরবে না
সেই পদ পল্লব বলে
　　ভাঁজবে নাকো মান
বাজবে নাকো শ্যামের বাঁশী
　　গাইবে নাকো গান
গোপরে ওরে গোপাঙ্গনা
মিছে তোদের আনা গোনা
মিছে তোদের মালা গাঁথা
　　মিছে অভিমান
আসবে না আর ব্রজে কানু
বাজবে না আর মোহন বেণু
(এখন) কুব্জারাণীর বঁধু সে যে
　　জানে নাকো আন
বাজবে নাকো শ্যামের বাঁশী
　　গাইবে নাকো গান।

সিলভার ক্লাউড

ভার্জিনিয়া

সিগারেটের

ধূম পান করুন।

সূর্য্যমুখী
শিল্পী—শ্রীহেমেন্দ্রনাথ মজুমদার।